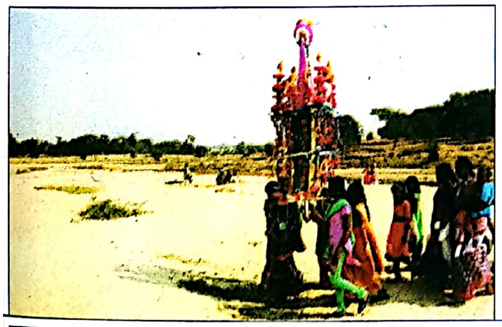




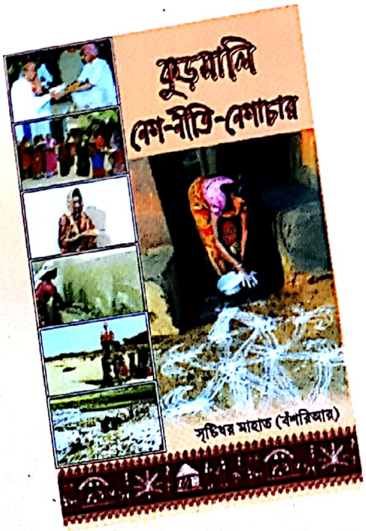



কুড়মালি

নেগ-নীতি-নেগাচার



সৃষ্টিধর মাহাত (বঁশরিআর)



গ্রন্থ পরিচিতিঃ-

'কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার' গ্রন্থটি এক ভিন্নধর্মী মৌলিক চেতনার দৃষ্টান্তস্বরূপ। আদিবাসী ও সাধারণ লোকজীবনের উপর দীর্ঘদিনের আন্তরিক অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রগবেষণার ফসল। ঐতিহ্যের সূত্র ধরে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত সংস্কার-বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলার এক অপূর্ব বিন্যাস ও গ্রন্থন ঘটেছে এখানে। কেবলমাত্র কুড়মি জাতিগোষ্ঠীর মানুষই নয়, কুড়মালি অর্থাৎ সমভাবাপন্ন আদিবাসী মূলবাসী জনগোষ্ঠীর নেগ-নীতি-নেগাচার তুলে ধরেছেন লেখক। মানবিকতায় সমৃদ্ধ শান্তির বাতাবরণে এক নতুন চেতনার দিশা থেকেই লেখকের এই কর্মযজ্ঞ। সমাজ ও সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলেই বিশ্বাস।

কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার

সৃষ্টিধর মাহাত (বঁশরিআর)

মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী
পুরুলিয়া বিবেকানন্দ পল্লী, পেরিয়ার লেন,
পুরুলিয়া - ৭২৩ ১০১

Kurmali Neg-Niti-Negachar
by Sristidhar Mahato (Banshriar)
Price : Rs. 350 only, 25 US $

প্রথম প্রকাশ :
আখান - ১৪২৮ (ইং ১৫/০১/২০২১)

প্রকাশক :
চারিয়ান মাহাত

ছবি :
উত্তম মাহাত, অমিতাভ মাহাত, ত্রিদিব মাহাত, স্বরূপ দত্ত ও রমানাথ দাস।

অক্ষর প্রতিস্থাপন :
প্রেস সিসেম, কলকাতা - ৭০০ ০০৫

প্রচ্ছদ : কর্মবীর মাহাত

প্রাপ্তিস্থান :
জামবাদ মিলন আখড়া, গ্রাম (পোঃ) : জামবাদ
থানা : কেন্দা, জেলা : পুরুলিয়া - ৭২৩১২৮

মুদ্রক
রবীন্দ্র প্রেস
১১এ, জগদীশ নাথ রায় লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র (ভারত), 25 US $

উৎসর্গ

আজা - খঁকু মাহাত (বঁশরিয়ার)

আজি - লুধি মাহাত (বঁশরিয়ার)

দুধুবাপ - কিষ্ট সরকার (হিঁদোআর)

দুধুমাঞ - ক্ষিরী সরকার (হিঁদোআর)

স্মরণ ও আশীর্বাদ গ্রহণ



আজি - লুধি মাহাত (বঁশরিয়ার)
ও
দুধুমাঞ - ক্ষিরী সরকার (হিঁদোআর)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীপদ বঁশরিআর, নগেন পুনুড়িআর, কিরীটি মাহাত,
চারিয়ান মাহাত, গতিলাল মাহাত, শিবশঙ্কর সিং,
বিমলাকান্ত যোগী, রবীন্দ্রনাথ মাহাত,
রমানাথ দাস, কর্মবীর মাহাত,
ফণীভূষণ মাহাত ও
সাধুচরণ মাহাত।

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিশ্বের সব চাইতে প্রাচীন সভ্যতাগুলির একটির উৎপত্তি ঘটে ভারতে। এখানেই গড়ে ওঠে অত্যন্ত, উঁচু স্তরের উন্নত এক সংস্কৃতি যা এ দেশের বিকাশের ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির বিপুল প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয় সমগ্রভাবে গোটা প্রাচ্যের মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও দূরপ্রাচ্যের বহু জাতির বিকাশে, সংস্কৃতির বিকাশে, অপরিসীম অবদান রেখেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও গবেষণার ফলাফলে প্রমাণিত যে মানব সমাজের একেবারে আদিমতম কাল থেকেই ভারতে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। এ দেশের বহু অঞ্চল থেকেই প্রত্নপ্রস্তর যুগের নিম্নস্তর ভূ-স্তরের আমলে তৈরী পাথরের হাতিয়ার ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। পরস্পর নিরপেক্ষভাবে নিম্নস্তরের প্রত্নপ্রস্তর যুগীয় দুটি কেন্দ্র উদ্ভূত হয়েছিল ভারতে। উত্তরে সোননদী তীরবর্তী সংস্কৃতি (বর্তমান পাকিস্তানের) সোন নদীর তীর বরাবর এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে তথাকথিত মাদ্রাজী সংস্কৃতি। এই দুটি প্রত্নপ্রস্তর যুগীয় কেন্দ্রই মনুষ্যবাসের পক্ষে বেশী উপযোগী নদী উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। এদের মধ্যে প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৬৩ সালে মাদ্রাজ অঞ্চলে অবস্থিত কেন্দ্রটি। প্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার ইত্যাদি দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও যেমন মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও অতঃপর আবিষ্কৃত হয়েছে। উপরোক্ত সব অঞ্চলের আবহাওয়া ছিল তুলনামূলক ভাবে বেশী অনুকূল, শিকারযোগ্য জীবজন্তুও এখানে অঢেল। এই যুগের মানুষের প্রাণধারণের প্রধান উপায় ছিল পশুশিকার আর খাওয়ার উপযোগী গাছপালা-লতাপাতা সংগ্রহ। লোক বাস করত বড় বড় দল বেঁধে।

মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর হল উচ্চতর ভূস্তরের প্রত্নপ্রস্তর যুগে তার উন্নয়ন। আজ যাদের আমরা "হোমোসেপিয়ানস" বা নৃগোষ্ঠী বলে জানি তাদের উদ্ভব ঘটে এই যুগেই। পশুপালন শুরু হয় মধ্যপ্রস্তর যুগে এবং এযুগের অবসান শুরু হয় মৃৎশিল্পের উদ্ভব ও কৃষিকাজের ব্যাপক প্রসারের মধ্য দিয়ে। ভারতে মধ্যপ্রস্তর যুগের সব চেয়ে সুপরিচিত নিদর্শনক্ষেত্র হল গুজরাটের লাঙ্ঘনাজ বসতি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও যেমন দাক্ষিণাত্যে তিনেভেল্লির কাছে ও পূর্ব ভারতে (পশ্চিমবঙ্গের বীরভাবপুরে) মধ্যপ্রস্তর যুগের বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। সুদূর মধ্যপ্রস্তর যুগ থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটে চলেছিল। দক্ষিণ ভারতের মধ্যপ্রস্তর যুগীয় বসতিগুলির অধিবাসীরা প্রাণধারণের জন্য পশুশিকার করত এবং মাছ ধরত। অপর দিকে উত্তরে সিন্ধুদেশে স্থায়ী কৃষিকাজের প্রসার ঘটছিল।

পূর্বভারতের নবপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতিগুলির মধ্যে দুটি সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক ধারা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। একটি বিহার উড়িষ্যার, অন্যটি আসামের ধারা। বিহার উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক ধারার গোড়ার দিকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক ধারাগুলিই প্রধান হয়ে ওঠে। নবপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজ ও পশুপালন আরও উন্নত হয়ে ওঠে এবং মানুষ ধীরে ধীরে যাযাবর জীবন ছেড়ে অপেক্ষাকৃত বসবাস গড়ার দিকে মন দেয়। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে যে সময় নবপ্রস্তর যুগের ও গোড়ার দিকের তাম্রপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতিগুলি বিকাশ লাভ করছিল সেই সময় সিন্ধু উপত্যকায় বর্তমান ছিল ব্রোঞ্জযুগের এক উন্নত নগর সভ্যতার।

একসময় পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে ভারতে সভ্যতার উদয় হয়েছিল অনেক পরে। আর্যরাই নাকি ভারতে সভ্যতার আমদানি ঘটায়। এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে এদেশে। কিন্তু হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে এখন ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীনত্ব ও তার মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ মিলেছে এবং সিন্ধু প্রদেশে হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘটে ইন্দো-আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশের কয়েক শতাব্দী আগেই। সুতরাং ভারতে সভ্যতা পতনে আর্যদের ভূমিকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ইংরেজী দৈনিক Times of India পত্রিকায় ১৫ই মার্চ ২০১৫ ভারতবর্ষে মানুষের আগমনের একটি গবেষণা সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। তাতে উল্লেখিত হয় যে ভারতবর্ষের "থর" মরুভূমিতে হাতে তৈরী পাথরের হাতিয়ার এবং উটপাখীর ডিম আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিম রাজস্থান থেকে কচ্ছ অঞ্চল পর্যন্ত ভারত ও ব্রিটেনের গবেষকরা খননকার্য চালিয়ে এমন সব প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ষাট থেকে নব্বই হাজার বছর আগে মানুষের উপস্থিতি ছিল ভারতে। তাদের এই গবেষণালব্ধ ফল মিলে যাচ্ছে। আগে পাওয়া অন্ধ্রপ্রদেশের জালপুরমের প্রমাণাদির সঙ্গে যা প্রমাণ করে দক্ষিণ ভারতের উপদ্বীপে "হোমোসেপিয়ানস" বা আধুনিক মানুষে পৌঁছেছিল সাতাত্তর হাজার বছর আগে। কাজেই এটা পরিষ্কার ভারতবর্ষের সংস্কৃতি আমদানি করা বা ধার করা নয়। এর উদ্ভব এবং বিকাশ নিজস্ব।

জীবন নির্বাহ করার ক্ষেত্রে আদিমকাল থেকেই মানুষ এমন কি অন্যান্য প্রাণীকুল ও নূন্যতম কিছু নিয়ম মেনে চলে আসছে। ঐ নিময়গুলিই আবহমান কাল থেকে অনুসৃত হবার ফলে ধীরে ধীরে জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। গড়ে তুলেছে এক জীবন প্রণালী বা ধারা, একটি স্রোত বা নালা, যেমন করে একটি প্রবহমান নদীতে পরিণত হয়। এইভাবেই গঠিত হয়েছে ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি। এই নিয়ম ও ধারাগুলি মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রার অনুকূল বলেই

প্রমাণিত এবং সামগ্রীকভাবে ক্ষতিকারক কিছু পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও কাল ও পারিপার্শ্বিক কারণে তার মধ্যে কিছু বাহ্যিক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু মূল বিষয় বা উদ্দেশ্য অটুট রয়েছে। অন্য মানুষের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত নিরন্তর প্রচারের ফলে রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান (নেগাচার) পালনে বিচ্যুতি এসেছে। আপন সংস্কৃতি কিছুটা অবহেলিত হয়েছে। তথাকথিত উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির প্রাবল্য দাপট থাকলেও আদিবাসী সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় প্রবহমান। সংস্কৃতির এই সংকটকালে সৃষ্টিধর মাহাত মহাশয়ের "কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার" গ্রন্থটি খুবই সময়োপযোগী। সৃষ্টিধরবাবু যে সাংস্কৃতিক ধারা রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, পরব-পার্বণ এক কথায় নেগাচারের আলোচনা করেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের পক্ষে উপকারী যার মধ্যে হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা বা অন্যান্য সামাজিক অন্যায় বা অপরাধের লেশমাত্র নাই। যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে এক আনন্দময় ছন্দে বেঁধে রেখেছে। সেগুলি তাঁর গ্রন্থে নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তা শুধু কুড়মি সমাজেই নয়, সমগ্র ভারতীয় সমাজের পক্ষেই উপকারী।

এই নেগাচার বেশ কিছু জনগোষ্ঠীকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র একটি অস্তিত্ব এবং পরিচয় বহন করছে। এই সংস্কৃতিতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের সমাজের মতো কোন বর্বর কুপ্রথা চালু নেই। সামাজিক ভাবে মূল্যবান এই ধারাগুলিকে কোন ক্রমেই অবলুপ্ত হতে দেওয়া উচিত নয়। এগুলির ব্যবহারে তার প্রসার বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরী।

যে কোন রীতি-নীতি নেগ-নেগাচার বেঁচে থাকে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে। কুড়মালি নেগাচারী গোষ্ঠীর মানুষসহ অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ এক সময়কাল পর্যন্ত সকলেই "খেরওয়াল" জনগোষ্ঠীভুক্ত এবং সকলেই ছিল বেদ-বিধি বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর মানুষ। সেই কারণেই অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে কুড়মালি নেগাচারের প্রভূত মিল দেখা যায়।

সৃষ্টিধর মাহাত (বঁশরিআর) মহাশয়ের "কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার" গ্রন্থটি সাধারণ মানুষের সমাদৃত হোক এবং ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগুক এই কামনা করি।

ড. সুশীল কুমার হাঁসদা
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের
কলেজসমূহের প্রাক্তন পরিদর্শক
মেদিনীপুর
মুঠোফোন : ৯৮০০৭ ৭৬৫৮৯

গামারকুঁড়ি, কাশীপুর
অক্টোবর-২১, ২০২০

প্রকাশকের নিবেদন

ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বিকৃতি ঘটে থাকলেও আদিবাসী মূলনিবাসী অধ্যুষিত বিশাল ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত প্রাক্-বৈদিক যুগের গৌরবময় সিন্ধুসভ্যতা তথা দ্রাবিড় সভ্যতার সাংস্কৃতিক ধারা 'দূর্ব্বাঘাসের' মতই টিকে রয়েছে। টিকে রয়েছে শান্তিময় সমাজ ব্যবস্থা। এতদঞ্চলে সাঁওতাল, কুড়মি, মুন্ডা, ভূমিজ, খেড়িয়া, মুদী, মাহালী, ঘাসি প্রভৃতি আদিবাসীর সাথে রাজোয়াড়, বাউরী, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমহার, সহিস, তেলি, সেঁকরা, যুগী, মুচী, ভূঁইয়া, ছুতার, গোয়ালা, পোদ্দার বেনিয়া, নুনিহার বেনিয়া এছাড়া ধর্মান্তরিত জৈন(সরাক), মুসলীম, খৃস্টান প্রভৃতি মূলনিবাসী জাতির মধ্যে কম-বেশী সেই সংস্কৃতি টিকে রয়েছে। অন্যদিকে রাজা-রাজড়াদের বিবর্তনের সাথে সাথে রাজকার্য ও ব্যবসার সুবাদে ভিন্ন প্রদেশ, ভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা চর্তুবর্ণীয় শুদ্র সমাজের ময়রা, তেলি, তামলী, বদ্যি, শুঁড়ি, বাঙালী নাপিত, বাঙালী কামার, রাজপুত, এছাড়া বিভিন্ন পদাধিকারী ব্রাহ্মণ এবং স্বাধীনোত্তর যুগের বেশ কিছু আঙ্গাল-বাঙ্গালদের অনুপ্রবেশের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এতদঞ্চলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ (৪৬%) আদিবাসী কুড়মি জাতিকে ভারতের উচ্চবর্ণীয় শাসক-শোষক বুদ্ধিজীবীদের কূটনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ১৯৫০ সালে এস.টি তালিকায় বঞ্চিত করার কারণে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে কুড়মিদের মধ্যে অনেকেই আজ বিভ্রান্ত। ইতিহাসের বিস্মরণ ও সাংস্কৃতিক নির্বাকায়ণের সাথে সাথে সামাজিক রীতিনীতির ও ধর্মের যেমন বিকৃতি ঘটেছে তেমনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেগ-নেগাচারের ঘটে গিয়েছে অবক্ষয়।

সেই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়কে রোধ করার উদ্দেশ্যে মানভূমের সংস্কৃতিপ্রেমী সৃষ্টিধর মাহাত যেমন প্রথম কলম ধরেছিলেন তেমনি তাঁর নেতৃত্বে ৮০-র দশকে কবি হাজারী প্রসাদ রাজোয়াড়, ঝুমুর সম্রাট কৃত্তিবাস কর্মকার, সুনীল মাহাত, কিরীটি মাহাত প্রমুখদের নিয়ে "মানভূম জনজাতি সংস্কৃতি সংঘ" নামে এক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন ঘরানার সংস্কৃতি অনুষ্ঠান করতে শুরু করেন। কিন্তু সেই সংগঠন বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভারতের সংবিধান রচয়িতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলিত মূলনিবাসীদের মুক্তিসূর্য বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের জন্ম শতবর্ষ পালন করার সময় তাঁর রচিত সমস্ত পুস্তক প্রকাশ করার ফলে — দেশের মূলনিবাসী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিরা ডঃ আম্বেদকরের কৃতিত্ব, নীতি, আদর্শ, দর্শন এবং তাঁর

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস জানতে পারেন। উপলব্ধি করতে পারেন যে, মাত্র ৩.৫ ভাগ ব্রাক্ষ্মণসহ ১৫ ভাগ উচ্চবর্ণীয় জাতির জনগোষ্ঠি কেমন ভাবে মনুবাদ তথা ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী নীতি ও ধর্মীয় সংস্কার সংস্কৃতির মাধ্যমে দেশের ৮৫ ভাগ এস.টি, এস.সি, ওবিসি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মূলনিবাসী জনগোষ্ঠীকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে যুগ যুগ ধরে পশুবৎ দলনপীড়ন করে চলেছে। তিনি মহারাষ্ট্রের এক হতদরিদ্র অস্পৃশ্য পরিবারে জন্ম নিলেও, তাঁর অধ্যাবসায় ও বুদ্ধি বলে তিনি সারা বিশ্বের ছয়জন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে একজনের যোগ্যতা অর্জনপূর্বক উচ্চবর্ণীয়দের সাথে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলিত আদিবাসী মূলনিবাসীদেরকে দিয়ে গেছেন নাগরিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা। সেই সময় ডঃ আম্বেদকরের জন্ম না হলে বা তিনি না থাকলে মূলনিবাসীদের মধ্যে হয়তো কারোরই শিক্ষালাভ করা, চাকরী করা, ব্যবসা করা, রাজনীতি করা, ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা, সংঘ-সমিতি করা, এমনকি নূন্যতম বসতভূমির মালিক হওয়াও সম্ভব হতো না। ভারতের আদিবাসিন্দা মূলনিবাসীরা যাতে কোনোদিনই শিক্ষিত সচেতন, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে আর্য-উত্তরসূরী উচ্চবর্ণীয়দের অন্যায় ও শোষণের বিরোধীতা করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা আদিবাসী মূলনিবাসীদের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কার, সংস্কৃতি, নেগ-নেগাচারগুলিকে বিকৃত ও পাথর চাপা দিয়ে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু, শেষ লগ্নে হলেও তিনি তাঁর শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে উচ্চবর্ণীয়দের সেই অমানবিক চক্রান্তে ভরা শোষণের কৌশল জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন এবং প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়ে থাকার একমাত্র কারণ হলো — ব্রাক্ষ্মণ্যবাদ এবং ব্রাক্ষ্মণ্যবাদই হলো মূলনিবাসীদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রধান শত্রু।

নতুন সূর্যোদয়ের মত ডঃ আম্বেদকরের এইরূপ তত্ত্বের আলোকে আলোকিত হয়ে আদিবাসী মূলনিবাসী বুদ্ধিজীবিগণ সারা ভারতের দিকে দিকে ১৯৯০-এর পর থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পট পরিবর্তন করতে শুরু করেন। শুরু হয়ে যায় মূলনিবাসীদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলন। এদিকে ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের বুকে বিনোদ বিহারী মাহাত ও শিবু সোরেনের নেতৃত্বে ১৯৮৪ সাল থেকে আদিবাসী ভাষা সংস্কৃতির আধারে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের যে আন্দোলন শুরু হয়ে ছিল — তা দ্বিগুণ মাত্রায় বেড়ে ওঠে। পুরুলিয়ার বুকে ১৯৯১ সাল থেকে ডাঃ ভৈরবচন্দ্র মাহাতর নেতৃত্বে সারা পশ্চিমবঙ্গে ও.বি.সি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এমত পরিস্থিতিতে ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে সুপ্রাচীন যুগ থেকে গৌরবময় সিন্ধু সভ্যতা তথা

দ্রাবিড় সভ্যতার টিকে থাকা ভাষা-সাহিত্য, সংস্কার-সংস্কৃতি, নেগ-নেগাচার-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে এই গ্রন্থের প্রকাশক "লয়া সূরজ" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু করেন। তারপর বৎসরেই তিনি একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টিধর মাহাত, অধ্যাপক জয়দেব মাহাত, কবি হাজারী প্রসাদ রাজোয়াড়, কৃত্তিবাস কর্মকার, অবসরপ্রাপ্ত এস.পি. শালিগ্রাম মাহাত, চিত্তরঞ্জন দত্ত, আইনজীবি সুরেশ্বর সাও, সাগর মণ্ডল, ও.বি.সি আন্দোলনের মুখ্য নেতা ডাঃ ভৈরবচন্দ্র মাহাত, নৌসাদ আনসারী, প্রমোদবরণ বিশ্বাস, ছো-ওস্তাদ বসন চন্দ্র মাহাত, কিরীটি মাহাত, রাজেন মাহাত, মীরা বাউরী, প্রমিলা বাউরী, অনন্ত কেশরিয়ার, নিবারণ মাহাত (পাথরডি), গুরুপদ মাহাত, বৈদ্যনাথ হাঁসদা (সাঁতুড়ী), গোমস্তা প্রসাদ সোরেন, হরিপদ মাহাত প্রমুখদের নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১১ই জানুয়ারী "মানভূম দলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংঘ" নামে এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন।

সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ বিশ্বাস করতেন যে মানভূম সহ তামাম ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে আদিবাসী মূলনিবাসীদের মধ্যে অবক্ষয়ের মধ্যেও টিকে থাকা দ্রাবিড় সভ্যতার সমাজব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক দর্শনই পারবে সারা ভারতসহ সারা বিশ্বকে সাম্য ও শান্তির পথ দেখাতে। তাই সেই টিকে থাকা ভাষা-সাহিত্য, নাচ-গীত, সংস্কার-সংস্কৃতি, নেগ-নেগাচার, পরব-তিহার গুলির তাৎপর্য ও স্বরূপ, লিপিবদ্ধকরণ, পুনঃজাগরণ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সংঘ সদস্যগণ কাজ শুরু করেন। কিন্তু দেখা যায়, অধিকাংশ মূলনিবাসীদের মন এবং তাদের সংস্কার সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি করাল গ্রাসের মতো আষ্টেপিষ্ঠে গ্রাস করে ফেলেছে। তাই উপলব্ধি হয় যে, মূলনিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতিকে কুসংস্কার ও গণতন্ত্র বিরোধী ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে "লয়া সূরজ" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বাবাসাহেব আম্বেদকরের বাণী ও দর্শন এবং আদিবাসী সমাজ ও সাংস্কৃতিক দর্শনের প্রচার শুরু করা হয়। সেই সঙ্গে সংঘের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক ভাবে চালানো হয়— আদিবাসী মূলনিবাসী সংস্কৃতি উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচী ও অনুষ্ঠান। শুরু করা হয়, টুসু, করম সহ বার-অ মাসে তেরঅ পার্বণের উপর গবেষণা। সেই সঙ্গে সংস্কৃতি-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংঘের পরিকল্পনা মতো, সৃষ্টিধর মাহাত জামবাদ মিলন আখড়ার মাধ্যমে শুরু করেন কুমারী মেয়েদের নিয়ে করম নাচের দল। তারপরই ক্ষুদিয়াটাঁড়ের অনিল বানুহার ও শ্রীমতি ভক্তিরানী বানুহারও তাদের গ্রামের কুমারী মেয়েদের নিয়ে গঠিত করম নাচের দলে বিশেষত কুড়মালি ভাষা ও গীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বসনচন্দ্র মাহাত ও কৃত্তিবাস কর্মকারের

নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ছো-নাচের পালা রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়। সংঘ থেকে প্রকাশ করা হয়, অধ্যাপক জয়দেব মাহাত রচিত "দলিতের মুক্তি সূর্য ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের জীবন, দর্শন ও ব্রাহ্মণ্যবাদ", জালালউদ্দিন আনসারী রচিত "বঞ্চিত পুরুলিয়া", অধ্যাপক অশোক কুমার মাহাতর হিন্দীতে রচিত "ঝাড়খণ্ড আন্দোলন কা ইতিহাস", সৃষ্টিধর মাহাত রচিত "মানভূমের লোককথা" এবং আমার রচিত "মানভূমের জনগোষ্ঠি ও লোক সংস্কৃতি" প্রভৃতি গ্রন্থাবলী। সাথে সাথে চালানো হয় ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ও আদিবাসী সমাজ সাংস্কৃতিক তত্ত্বের উপর বিভিন্ন গ্রামে আলোচনাচক্র শুরু করা হয়। পণপ্রথা ও মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন শুরু করা হয় এবং মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সংঘ সদস্যগণ নিজ বাড়ীর বিবাহে বিনা পণে বিবাহ সম্পাদন করতে শুরু করেন।

এইভাবে, শুধু অন্যকে বলা নয়, নিজেদের পরিবারের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে উদাহরণ সৃষ্টির কর্মসূচী হিসাবে গ্রন্থ প্রকাশকের বাবা ফুসড়াবাইদ নিবাসী শ্রী তারাপদ মাহাত ও মা শ্রীমতি সিন্ধু মাহাত ১৯৯৫ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে আগাম লিখিত ঘোষণা করেন যে, তারা মারা গেলে তাদের পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়স্বজন যেন ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রাদ্ধের পরিবর্তে আদিভারতীয় সারী ধরম তথা আদিবাসী সমাজ মতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তার পরবৎসর অধ্যাপক জয়দেব মাহাতর বাখৈলের দাদু সিন্দুরপুর গ্রামনিবাসী (পুরু-২নং) বিষ্টু মাহাত মারা যাওয়ার পূর্বে ডঃ আম্বেদকরের আদর্শে ও আদিবাসী সমাজ মতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কথা বলে গেলে ১৪ই এপ্রিল, ১৯৯৬ তারিখে পুরুলিয়া জেলার বুকে তথা মূলনিবাসী সমাজে সর্বপ্রথম সংঘের সম্পাদনায় অধ্যাপক জয়দেব মাহাত ও গ্রন্থ প্রকাশকের পরিচালনায় বিষ্টু মাহাতর ইচ্ছানুসারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এক বছর পরে গ্রন্থ প্রকাশকের ছোটদাদু শ্রীরাম মাহাত মারা গেলে ফুসড়াবাইদ গ্রামে ২৭শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংঘ কর্তৃক ডঃ আম্বেদকরের আদর্শে ও আদিবাসী সমাজের সার সগুণে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ক্রিয়ার পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এইরূপ ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আদিবাসী সংস্কার সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বরাবাজার ব্লকের লাকা গ্রামনিবাসী গোউর চন্দ্র মাহাতর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪জন মহিলা ব্রতীকে নিয়ে ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখ থেকে গ্রন্থ প্রকাশক সংঘের মাধ্যমে আদিভারতীয় সারী ধর্ম মতে, জিতিয়া পূজার পুনঃপ্রবর্তন করেন। এবং এছাড়াও সারী ধর্ম মতে গৃহ প্রতিষ্ঠা, ধরমগুরু পূজা, ধরমপূজা, গরাম পূজা, করম পূজা, সরস্বতীর পূজার পরিবর্তে পঁথি পূজা, বিশ্বকর্মার পূজার পরিবর্তে কারিয়াসূর ময়দানবের ও জাতা পূজা, লক্ষী পূজার দিন জিউহুড়ের অংশ হিসাবে ধানী পূজা, মনসা প্রতিমা পূজার পরিবর্তে বারিপূজার

পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। ১৯৯৪-১৯৯৭ পর্যন্ত তারই দীর্ঘ গবেষণায় ব্রাহ্মণ্যবাদী দুর্গোৎসবকে মানবতাবাদ বিরোধী, ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী এক বিদেশী আর্য সাম্রাজ্যবাদী উৎসব হিসাবে প্রমাণপূর্বক আদিভারতীয় মহান অসুর সম্রাট হুদুড়দুর্গা মহিষাসুরের শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানের গত ৫ই অক্টোবর, ২০১১ তারিখ থেকে সংঘের সহযোগিতায় এবং অজিত হেমব্রম ও শত্রুঘ্ন মুর্মুর পৃষ্টপোষকতায় ভেলাগোড়া গ্রাম থেকে প্রবর্তন করা হয়। আদিযুগের কুড়মালি ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অল ইন্ডিয়া কুড়মালি চিসইয়া সোসাইটি (ঝাড়গ্রাম) ও সংঘের মিলিত উদ্যোগে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে ৫৪টি কুড়মালি মিডিয়াম প্রাইমারী স্কুলের অর্গানাইজ শুরু করা হয়েছে। এস.টি, এস.সি, ও.বি.সি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবি ও সংস্কৃতি প্রেমীদের নিয়ে গঠিত "মানভূম দলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংঘ" মূলনিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি হয় যে ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতেই সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্কার ও নেগ-নেগাচার গড়ে ওঠে। কিন্তু ইতিহাসের বিস্মরণ ও সাংস্কৃতিক নির্ধারণের ফলে অধিকাংশ মূলনিবাসী আজ আদিযুগের নিজেদের ধর্মের নাম ভুলে গিয়ে অজান্তে হিন্দু হয়ে পড়েছে। তাই সেই হিন্দুয়ানী ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে মূলনিবাসী সংস্কার সংস্কৃতি নেগ-নেগাচারেরও খানিকটা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। তাই সংঘের পক্ষ থেকে আদিযুগ থেকে প্রচলিত আদিভারতীয় সারী তথা সত্য ধর্মের পুনঃজাগরণের উদ্দেশ্যে সংঘ সদস্য জওহরলাল মাহাতর পৃষ্ঠপোষকতায় মুরগুমা গ্রামে ১৫ ও ১৬ই মে ২০১৫ সারীধর্মের সম্মেলন করা হয় এবং "আদিভারতের সারীধরম পরিচয়" নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এই সম্মেলনে ও এই গ্রন্থে প্রমাণসহ ব্যাখ্যা করা হয় যে, বুঢ়াবাবা শিব প্রবর্তিত এই সারীধরমের দর্শন অনুযায়ী মূলনিবাসী সারনা সমাজে যে সংস্কার-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও নেগ-নেগাচার প্রবর্তিত হয়েছে, তাতে মুর্তি পূজার কোন স্থান নেই — শক্তি ও প্রকৃতির পূজা করা হয়, শক্তির মূল উৎস হিসাবে 'সূর্য'কে "মাহারাই" তথা প্রধান আরাধ্য হিসাবে ধর্ম বা ধর্মরাজ বা সিংবঙ্গা নামে পূজা করা হয়। এই ধর্মের কোন লিখিত দর্শন না থাকার কারণে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন প্রদেশে যেমন মূলনিবাসীদেরকে শক্তির পূজা করতে দেখে "শাক্তধর্ম" বলেছেন, সূর্যের পূজা করতে দেখে সৌর্যধর্ম বলেছেন। ধর্মগুরু শিব ও শিবশিলার পূজা করতে দেখে লিঙ্গায়েৎ ধর্ম বলেছেন তেমনি ছোটনাগপুরের স্মৃতি বিস্মৃত মূলনিবাসীদের অনেকেই ধর্মপালনের স্থানের নাম, 'সারনা' থানের সূত্র ধরে তাদের ধর্মের নাম সারনা ধরম বলতে শুরু করেছেন। কিন্তু এই ধর্মের নাম যে সারনা নয়, বা শাক্ত, শৌর্য বা লিঙ্গায়েৎ ধর্ম নয়, — তা ১২ খানা যুক্তি ও

প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে সেই আদিযুগ থেকে প্রবর্তিত আদিবাসীদের ধর্মের নাম ছিল সারী ধরম। সারী অর্থে সত্য হওয়ার কারণে এই ধর্মকে সত্যধর্মও বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতির নীতি নিয়মের আধারে ধর্মগুরু বুড়াবাবা শিব তথা বড় পাহাড়, গোসাঁই রাই তথা মারাং বুরু, এই সারী ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতেই সমাজ ও সংসার গঠন এবং বিবাহ ব্যবস্থার প্রচলন করে গেছেন। তেমনি সংস্কার-সংস্কৃতি ও নেগ-নেগাচারের প্রচলন করে গেছেন। এই দর্শনের আধারেই আদিবাসী মূলনিবাসী সমাজে, আখান, সিঝানঅ, সারহুল, গাঁজন, রহইন, রজস্বলা, জাতাল-মনসা, করম, জিতিয়া, ছাতা, জিউহুড়, বাঁদনা (সারিসহরাই পূজা) ও টুসু এইরূপ ১২ মাসে ১৩ পার্বণ পালিত হয়ে চলেছে।

এই সংস্কার-সংস্কৃতি, নেগ-নেগাচারের স্বরূপ ও তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য এই সংঘ যেভাবে কাজ করে চলেছে তেমনি কুড়মি, সাঁওতাল, রাজোয়াড়, বাউরী ও মুন্ডা প্রভৃতি জাতির সমাজ সংগঠন এবং সমাজ নেতা, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, সাধু রামচাঁদ মুর্মু, সৃষ্টিধর কেটিয়ার, ডঃ রামদয়াল মুন্ডা, বঙ্কিম মাহাত, রাধাগোবিন্দ মাহাত, ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাত, লক্ষীকান্ত মুৎরুয়ার, বসন্ত মাহাত, সাধু বসন্ত মাহাত, ডঃ সুধীর করণ, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ। ইতিপূর্বে আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কার-সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। দিয়ে গেছেন বহু বিতর্কিত তথ্য। তাদের সকলকেই জানাই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তারও পূর্বে বৃটিশ গবেষক এইচ. এইচ. রিজলে, জর্জ গ্রেহার্সন, ডালটন প্রমুখদের সমীক্ষায় ছোটনাগপুর অঞ্চেলর আদিবাসী জাতিসমূহের ব্যতিক্রমী ভাষা সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতির পর্যবেক্ষণে যে ১৮৭২ সাল থেকে যে নিরপেক্ষ তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট ও থিসিস দিয়ে গেছেন — সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠি আজ আদিবাসিন্দা আদিবাসীর মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সাঁওতাল, মুন্ডা, কুড়মি, মালে, ভূমিজ, গন্ড, পান, ওরাং, হো, খেড়িয়া, ঘাসি, কান্দ, কোড়া প্রভৃতি আদিবাসীকে ১৯০৮ সালে ছোটনাগপুর প্রজাসত্ব আইন ও সাঁওতাল পরগণা প্রজাসত্ব আইনে জল-জঙ্গল ও জমির বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এবং ১৯১৩ সালের ২রা মে, বৃটিশ সরকারের গৃহবিভাগ ৫৫০ নং নোটিফিকেশনে কুড়মি সহ এই সমস্ত ১৩টি জাতিকে Aboriginal Tribe হিসাবে ঘোষণা করেছেন। সেই সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের প্রচার অনুযায়ী সমস্ত ভারতবাসীর ধারণা ছিল যে, দস্যু, দানব, অসুরের বংশধর হিসাবে জংলীমানুষেরা যেমন ভারতের আদিবাসিন্দা তেমনি মুনি, ঋষি ও দেবতাদের বংশধর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রাও ভারতের আদিবাসিন্দা। এবং বৈদিক সভ্যতাই দেশের আদি সভ্যতা, সেই বৈদিক সভ্যতার সাংস্কৃতিক মতে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা ও সমস্ত সংস্কৃতির প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু

১৯২২ খ্রীঃ জন মার্শাল ও ডঃ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সেই ধারণা ও ভারতীয় ইতিহাসের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রমাণিত হয় যে আর্যদেবতাদের বৈদিক সভ্যতার চেয়ে, দস্যু-দানব, অসুর প্রভৃতি অনার্যদের সৃষ্ট সিন্ধু সভ্যতা তথা দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল বহু প্রাচীন ও বহু উন্নত সভ্যতা।

এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার ফলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শাসক শোষক গোষ্ঠির মাথাব্যথা শুরু হয়। তাই তাদের শাসন শোষণ কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ কুড়মি জাতিকে অন্যান্য আদিবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্বক আদিবাসী ঐক্য ও ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রদেশের আদিবাসী নেগ-নেগাচার বিস্মৃত কুড়মি তথা কুর্মীদের সাথে মিলিত করার চেষ্টা করেন এবং আদিবাসী কুড়মি জাতির পরিচিতি পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষত্রিয় হওয়া ছত্রপতি শিবাজীকে দেখিয়ে ক্ষত্রিয়করণের অভিযান শুরু করেন। তবু কুড়মিরা ১৯৩১ সালের জনগণনায় অন্যান্য ১৩টি জাতির সাথে Primitive Tribe হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে ১৯৩০-৩১-৩২ সালে লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ৮৫ ভাগ অস্পৃশ্য দলিত আদিবাসী মূলনিবাসীরা যাতে মানবিক মর্যাদার সাথে নাগরিক অধিকার নিয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লীর রাজক্ষমতায় যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী বিল পাশ করিয়ে আনেন। এই নির্বাচনী বিলে শাসক গোষ্ঠির মাথাব্যথা আরও বেড়ে যায়। তাই সেই বিল বাতিল করার উদ্দেশ্যে তাদের পরিকল্পনা মাফিক যেমন কংগ্রেস নেতা বিপিন পালকে দিয়ে ময়রা, তেলি, তামলি, শুঁড়ি, বদ্যি প্রভৃতি চতুরর্ণীয় শুদ্রদের অস্পৃশ্যতা হটিয়ে জল-চল চালু করা হয় এবং মৃত্যুসংস্কারে ৩০ দিনের পরিবর্তে চতুবর্ণের বৈশ্যদের মত ১৫ দিনে ধার্য করা হয়। তেমনি উড়িষ্যার নিরঞ্জন মাহাতকে হিন্দুমহাসভা থেকে তৎকালীন ৫০০ টাকা মাসোহারা দিয়ে এজেন্ট বানিয়ে দীনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কুড়মিদেরকে ক্ষত্রিয়করণ অভিযান জোর কদমে চালাতে শুরু করেন। ফলে কতিপয় কুড়মি তাদের রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে ক্ষত্রিয় পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে পৈতাধারণ, সাঘাঁ প্রথা, মুরগি খাওয়া, মহিলাদের করম নাচ, বিহার গীত বর্জন এবং মৃত্যুসংস্কারের ১০ দিনের পরিবর্তে ১২ দিনে ঘাটসিনান ও ব্রাহ্মণ নিয়ে শ্রাদ্ধ শুরু করেন।

উচ্চবর্ণীয় শাসক গোষ্ঠির কূটনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে কুড়মিরা যে ভবিষ্যতে নিজেদের সমূহ ক্ষতি করতে চলেছে, সেই কথা উপলব্ধি পূর্বক ক্ষুদিরাম মাহাত, রজনীকান্ত মাহাত ও ধনঞ্জয় মাহাত ক্ষত্রিয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং

কুড়মিদের আদিবাসী পরিচিতির ভিত্তিতে তাঁদের 'হুলকা' গ্রামের মাঠে ১৯৪০ সালে বিশাল জনসভা করেন। এইরূপ জনসভার প্রভাবে কুড়মিদের নতুন করে ক্ষত্রিয় হওয়া বন্ধ হলেও, ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রভাবে ইতিপূর্বে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত হাতে গোনা কতিপয় কুড়মি পৈতাধারণ পূর্বক ক্ষত্রিয় পরিচয় নিতে চাইলেও, সেই ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রভাবে অধিকাংশ কুড়মি অজান্তে হিন্দু হয়ে পড়ে এবং রামায়ণ-মহাভারতের পাঠচক্র, হিন্দু দেবদেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণদের পদসেবা করতে শুরু করে। অথচ ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যতদিন পর্যন্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠি ইতিহাস ও ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন ছিল, সংস্কার-সংস্কৃতি, নেগ-নেগাচার পুরো মাত্রায় মেনে চলতো, সেই সময় আদিবাসীরা হিন্দু দেবদেবী পূজা তো দূরের কথা, বিদেশী-বিধর্মী-মিথ্যাবাদী-ঠকবাজ হিসাবে "দিকু" আখ্যা দিয়ে ঘৃণাবশতঃ কুড়মি সহ সমস্ত আদিবাসীরা ব্রাহ্মণদেরকেই অচ্ছ্যুৎ করে রেখেছিল। ব্রাহ্মণদের জলস্পর্শ পর্যন্ত তারা গ্রহণ করতো না। ১৭৭০ খ্রীঃ-এ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ৭৬-এর মন্বন্তরের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী খাদ্যদানের জন্য লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করলে কুড়মিসহ আদিবাসীরা যখন জানতে পারে যে, ব্রাহ্মণ পাচক দিয়ে খিচুড়ী রান্না করা হয়েছে তখন সেই আদিবাসীরা না খেয়ে মারা গেছে, তবু ব্রাহ্মণের রান্না করা খাবার খায় নি। ("ঝাড়খণ্ডের কুড়মি" — রাধাগোবিন্দ মাহাত)

কুড়মি ও কুর্মীদেরকে ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ইচ্ছা উচ্চবর্ণীয় শাসক গোষ্ঠির কোনদিনই ছিল না; ক্ষত্রিয়ত্বের টোপ দিয়ে আদিবাসী কুড়মি জাতিকে হিন্দুকরণ করা এবং ডঃ আম্বেদকরের পাশ করিয়ে আনা "সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী বিল" বাতিল করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। সেকথা পরেরকথায় চলা কুড়মি-মাহাতরা বুঝতে না পারলেও তৎকালীন সময়ে মানভূম থেকে মনোনীত এম.পি ক্ষুদিরাম মাহাত হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতে কুড়মিরা আদিবাসীর অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে। তাই, তাদের কুড়মালি ভাষার সূত্র ধরে যাতে কুড়মিরা ভবিষ্যতে ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় আদিবাসীর স্বীকৃতি ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং মাঝখানে যাতে ও.বি.সি হিসাবেও সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা পায় — এই মর্মে সংবিধান রচনার কালে তিনি বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের কাছে অনুরোধ রাখেন। ফলে এইরূপ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতের মূলনিবাসীদের শুভাকাঙ্ক্ষী ডঃ আম্বেদকর আদিবাসীদের ভাষার স্বীকৃতির জন্য ২৯, ৩০, ৩৪৭ ও ৩৫০ নং ধারা প্রণয়ন করেন। কুড়মিসহ অন্যান্য দিগভ্রান্ত আদিবাসীরা যাতে ও.বি.সি হিসাবে সংরক্ষণের সুযোগ পায় তার জন্য ৩৪০ নং ধারা প্রণয়ন করেন।

এছাড়াও কুড়মিসহ অন্যান্য দিগভ্রান্ত ও এস.টি তালিকা থেকে বঞ্চিত জনজাতি গোষ্ঠি যাতে ভবিষ্যতে পুনরায় আদিবাসীর স্বীকৃতি ও অধিকার আদায় করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি সংবিধানে ৩৪১ ও ৩৪২ নং ধারা প্রণয়ন করে দিয়ে গেছেন। তার কিছুদিন পরেই দেখা যায়, ক্ষুদিরাম বাবুর ধারণাই সত্য হলো। ১৯৩১ সালের জনগণনার আধারে কুড়মিসহ ১৩টি প্রিমিটিভ ট্রাইবের তালিকা অনুযায়ী জওহরলাল নেহরু সরকার কর্তৃক ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫০, এস.টি তালিকা ঘোষণার সময় কেবলমাত্র কুড়মি জাতিকেই এস.টি তালিকা থেকে বাদ করে দেন।

একক সংখ্যাগরিষ্ঠ কুড়মি জাতির আদিবাসী হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত থাকার ৩২ বৎসর পর ১৯৮২ সালে রাঁচী বিশ্বিবদ্যালয়ে ডঃ রামদয়াল মুন্ডা ভি.সি. পদে অভিষিক্ত হলে, তিনি সাঁওতালী, কুড়মালি, মুন্ডারী প্রভৃতি স্থানীয় আদিবাসী ভাষাগুলির স্নাতকোত্তর বিভাগে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। তখনও দেখা যায় প্রাক্তন এম.পি ক্ষুদিরাম মাহাতর দূরদৃষ্টি অনুযায়ী অন্যান্য আদিবাসীদের সাথে নেগ-নেগাচারের ভিত্তিতে ভাষাচর্চা করতে গিয়ে কুড়মি সমাজ নেতা ও ভাষাবিদগণ বুঝতে পারেন যে কুড়মিরা ও.বি.সি বা ক্ষত্রিয় নয় আদিবাসী। সেই সময় ও.বি.সি নেতা (কুড়মি) কুম্ভপ্রসাদ মহারাজ বিশেষ সূত্রে জানতে পারেন যে কুড়মিরা ও.বি.সি নয় আদিবাসী। এছাড়া দিল্লীর জে.এন.ইউ-এর প্রফেসার ডঃ বীরভদ্র তলোয়ারের কাছ থেকে বৃটিশ সরকারের নথি সাক্ষ্য পরিদর্শন পূর্বক সমাজনেতা বিনোদ বিহারী মাহাত বুঝতে পারেন যে কুড়মিরা ক্ষত্রিয় নয় আদিবাসী। কুড়মিদের ও.বি.সি পরিচিতির চেয়ে আদিবাসী হিসাবে এস.টি পরিচিতিই হবে প্রকৃত পরিচিতি। তাই তিনি "সাঁওতাল-কুড়মি ভাই ভাই" — স্লোগান তুলে শিবু সোরেনকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৮৪ সাল থেকে আদিবাসী ভাষা-সংস্কৃতির আধারে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। তেমনি অন্যদিকে কুড়মালি ভাষাবিদ লক্ষীকান্ত মুৎরুয়ার, বসন্ত মাহাত, কেশব মাহাত, ডঃ শশীভূষণ মাহাত, রামেশ্বর মাহাত, শ্রীপদ মাহাত, সৃষ্টিধর মাহাত, সুনীল মাহাত, অশোক মুৎরুয়ার, সুধারানী মুৎরুয়ার, ভক্তিরাণী বানুহার, উপেন মাহাত, ভোলানাথ মাহাত (দাপাং), শ্রীকান্ত মাহাত (মাড়ু), অনিল বানুহার, হীরালাল শাঁখোয়ার, ললিত মাহাত (ঝাড়গ্রাম), ভীম মাহাত (উড়িষ্যা) প্রমুখদের নিয়ে "আদিবাসী কুড়মি সমাজ" নামে সামাজিক সংগঠন স্থাপন পূর্বক, কুড়মি জনগোষ্ঠির এস.টির স্বীকৃতি ও কুড়মালি ভাষার অষ্টম তপশীলভুক্তির দাবীতে ১৯৮৪ সাল থেকেই সামাজিক জন-আন্দোলন শুরু করেন। তৎকালীন দক্ষিণ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে জেলান্তর পর্যন্ত সংগঠন বাড়ানোর সাথে সাথে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নিকট দাবী জানাতে শুরু করেন। পরে

২০১৩ সালে জামশেদপুরের কুড়মি সমাজনেতা অ্যাডভোকেট সুনীল মাহাতর নেতৃত্বে দিল্লীতে জমাকৃত মেমোরান্ডামের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র সরকারের গৃহবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড ও উড়িষ্যা সরকারকে কুড়মি জাতির জাতিতাত্ত্বিক তথা এথনোলজিক্যাল রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলি সেই রিপোর্ট দিতে বিলম্ব করার কারণে বাংলা, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, আসামে কুড়মি জনগোষ্ঠির আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার ডুঁড়কুর মাঠে পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মি সমাজের ডাকে প্রায় তিন লক্ষ মানুষের সমাবেশে ত্রিদিবসীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে ২০১২ সালে ঝাড়খন্ড সরকার ও ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কুড়মালি ভাষাকে রাজ্যস্তরের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু কুড়মিদেরকে এস.টি করণের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারগুলির সমীক্ষক দল পরিদর্শনে এলে, কুড়মিদের বর্তমান দিনের আদিবাসী চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও নেগাচারের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ১৯২২ খ্রীঃ-এ অনার্য আদিবাসী মূলনিবাসীদের সৃষ্ট "সিন্ধু সভ্যতা" আবিষ্কারের পর থেকে আর্য উত্তরসূরী উচ্চবর্ণীয় শাসক শোষক গোষ্ঠি যে ভাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী কুড়মি জনগোষ্ঠিকে অন্যান্য আদিবাসী সমুদায়ের ঐক্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার কূটকৌশল নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আক্রমণ চালিয়েছিলেন তাতে কুড়মি জনগোষ্ঠির মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কার-সংস্কৃতির খানিকটা প্রভাব পড়ে যায়, তেমনি ঘটে যায় ইতিহাসের বিস্মরণ ও সাংস্কৃতিক নির্বাকায়ন। বেশ কিছু কুড়মি ভুলে যেতে চলেছে ধর্ম, ধর্মের নাম, ১২ মাসের ১৩ পরবের পূজাপদ্ধতি, সংস্কার-সংস্কৃতি, জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু সংস্কারের নেগ-নেগাচার, টোটেম, টাবু ও বঁশদাগ। তাই কুড়মি জনগোষ্ঠির মধ্যে আদিবাসী সংস্কার-সংস্কৃতি, নেগ-নেগাচারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুপ্রাচীন গৌরবময় উন্নত দ্রাবিড় সভ্যতার স্রষ্ঠাদের বংশধর হিসাবে সাংস্কৃতিক স্বমহিমায়-স্বগর্বে যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এবং এস.টি স্বীকৃতির মাধ্যমে আদিম-অধিবাসী আদিবাসীর পরিচয়ে মর্যাদা পেয়ে থাকে — সেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টিধর মাহাত অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কুড়মি জাতি ও কুড়মি কবিলার অন্যান্য মূলনিবাসী জাতির স্বার্থে অতি সহজবোধ্যভাবে "কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার" নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে কুড়মি সমাজের জনগোষ্ঠির মধ্যে ধর্ম, সংস্কার-সংস্কৃতি ও নেগ-নেগাচারের নবজাগরণ ঘটলে সৃষ্টিধর বাবুর লেখনী ও পরিশ্রম এবং আমার প্রকাশনা সার্থক হবে।

প্রকাশক

চারিয়ান মাহাত

মুঠোফোন - ৮৯২৭১ ৭৯৬৬৩

গ্রন্থাকারের আবেদন

অনেক দিন আগে থেকেই কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার বিষয়ে একটি বই প্রকাশ করার বাসনা লালন করে আসছিলাম। বছর দশেক আগে একটা খসড়া তৈরী করেও ছিলাম। কিন্তু নানান কারণে পূর্ণাঙ্গ পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়ে ওঠে নি। এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজনবোধে এবং আমার ছেলে গৌতম ও আমার ভ্রাতৃপ্রতিম উত্তম মাহাতর অনুরোধে ছাপানো আকারে প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করি।

২০১৯ সালে আমাদের জামবাদ মিলন আখড়ার করম উৎসবের করম পূজার ভাসানের দিন সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী সাগরী, ভাইয়ের বউ সুরুবালি, বোন বেহুলা, মেয়ে মমতা, ঝুমুর, ভাইঝি বুলুরানী, বীনাবানি এবং তিন ছেলের বউ বেলারানী, সুলেখা ও পম্পাদের কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার বইটির খসড়া পড়ে শোনায়। তারা সকলেই বইটি প্রকাশ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের মতামত হল — এখন অনেকেই নেগাচারগুলি ভুলতে বসেছে। অনেকে দেখাদেখি করে কিছু কিছু পালন করে ঠিকই কিন্তু কেন করা হয় তা জানে না। বইটি প্রকাশ পেলে অনেকেই ঠিকঠিক জানতে পারবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতে পারবে।

আমি কুড়মি সমাজের ছেলে। কুড়মালি নেগ-নেগাচারে লালিত-পালিত হয়েছি। কেন জানিনা অল্প বয়স থেকেই এই নেগ-নীতি-নেগাচার বিষয়ে জানার কৌতুহল জেগে ওঠে। যতই বয়স বেড়েছে ততই গভীরভাবে বোঝার তাগিদ অনুভব করে চলেছি।

ব্যক্তিগত ভাবে ও পরিবারগত ভাবে নেগ-নীতি-নেগাচারগুলি যতদূর সম্ভব পালন করার চেষ্টা করেছি। যথাযথভাবে পালন করে সুফল পেয়েছি। তাতে করে, আমার একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, নিজের কাজ অর্থাৎ যথা নিয়মে ঠিকঠিক দায়-দায়িত্ব প্রতিপালন করলে নিজের তো বটেই, সমাজ ও দেশের অনেক কাজও হয়ে যায়।

যুবা বয়স থেকেই কুড়মালি ভাষা-সাহিত্য, সমাজ ও সামাজিকতার কাজে, আলাপ-আলোচনায়, আন্দোলনের কাজে যুক্ত থেকেছি। সেই সময়কালে উদাসীন কুম্ভপ্রসাদ মহারাজ, লক্ষ্মীকান্ত মুতরোয়ার, বসন্ত কুমার মেহেতো, ডঃ শশীভূষণ মাহাত, আনন্দ খুঁটদার, শ্রীপদ বঁশরিআর, ক্ষুদিরাম মাহাত, রামেশ্বর মাহাত, বুদ্ধেশ্বর মাহাত, ডঃ বঙ্কিম মাহাত, ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাত, ডঃ বিনয় মাহাত, রাধাগোবিন্দ মাহাত, কেশব মাহাত, রামপদ সিং মাহাত, নগেন পুনুড়িআর, ভূষণ চন্দ্র মাহাত, শতদল মাহাত, অজিত প্রসাদ মাহাত, মুরুলি পুনুড়িআর, অনন্ত কেশরিয়ার, জ্যোতিলাল মাহাত, তরণীতারণ বানুহড়, উপেন মাহাত, সুনীল মাহাত,

কিরীটি মাহাত, চারিয়ান মাহাত, রবীন্দ্রনাথ মাহাত, শম্ভুনাথ মাহাত, শক্তিনাথ মাহাত, বীনাপানি মহান্ত, প্রমুখ কুড়মালি পণ্ডিত, গবেষক, বিশেষজ্ঞ, সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজ প্রেমিক মহাশয়গণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কুড়মালি নেগ-নেগাচার জানার-বোঝার সুযোগ হয়েছিল।

আমার ব্যক্তিগত ধারণার সঙ্গে পণ্ডিত-গবেষকদের কথার বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মিল খুঁজে পাই। বুঝতে পারি, কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার বিজ্ঞানের আধারে যুক্তি, সৌভাতৃত্ব, সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত। বহু মানুষের বাস্তব জীবনের বস্তুগত প্রত্যক্ষ উপলব্ধজাত অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানের প্রকাশ। এই নেগ-নীতি-নেগাচার প্রণেতা বুঢ়া-পুরখারা ছিলেন এক একজন সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার স্বরূপ এবং অত্যন্ত প্রখর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ। তাঁদের নিরক্ষর ও মূর্খ ভাববার কোন অবকাশ নেই। তাঁরা তাঁদের উত্তরসূরীদের জন্য তৈরী করে দিয়ে গেছেন পাকা সড়ক রাস্তা। ঐ পাকা সড়ক পথে চললে মানুষ সুস্থ-সবল দেহ-মন নিয়ে সুস্থ সাম্যবাদী সমাজ গড়ে সুখে-শান্তিতে, আনন্দে সংসার করতে পারবে। কোন বিপদ-আপদ, ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-বেদনা ভোগ করতে হবে না। হেসে-খেলে, নেগে-যোগে জীবনের গাড়ী চলতে থাকবে। জীবনকে উপভোগ করতে পারবে। মানুষ জনম সার্থক হবে। এখানে কোন অসত্য, অবাস্তব ও মিথ্যা কল্পনার কোন জায়গা নেই। বর্তমান প্রজন্মের উঠতি ছেলেমেয়েদের কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচারের প্রতি অবজ্ঞা, উদাসীনতার ভাব চোখে পড়ছে। না মানার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সুলভে অল্প আয়াসে বেশী বেশী সুখের আশায় লোভ, লালসা ও মোহে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে বিপথগামী হচ্ছে। অসামাজিক হয়ে পড়ছে। জানা-বোঝার প্রয়োজন বোধ পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত সবুর সইছে না। ভ্রান্ত সুখের আশায় জ্বলন্ত আগুনের গোলার দিকে প্রবেশের জন্য ছুটে চলেছে। পূর্ব-পুরুষদের বানানো অদৃশ্য হাতছানি দেখে একবার থামতে অনুরোধ রাখছি। তাঁদের হাতের ইশারা ও ইঙ্গিতকে অনুধাবন করতে আবেদন রাখছি।

দেশে মানুষের সুখ-সুবিধা, অধিকার, শান্তি-শৃঙ্খলা, মঙ্গল ও কল্যাণের কারণে অনেক অনেক আইন তৈরী হয়েছে। আবার নতুন নতুন আইন তৈরী হবে। আইন সচল রাখার জন্য বহু রকম অফিস, আদালত, কোর্ট-কাছারী নির্মাণ করা হয়েছে। সৈন্যবাহিনী, পুলিশ কর্মী — সরকারীভাবে নিযুক্ত হয়েছে। দেখা যায়, আইন ও পুলিশ দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় না, যাবেও না। অপর দিকে বলা যায়, সর্বশেষ নিরসনের জন্য ন্যায়-নীতি-নেগাচারের কাছেই আসতে হয়। ন্যায়-নীতি-নেগাচার সমূহ সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারে।

ইতিপূর্বে পুরুলিয়া কুড়মি মিলন সংঘের মুখপত্র "আখড়া" পত্রিকায় নেগ-নেগাচারগুলি ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। কয়েকটি বেশ সমাজের কাজে লেগেছে। আরো বেশী প্রচার করার জন্য ঝাড়গ্রাম থেকে পূর্বাঞ্চল

আদিবাসী কুড়মি সমাজ তাঁদের পত্রিকায় পুনঃমুদ্রণ করে প্রকাশ করেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রাসঙ্গিক ভেবে তার কয়েকটি নিবন্ধ প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করলাম। এই নেগ-নীতি-নেগাচারগুলি বুঝতে সুবিধা হবে বলে মনে করি। "আখড়া" পত্রিকার পঞ্চম বার্ষিক সংখ্যা ২০১৩-১৪ থেকে কিরীটি মাহাতর "কুড়মি জাতির গোত্র প্রথা", চারিয়ান মাহাতর "সত্য-সারি ধর্ম দর্শনের কিছু কথা", নগেন পুনড়িআরের "ডাইর পরব" থেকে কিছু কথা ও অংশ সামাজিক প্রয়োজন বোধে তাঁদের অনুমোদন নিয়ে ধার নিয়েছি। তাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বহু গুণীজন আমাকে তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-সমূহের প্রাক্তন পরিদর্শক শ্রদ্ধেয় ড. সুশীল কুমার হাঁসদা মহাশয় তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে বইটির ভূমিকা লিখে পুস্তকটির গুরুত্ব ও উৎকর্ষতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

'মানভূম দলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংঘ, পুরুলিয়া'-র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক চারিয়ান মাহাত বইটি প্রকাশ করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তাকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাই।

নলেজ ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স-এর মাননীয় সুকুমার গুপ্ত মহাশয় নিপুণতার সাথে গ্রন্থটি মুদ্রণের প্রয়াস করেছেন এবং প্রেসের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কুড়মালি সমাজ অনেক বড় সমাজ। আমার মত সাধারণ লোকের পক্ষে সমূহ জানা-বোঝা সম্ভব নয়। যেটুকু জেনেছি, বুঝেছি সেইটুকু বলার প্রচেষ্টা করেছি। এর বাইরে আরও অনেক কিছু আছে। এই বইটাই শেষ কথা নয়। সূত্রপাত মাত্র। মানছি, ভুল-ত্রুটি অনেক আছে। দয়া করে ধরিয়ে দিলে কৃতার্থ বোধ করব। পরবর্তীকালে শুধরে নিয়ে কিছু সংযোজন বিয়োজন করে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করার বাসনা থাকল। একই কথা অনেক স্থলেই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ঠিক করে নিতে অনুরোধ করি।

বিশ্বাস, পুস্তকটি মানুষের দরকারে কাজে লাগবে। সামাজিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটবে। আত্মীক ভাবনার উত্তরণ ঘটবে। আশা রাখি, আপনি এবং আপনার পরিবার পরিজন ভাল থাকবেন। আপনি ভাল থাকলে আমিও ভাল থাকতে পারব।

পরিশেষে আবেদন করি, কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচারের যেটুকু আপনার ভাল মনে হবে, আপনার কাজে লাগবে বলে মনে হবে, সেই টুকুই গ্রহণ করবেন। সেইটুকু নিলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। ধন্যবাদ।

সৃষ্টিধর মাহাত (বঁশরিআর)
মুঠো ফোন ঃ ৯৭৭৫৭৮৫১৬৮

প্র থ ম অ ধ্যা য়

কুড়মি সমাজ ও সামাজিকতা প্রসঙ্গে দু চার কথা



ভারতবর্ষে কুড়মি এককভাবে সর্ব বৃহৎ জন গোষ্ঠীর মানুষ। মূলতঃ এঁরা কৃষি-জীবি। সেই জন্য জলের অবস্থান দেখে এঁরা বসবাস করেন। "জঁদে জঁদে পানিক সৎ তঁদে তঁদে কুড়মিক জট"। উত্তর ভারতে এই জনগোষ্টীকে বলা হয় — কুড়মী, ঝাড়খণ্ড-বিহার-বেঙ্গল-উড়িষ্যায় — কুড়মি, গুজরাট মহারাষ্ট্রে — কুনবি, অন্ধ্রে কাপু এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে — কানাবি, কুরাব, কুলামারি, ফুলওয়াদি প্রভৃতি।

ঝাড়খণ্ড-মানভূমে এঁদের পদবী মাহাত বা মাহাতো। এ ছাড়াও রায়, মাঝি, সরকার, চৌধুরী, পরমানিক প্রভৃতি। পদবীর চল খুব প্রাচীন নয়। পদবী ধরে জাতি নির্ণয় কঠিন। উড়িষ্যায় এঁদের পদবী মহান্ত, বিহারে পটেল, সিনহা, সিং, কুমার, চৌধুরী প্রভৃতি। ভারতবর্ষে আদিবাসীদের ইতিহাসকে মুছে ফেলা হয়েছে অথবা যা মুছে ফেলা যায়নি তাকে অবজ্ঞা কিম্বা খাটো করে দেখানো হয়েছে। কি গুঢ় রহস্য আছে কে জানে ? কৃষি সভ্যতার আবিষ্কারক স্থায়ী কৃষি সভ্যতার অধিকারী আদিবাসী কুড়মি সমাজের ইতিহাসও মুছে ফেলার প্রচেষ্টা

বহু দিন আগেই শুরু হয়েছে। আজও চলছে। কিন্তুক "হাথেক আড়ে চাঁদ লুকা জাতেক নেহি।" হড় > হর/শিব, যাঁকে আমরা বলি "বুঢ়াবাবা" তিনি অলৌকিক নন। তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ। তিনি সমাজ, সামাজিকতা, ধর্ম, চিকিৎসা, কৃষি, আধ্যাত্মিকতা, শিল্প-সংস্কৃতি, নৃত্য-কলা ইত্যাদির প্রবর্তক ও প্রচলনকারী। কুড়মিরা তাঁরই অনুগামী। আপন সমাজের নিজের লোক বলে অন্যেরা নাম ধরে ডাকলেও কুড়মালি জাতীয়তার মানুষ তাঁকে "বুঢ়াবাবা" বলেই ডাকেন। সেইজন্য প্রতিটি কুড়মি গ্রামে বুঢ়াবাবর মড়প আছে এবং তাঁর স্মরণে প্রতি গৃহের অঙ্গনে বুঢ়াবাবার প্রতীক স্থাপন করেন। যাকে আমরা বর্তমানে "তুলসী মঞ্চ" বলে জানি। দুয়ারের চৌকাঠে, জোঁয়ালে, ধানের পাড়নে কুড়মিরা আজও তাঁর চিহ্ন আঁকেন।

বুঢ়াবাবা সমাজে যে ধর্ম প্রবর্তন করেন তার নাম সারি (সত্য) ধরম। কেউ বলেন সারি কেউ বা সারনা। সারি ধরম আদিকালের ধর্ম। যা সত্য তাই ধর্ম। সারি (সত্য) – শাশ্বত (সনাতন)।

"কল, কুড়মি, কড়া, বেদ সাস্তর ছাড়া"। হিন্দু সমাজের বেদ-বিধির বর্হিভুত, এই আদিবাসী কুড়মি জাতি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতবর্ষে অন্যান্য আদিম বাসিন্দাদের সঙ্গে সারি ধরম মেনে পাশাপাশি বাস করে ভাল মন্দের রাজত্ব করতে মিতা, ফুল পরান সইহা ইত্যাদি বন্ধুত্বের সম্বন্ধ পাতিয়ে এক প্রকার সুখে জীবন অতিবাহিত করতে ছিলেন। তারপর ...গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেল। কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কারণে গর-আদিবাসী, শক, হুন, পাঠান, মোগল, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জনগোষ্ঠী ভারতভূমিতে এসেছেন এবং স্থায়ী বাসিন্দাও হয়েছেন। সকলেই সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সকলেই ভারতভূমিতে সত্যিকারের মাতৃভূমি ভাবতে পারেন নি। ফলে প্রকৃত দেশ-প্রেম, দেশাত্মবোধ জাগে নি। আসু এর নিরসন প্রয়োজন।

"ধর্ম হারাইলে, দেবতা হারাইলে, বিপদ ঘটে"। আদিবাসী কুড়মি সমাজেও বিপদ ঘটিল। গর আদিবাসীরা নিয়ে এল ব্রাক্ষণ্যবাদ আর জাতবাদ। তাঁদের অলৌকিক, উদ্ভট, অবাস্তব, আজগুবি, বিভেদকামী, অবৈজ্ঞানিক, কল্পনার কল্পকাহিনী (মিথ) এর স্বীকার হলেন এঁরা। বিভিন্ন কারণে চাপে পড়ে, লোভে পড়ে অনেকে মোহাবিষ্ট হয়ে মোহজালে ফেঁসে গিয়ে দিশে হারা হয়ে পড়লো। অনেকে ঐ ধর্মে দীক্ষিতও হলেন। এক কাট্টায় টান পড়ল। আদিম ধর্ম মাথা ঠুকতে লাগল। নিট ফল হল— এঁরা না পারলেন পুরোপুরি হিন্দু হতে। না পারলেন আদিম ধর্ম ও দেবতাকে বাদ দিতে। এক জগা খিঁচুড়ি অবস্থা তৈরী

হল। হিন্দু সমাজের এঁরা "জলচল" নহেন। এমনকি হিন্দু সমাজের সবচাইতে নীচু সিঁড়ির অনেক শুদ্রদের কাছেও এঁরা আজও অস্পৃশ্য। কুড়মি সমাজ তাঁদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর বংশ প্রতীক বা টোটেম শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও মেনে চলেন। টোটেম প্রথা প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার একটি সুদৃঢ় কাঠামো। Sir James Frezer এর মতে, এই টোটেম তত্ত্বই হচ্ছে প্রাচীন ধর্মের মূল উৎস। কুড়মি জাতির প্রত্যেকে নিজ নিজ গোষ্ঠীর টোটেম ও তার বিধি-নিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করেন। গাছ, ফল, লতা, পশু-পাখী, পতঙ্গ, পাহাড় ইত্যাদি কুড়মিদের টোটেম। সেই অনুযায়ী বঁশরিআর, শঁখোআর, টিড়োআর, কাটিআর, জালবানুআর, বানুআর, বাঘবানুআর, হাঁসুআর, কড়োআর, হিদোঁআর, পুনুড়িআর, কেশরিআর ইত্যাদি ইত্যাদি ৮১ টি ঝাড়। কুড়মি সমাজের মানুষ সাম্যবাদে বিশ্বাসী। লোক ঠকিয়ে উপার্জন করতে এরা ঘৃণা বোধ করেন। শরীর খাটিয়ে বা গা-গতর পুড়িয়ে এঁরা আয়-উপায় করতে ভালবাসেন। এই সমাজে সেই জন্য কোটিপতি, পতিতা ও ভিখারী খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঘৃণ্য বরপণ এবং জঘন্য সতীদাহ প্রথা এই সমাজে কখনো ছিল না। সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনার জন্য কুড়মি সমাজের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা ছিল। গ্রাম পরিচালনার জন্য ছিল গ্রামের প্রধান তাঁকে বলা হত মাহাত। পূজা-পাঠের জন্য লায়া। ডাকহাঁকের জন্য "গড়াত্"। এক একটি অঞ্চল পরিচালনার জন্য পরগনৈত এবং দেশের জন্য "দেশ মোড়ল"। সামাজিক নেগ নেগাচারের জন্য জন-জামাই ও ভাগিনা। চাষবাসের জন্য "জন" বিবাহাদির জামাই ও পরলৌকিক কাজের পরিচালনার ভার থাকত ভাগিনার উপর। এরা কিন্তু সকলই পর গোত্রের। "জন-জামাই-ভাগিনা কেউ নহে আপনার।"

ঝাড়খণ্ড-মানভূমের কুড়মি সম্প্রদায় ও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এখানকার আদি বাসিন্দা। বর্তমানেও এরাই এই অঞ্চলের বৃহত্তম সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতি। সিংভূম গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে গ্রাম প্রধান মুন্ডা হলে মুন্ডা বা হো, গোয়ালা বা কুমার হলে প্রধান মাহাত, নাগপুরিয়া হলে গাঁজু, সাঁওতাল মাঝি, ভুঞা হলে নায়েক, অধিকাংশ গ্রাম প্রধানেই আদি বাসিন্দা অর্থাৎ খুঁটকাটিদারদের বংশধর। একদিকে যেমন কুড়মি প্রধানগণ খুঁটকাটি স্বত্ত্ব লাভ করেন বর্তমান আদি বাসিন্দা হিসাবে গরাম দেবতার পূজার অধিকারী লায়া এবং লায়ালি স্বত্বের সম্পত্তির অধিকারী। ঝাড়খন্ড মানভূমের অধিকাংশ গ্রামেই লায়া কুড়মি জাতির। এঁরাই এলাকার প্রধান কৃষিজীবি সম্প্রদায়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, মানববিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী এবং সরকারী অভিমত অনুসারে কুড়মি জাতি একটি উপজাতি। এই মর্মে উল্লেখযোগ্য কিছু লিখিত

গ্রন্থ হল — "Tribe and Caste of Bengal"- H. H. Risley, "Linguistic Survey if India" - George Grierson, Census Superintendent Census operation 1931 Bihar and Orissa" - Census of India - 1931 - Vol. –V Chapter XII page 476 para 560 and Superintendent of census operation Bengal Central Publication Branch, Calcutta - 1933 - A. E. Patter.

বাস্কে রামসুন্দরম তাঁর "সাঁওতালি ভাষার আলোকে বিশ্ব সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে" –বইতে বলেছেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর কিছুই নয়, প্রাচীনতম আদিবাসী কোল বা খেরোয়াল অর্থাৎ সাঁওতাল মুন্ডা আদিবাসী এবং আদিবাসী দ্রাবিড়দের সংমিশ্রনের ফসল (পৃ-১১০)।

প্রভাত রঞ্জন সরকার তাঁর "রাঢ় ভূমি একাল ওকাল" গ্রন্থে বলেছেন বিশ্বের প্রথম জীবন আবির্ভাব হয় এখানেই। এরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীভূক্ত। কুড়মী মাহাতরা এদের বংশধর। উদয় নারায়ন তেওয়ারী তাঁর "ভোজপুরী ভাষা আউর সাহিত্য" পুস্তকের ২১৮ পৃষ্ঠায় কুড়মি জাতিকে অনার্য ও দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত এবং এদের মাতৃভাষা কুড়মালি বলে উল্লেখ করেছেন। ড. সুধীর করণের মতে চম্পা দেশে মুন্ডা, বীড়হোড়, সাঁওতাল কুড়মিদের খেরোয়াল বলা হত। এরা থাকত হিহিড়ি পিহিড়িতে। তারপর গেল চম্পা..... এই সময় সাঁওতাল মুন্ডা, বীরহোড় এবং কুড়মিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রথমে এরা একই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। নরনারায়ন চট্টোপাধ্যায় তাঁর নামের মালায় মানভূম (পৃষ্ঠা-৪৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬) তাতে খেরআয়াল বংশের বারোটি জাতির শাখা একটি সারনীর সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন। সারণীটি নিম্নরূপ —

খেরোয়াল
- সাঁওতাল — কোল
- কুর্মি — ভীল
- মুন্ডা — ওঁরাও
- দেশওয়ালি — গন্ড
- মাহালী — বেদিয়া
- কোড়া — বীরহোড়

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রায় শেষকাল পর্যন্ত টোটেমিক কুড়মি জাতি ভারত সরকারের ৫৫০ নং নোটিফিকেসন তাং ২রা মে, ১৯১৩ অনুযায়ী আদিবাসী ভুক্ত ছিল এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরবর্তীকালে আদিবাসী তালিকাভুক্ত থেকে কুড়মি জাতি বাদ পড়ে গেলেও ১৯৫৩ সালে

কাকা কালেলকর কমিশন ও ১৯৭৮ সালে মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট এই জাতি OBC তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। কুড়মি জাতির রহন-সহন, গরাম, বড়াম, ধরম, জাহির, টাড়াসিনি, দুয়ারসিনি, ঔঠাইসিনি বাঘুৎ, কুদরা, বাঁদনা, ভানসিং, গাছ, পাথর, পাহাড়, জলাশয়ের পূজা, জনম, মরণ, বিবাহের নেগনেগাচার ও প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানে নাচ, গীত, শরীর-পিড়ন-বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ (সাঙ্ঘা) সমাজ স্বীকৃত। এইগুলি আদিবাসী সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। "ঝাড়খণ্ডের কুড়মী" গ্রন্থে রাধা গোবিন্দ মাহাত বলেছেন; — কুড়মিদের আদি বাসস্থান কুরুমদেশে। কুরুমদেশ থেকে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় কুড়মিদের প্রসারিত হওয়ার গতিপথ নিম্নলিখিত সারণীর দ্বারা নির্ধারণ করেছেন।

কুরুমদেশ

(সিন্ধুর পশ্চিম সীমান্তবর্তী উপনদী কুরম তীরবর্তী এলাকা)

পশ্চিম ভারত	ঃ	(গুজরাট, মহারাষ্ট্র)
মধ্যভারত	ঃ	(গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী এলাকা মধ্যপ্রদেশ)
উত্তর ভারত	ঃ	(পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ)
দক্ষিণ ভারত	ঃ	(কেরল, কর্ণাটক)
ঝাড়খণ্ড	ঃ	(ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, বাংলা, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের ছোটনাগপুরের সীমান্ত এলাকা)
বিহার	ঃ	(ভোজপুর, মিথিলা, মগধ)

অন্যান্য আদিবাসীদের মত কুড়মি জাতিরও নিজস্ব মাতৃভাষা কুড়মালী কিন্তু অন্যান্য ভাষার সাথে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কুড়মালী ভাষা একা কুড়মি-মাহাতদেরই ভাষা নহে। কুড়মালি একটি জাতীয়তা। এই জাতীয়তায় পড়ে সেই সমভাবাপন্ন জাতিগুলি যেমন কুইরি, কামার, কুমার, বাগাল, রাজোয়াড়, দেশওয়ালী, হাড়ি, মুচি, ডোম, ঘাসি, মাহালি প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীরও কথ্য ভাষা কুড়মালি এবং এদের নিয়ে তৈরী হয়েছে হড়-মিতান সমাজ। কুড়মালি ভাষাবিদ ক্ষুদিরাম মাহাত মহাশয়ের কথায় কুড়মালি ভারতের অন্যতম প্রাক্-ঐতিহাসিক ভাষা। সুকুমার সেন "old perrsion inscrip-tion" এর সঙ্গে কুড়মালির সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে কুড়মালি ভাষা হইতে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন হয়। পূর্ব প্রাক্-তের সময় ২য় শতাব্দী এবং কলমীদ মাগধীর ৭ম শতাব্দী। মাগধী অপভ্রংশ হইতে বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া,

উড়িয়ার সৃষ্টি হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাচর্য বিনিশ্চয় পুঁথি সংগ্রহ করেন। প্রঃ বোস ও মুখোপাধ্যায় বলেন মাগধী গোষ্ঠীর সব ভাষার প্রথম পুস্তক। কিন্তু এই পুস্তক কুড়মালি ভাষার অপভ্রংশ।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে "বাংলা উৎপত্তি ১০ হইতে ১২ শত খ্রীষ্টাব্দে এমন কি বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেরও কুড়মালির প্রভাব রহিয়াছে।" নৃতত্ত্ববিদ ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো মহাশয় বলেছেন — "ভারতীয় বাংলা, উড়িষা ইত্যাদি ভাষার আদিরূপ চর্যাপদগুলির ধারাবাহিকতা আজও কুড়মালি।"

কুড়মালি ভাষার নিজস্ব ভাষা ভান্ডার আছে। আছে নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গি। আছে নিজস্ব গননা পদ্ধতিও। কুড়মালি ভাষার ছিল নিজস্ব লিপি। অনেকে বলেন হরপ্পা লিপিই কুড়মালি লিপি। এখনো কুড়মি বঁশ দাগ যা গরুর পাছায় নিজস্ব গোত্রের দাগ বা চিহ্ন হিসাবে দাগা হয় তার ৩৯টি চিহ্ন বা লিপি হরপ্পা লিপির সঙ্গে মিলে যায়। এ দাবি করেছেন কুড়মালি ভাষার গবেষক ডঃ আদিকান্ত মহান্ত মহাশয়। আজও কুড়মি মা-বোনেরা তাঁদের শরীরে যে উলখি বা খদা অলংকরণ তার সঙ্গে এবং কুড়মিদের ঘরের চৌকাঠে যে সিঁদুরের দাগ কাটা হয় ও বিবাহের সময় অনেকে দেওয়ালে চালের গুঁড়ির চোখ দিয়ে যে আলপনা করা হয় তার সঙ্গেও হরপ্পা লিপির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কুড়মালি ভাষাবিদ্ লক্ষীকান্ত মুতরুআর বলেন — "ঝাড়খন্ড মুলুকে মুন্ডারী, সাঁওতালি, কুড়ুক হেনতেন ভাষাগিলিনেক লেঁখে কুড়মি কবিলাক ভাষা কুড়মালি।" ঝাড়খণ্ড মানভূমের হড়-মিতান সমাজের মানুষ আজও ঘরে ঘরে, ঘাটে হাটে, মাঠে কুড়মালি ভাষায় কথা বলেন। মূল জাওয়া গীত, করমগীত, সহরাইগীত, বিহাগীত, টুসুগীত, এড়েহাগীত, মাহারাইগীত, ঝুমুর, রাতকহনী, জান কহনি, প্রবাদ, এখনো হয় কুড়মালি ভাষায়। প্রতিটি বিষয়ের উপর হতে পারে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ। ১৯৮০ সালে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে জন-জাতিও ক্ষেত্রীয় ভাষা বিভাগের সূচনা হয়। সেখানে সাঁওতালি, মুন্ডারী, খেড়িয়া, কুড়ক, হো, নাগপুরিয়া ভাষার পঠন পাঠন, লিখিত সাহিত্য সৃজন ও গবেষণা চালু করেন। ঐ একই সঙ্গে কুড়মালি ভাষার পঠন-পাঠনও আরম্ভ হয়। কুড়মি জাতি সত্যের পুজারী, ইমানদার ও কৃতজ্ঞতা পরায়ন। অন্যান্য আদিম আদিবাসীদের মতই এঁরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করেন না । তারপর দীর্ঘদিন পরাধীন থাকতে থাকতে শোষণ, শাসন ও পরিকল্পিত মগজ ধোলাই-এর চাপে পড়ে নিজেদের স্বকীয়তা হারাতে লাগলেন। ব্রাহ্মন্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন। আদিবাসী ভাব ধারায় ভাঁটা পড়তে লাগল। হীনমন্যতায় ভুগতে লাগলেন। আদিম ধর্মের প্রকৃতিবাদে

বিশ্বাসী মনে দৃঢ়তার অবাব দেখা দিল। ফলে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট না হয়ে পুড়মি সমাজের তথাকথিত বিদ্বান ও অর্থবানেরা হিন্দু সমাজের উচ্চ সিঁড়তে উঠার জন্য সমাজ সংস্কার আন্দোলনে রত হলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ময়ূরভঞ্জের নিরঞ্জন মহান্ত (মাহাত) আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। জাতির জল-অচল, ছুয়াছুতের বিরুদ্ধে ও ক্ষত্রিয় হওয়ার দাবিতে সভা-সমিতি চলতে থাকে। মানভূমের ১৯২২ সালে গোলামারা গ্রামে এবং ১৯২৮ সালে ঘাঘরজুড়ি গ্রামে যথা্ক্রমে ১ম ও ২য় সম্মেলন হয়। সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের এই আন্দোলনে সায় ছিল না। এই বিষয়ে লোককবির একটি ঝুমুর গীত প্রনিধান যোগ্য —

১) গলামারায় মিটিনহৈল, গাঞে গাঞে পত্ত গেল —
শশী ভূষণ ছিল সেক্রেটারী,
গাঞের মালিক যাহারা, যাঞেছিল গলামারা
(আর) সভাতে বসিয়ে সভাতে বসিয়ে সভা করি হে।। রং —
রং — কুড়মিদের মিটিং হৈল ভারি।।
এই মিটিনে লাগেছে ঘেরঘেরি হে।।

২) মদ খুখড়ি, সাঁঘা ছাড়অ, বামহন নিঞে বিহা কর,
বার দিনে করিভে খেওরী হে,
ঘরে ঘরে কর আঁট, মেঞাকে না পাঠাও হাট—
(আর) সকৈল জনা হ-অ পৈতাধারী হে।। রং

৩) সন ১৩২৮ সালে, ভাখিঞে চৌধুরী বলে —
এবার কাম চলিবেক কি কির হে, —
কুড়মিদের মিটিন হৈল ভারি. . . . ।।

কুড়মিদের পৈতা ধারণ ও ক্ষত্রিয় আন্দোলনের বিপক্ষে সমাজের সাধারণ মানুষও প্রতিবাদে সোচ্চার হন। তাঁরাও মিটিন মিছিলে সামিল হন। ১৩৪০ সালে রজনীকান্ত মাহাত ও ধনঞ্জয় মাহাত মহাশয়ের পরিচালনায় লাগদা পরগণার হুলকা গ্রামে এমনি এক বড় মিটিং বসে। তাঁরা কুড়মিদের পৈতা ধারন ও ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণের নমুনা যদি কেহ দেখাতে পারেন তার জন্য পুরস্কার ঘোষণাপত্র বিলি করেন। বেদ-পুরাণ ইত্যাদি কোন গ্রন্থেই ক্ষত্রিয় আন্দোলনকারীগণ প্রমাণ দেখাতে পারেন নাই। সেইজন্য বিপক্ষ আন্দোলন-কারীগণ বিজয় পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং গ্রামে গ্রামে প্রচার করেন।

এতদস্বত্বেও **১৯৩১** সালের আদমসুমারীতে লোক গননায় এই শ্রেণীকে কুরমী ক্ষত্রিয়ভুক্ত করা হল। আদিবাসী ভাব ধারায় বড় আঘাত লাগিল। কুড়মালি ভাষাকেও পাঁচপরগনিয়া, নাগপুরিয়া, খোট্টা ইত্যাদি ইত্যাদি নামে বিভাজন করা হল।

কাউকে খাটো করে দেখা কিম্বা বিরোধ করারও দরকার নেই। কিন্তু আমার মামাঘর, শ্বশুরঘর, পিসী বাড়ী, মাসীবাড়ী, বেহাই ঘর সেই সমাজের মধ্যেই আমাকে করতে হবে। অতএব ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে সমাজ উন্নয়নের কাজে আমাকেই এগিয়ে আসতে হবে। অপরে কেউ করে দেবে না। তবে যা কিছু করতে হবে ভেবে চিন্তেই করতে হবে। সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে আখেরে আরও অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। সামান্য ভুলের জন্য কুড়মি সমাজের শত হাজার একর জমি খেসারত দিতে হয়েছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। প্রত্যেকটি মানুষের এর গুরুত্ব অপরিসীম।

"আপন বুদ্ধে তরি, পরের বুদ্ধে মরি" অথবা
"স্ব ধর্মে নিধনং শ্রেয়"।

"কাঁদতে বসলে সাত পুরুষ মনে পড়ে"। আর না একটা গীতের কলি দিয়ে এই নিবন্ধের অবতারণা শেষ করছি।

"জাগাউয়েনঅ মাঞ গেধিঁ সামাইঁ
হুঁস-দিসা দে হামরাকে গো।
ভাখিক বাখানে, চারিক গুমানে,
ফুলে-ফরে ঝবরাঞে তকে গো"।। (নগেন পুনুড়িয়ার)



কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার বিষয়ক দু-চার কথা

কুড়মি একটি জাতি। কিন্তু মনে রাখতে হবে "কুড়মালি" একটি জাতীয়তা। কুড়মালি একা কুড়মি জাতির নহে। অনেকগুলি জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সংস্কার-সংস্কৃতির মিলিত রূপ কুড়মালি। কুড়মালি একটি কুড়। এই 'কুড়' নিয়েই কুড়মালি।

এই নেগ-নেগাচার প্রাগৈতিহাসিক কালে ভারত ভূমে প্রচলিত হয়ে নানা আঘাত প্রতিঘাত বহু রাজনৈতিক টানা-পোড়েন সয়েও সচল ও সজীব হয়ে আছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভেদকামী প্রচার এই কুড় ভাব ও ভাবনায় কিছুটা চিড় ধরাতে পেরেছে বলে মনে হয়। বিভেদকামী শক্তি নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এই জাতীয়তাকে ভেঙ্গে দুর্বল এমনকি ধ্বংস করার অপচেষ্টা করেই চলেছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্নতার বিষ সাবধানে অতি কৌশলে সঞ্চারিত করে চলেছে। অবচেতন মনে এই বিভেদের বিষ সাধারণ মানুষের মনে স্থায়ীভাবে জাঁকিয়ে বসেছে। ফলে হতাশা ও দুর্বলতা বাড়ছে। আপনজনেরা পাশাপাশি কাছাকাছি থাকলেও সন্দেহ ও অবিশ্বাস বেড়েই চলেছে। শত কোটি মানুষের মাঝখানে থেকেও নিজেকে বড়ই একা মনে হচ্ছে। আমাদের ডাক পুরুষের একটা কথা আছে; — "ভিনালেই বাপ পড়শি।" কুড়মালি নেগ-নেগাচারের আলোচনা করতে গেলে সচেতন ভাবে এই ভাব ও ভাবনাগুলি মনে রাখতে হবে।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে যাঁরা বসবাস করে আসছেন বর্তমানকালে তাঁদেরকে বলা হয় আদিবাসী বা মূলবাসী। এই আদিবাসী মানুষজনের জীবন-জীবিকা, রহন-সহন, ভাব-ভাবনা, সংস্কার-সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশের যৌথ মিলিত ধারা কুড়মালি। সেই কারণে একে আদিবাসী ধারাও বলা যায়। বর্তমান কালে ভাগ হয়ে যাওয়া সমভাবাপন্ন কৃষিজীবি, বৃত্তিজীবি সম্প্রদায়গুলি যেমন কুড়মি, কুমার, কুইরি, কামার, ভূমিজ, রাজোয়াড়, বাগাল, খাসি, ডোম, সহিস, বাউরী, মুচি, ধোপা, মাহলি, ঘাটোয়াল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী কুড়মালি ভাবধারা মেনে চলেন। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, খাড়িয়া-শবর, বীরহড় প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ধারার মধ্যেও প্রায় মিল দেখা যায়। সামান্যই তফাৎ দেখতে পাওয়া যায়।

এক একটি অঞ্চলের কোন একটি বড় গ্রামকে সামনে রেখে অঞ্চলের গ্রামগুলির পরিচয় ঘটে। একটি যৌথ পরিবারের যিনি বড় তাঁর নাম অনুসারেই পরিবারের এবং ঐ গোষ্ঠীর সকলের পরিচয় জানা যায়। তেমনি কুড়মি

জনগোষ্ঠী ঝাড়খণ্ড-ছোটনাগপুর অঞ্চলের এক সময়কাল পর্যন্ত সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী ছিল। এখনও সব চাইতে বেশী জনসংখ্যার মানুষই এককভাবে প্রতীয়মান। পরিবারের বড় ভাইয়ের নাম অনুসারেই কুড়মি গোষ্ঠীর নামেই এখানকার সংস্কার সংস্কৃতির নাম হয়েছিল 'কুড়মালি'। কোন বড় ভাইয়ের নাম অনুসারে আখ্যায়িত হয়েও কোন বড় বাঁধ-পুকুর কিম্বা জমি সম্পত্তি একক বড় দাদার হয়ে যায় না। তাদের বড় ভাইয়েরও যেমন হক আছে তেমনি অনুরূপভাবে অন্যান্য ভাইয়েরাও সমান হকদার। সেইরূপ কুড়মালি একা বড় ভাই কুড়মি জনগোষ্ঠীর একার নহে। সমভাবাপন্ন কৃষিজীবি-বৃত্তিজীবি আদিবাসী মানুষের সকলেরই।

কুড়মালি নেগ-নেগাচার আলোচনা করলে কিম্বা জানলে অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরও নেগ-নেগাচার বোঝা যাবে। অনেক অনেক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অনেক সময় পাশাপাশি বাস করার ফলে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর রহন-সহনে কিছু কিছু আদান-প্রদান হয়েছে। নেগ-নেগাচার, রীতি-নীতির কিছু কিছু গ্রহণ-বর্জন হয়েছে ঠিকই কিন্তু ভালভাবে দেখলেই বোঝা যাবে আদিবাসী মূল কাঠামোর নেগ-নেগাচার বহমান আছে। এর শিকড় অতীব গভীরে।

এক সময়কাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন কুড়মালি নেগাচারী জনগোষ্ঠীগুলির জীবন জীবিকা ছিল কৃষি নির্ভর। কৃষিজীবি কিম্বা কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত বৃত্তিজীবি। কৃষিকাজ ব্যতিরেকে নির্ভরযোগ্য আর কোনরূপ দ্বিতীয় পন্থা ছিল না। বর্তমান কালে যদিও নব্বই ভাগ সাধারণ মানুষ এখনও ঐ কর্মের সঙ্গেই যুক্ত। প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। কিছু মানুষ অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত হয়ে জীবন-জীবিকা অতিবাহিত করছেন। অনেকেই শ্রমজীবি, বৃত্তিজীবি ও ব্যবসাজীবি হয়েছেন। কম পরিশ্রমে অধিক পরিমাণে অর্থলাভ। শহরমুখী দায়দায়িত্ব ছাড়া এককভাবে চটকদারী সহজ জীবনযাত্রা দেখে মানুষের ঝুঁকি ঐ দিকে বেড়েছে। কৃষিকাজ থেকেও ঐ কাজে বেশী বেশী নিরাপত্তা ও ঝুঁকিহীন ভাবছেন। সেই কারণে কৃষিকাজের উপর মানুষের যে নিষ্ঠা তার ব্যাপ্তয় দেখা দিয়েছে। জীবিকার উপর নিষ্ঠা-নিরাপত্তা, নির্ভরতার ভাবনায় যদি চিড় ধরে তাহলে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত নেগ-নেগাচার পালন-প্রতিপালন করার ক্ষেত্রেও অনিহা দেখা দিতে বাধ্য। যুব সমাজের এই অনিহার প্রবণতা অতিমাত্রায় দেখা দিয়েছে।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় অনেক তৈরী হয়েছে, সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েরাও পড়াশোনা করে শিক্ষিত হচ্ছে। দেশে বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রচার-প্রসার বেড়েছে। যোগাযোগের ব্যবস্থা বেড়েছে। দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে আদান-প্রদান বেড়েছে। বিভিন্ন পেশার কাজে মানুষ যুক্ত হতে পারছে। কুড়মালি

নেগাচারী লোক-জীবনের সঙ্গে যুক্ত যুবক-যুবতীদের মনে সেই কারণেই প্রশ্ন জাগছে। তারা কেন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিরাপত্তাহীন পেশায় পড়ে পড়ে মার খাবে? পেশায় না থাকলে কুড়মালি নেগ-নেগাচার মানারই কি প্রয়োজন আছে ? শিক্ষিত ভদ্র সমাজের কাছে উপেক্ষিত, অবহেলিত, ঘৃণিত হয়ে কেন পিছনে পড়ে থাকবে ? সেই কারণেই আশু প্রয়োজন কুড়মালি নেগাচারের আলোচনা। এই নেগাচার আমাদের কি দিয়েছে, কি নিয়েছে ? মনে প্রাণে নিষ্ঠার সঙ্গে এর প্রতিপালন করার কি কোন প্রয়োজন আছে ? নাকি আমাদের পিতা পুরুষরা করে আসছিলেন বলে নমঃ নমঃ করে নেগ-সারা করলেই হবে ? অথবা গাঝাড়া দিয়ে এর থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া দরকার ? আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এইখানে।

ছেলেখেলা নহে, সামাজিকভাবে কিছু গ্রহণ করার পূর্বে এবং বর্জন করার আগে ভালভাবে তলিয়ে দেখে-নেওয়া, বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। কুড়মালি নেগ-নেগাচার কোন অর্বাচিন ব্যাপার নহে। কোন্ সুদূর অতীব প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক সাধারণ মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করে আসছেন। কেন এতকাল ধরে লালন করে চলেছেন ? তার বিচার করে দেখার প্রয়োজন অতি অবশ্যই আছে। আলোচনা করলেই জানতে পারা যাবে, কুড়মালি নেগাচার মানুষকে সহজে অধিক অর্থ হাতে এনে দেয় না ঠিকই। কিন্তু এই নেগাচার মানুষকে সুশৃঙ্খল, সমাজবদ্ধ থাকতে শেখায়। কৃতজ্ঞ, সৎ, উৎপাদনশীল, সাহসী জীবন এবং রিপু দমনের মাধ্যমে বিবেকের নির্দেশে কর্ম সম্পাদন করতে ও জীবন অতিবাহিত করতে পরামর্শ দেয়। ন্যায়-নীতি অনুসারে সংসার, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিপালন করতে একটা আঁটো-সাঁটো বিবেক বন্ধনে বেঁধে রেখে দেয়। মানুষকে উচ্ছৃংখল, অসামাজিক কাজ করেত বাধাদান করে। শিশুকাল থেকে প্রতিটি এই নেগাচার বলে দেয়, জানান দেয়, তার জন্ম সমাজের প্রয়োজনে। একক নিজের প্রয়োজনে নয়। সুনির্দিষ্ট ভাবে শিখিয়ে দেয় তার জীবনের হেতু কিসের জন্য ? জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কোথায় ? শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় তার জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্যই বা কি ? জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা কিভাবে সে পূরণ করবে?

কুড়মালি নেগাচারের লক্ষ্য হল; — সমাজের দুর্বলতম ব্যক্তিটিকে একা ফেলে এগিয়ে না গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলা। সবল-সামর্থবান ব্যক্তির মনে হতেই পারে সামাজিক দায়-দায়িত্ব নিয়ে ফালতু ফালতু চলার কি দরকার ? সামাজিক সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়ার তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন তার

দুর্দিন কিম্বা বিপদ ঘটে তখন এই লোক-লৌকিকতার জন্য সেই লালায়িত হয়ে পড়ে। সুসময়ে একা চলব, আর দুঃসময়ে সাথী খুঁজব, এ কেমন কথা ? কে বলতে পারে সব দিন আমার এইসা চলেগা ? প্রতিটি মানুষেরই এই কথা মাথায় রেখে চলার দরকার আছে বলে মনে হয়। সময়ে লেবদাঞ ফে'লেদিঞে অসময়ে হাঁথড়াঞ ম'রলে কি পাওয়া যাবেক্ ? এখন কোন দ্রব্যকে অবাঞ্ছিত মনে করে ঝেঁটিয়ে ফেলে না দিয়ে যতনে জোগালে সেই অবাঞ্ছিত দ্রব্যটিই যথাসময়ে উপকারের কাজে লাগে। রাখলে আমার কি ক্ষতি ? না রাখলে আমার কতটুকুই বা লাভ হবে ?

কুড়মালি নেগাচারে দুর্বলকে তার সমান মান-মর্যাদা, সম্মান, দায়-দায়িত্ব দিয়ে চলার বিধান দেওয়া আছে। সঙ্গে চলার ক্ষেত্রে কখনই সে হীনমন্যতায় ভুগবে না। সমান নিরাপত্তা ও অধিকারের ভাগীদার হতে পারে। 'নেগা' অর্থাৎ বাম নীতি-নিয়মে সৌর জগৎ চাঁদ, সূর্য্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ কর্ম সম্পাদন করে থাকে। এই নেগাচার তেমনি নীতি-নিয়মে সমানভাবে সবাইকে তেমনি আলো-উত্তাপ, বাতাস দেওয়ার চল আছে। এই নেগাচার অবৈজ্ঞানিক নয়। যুক্তি-পরামর্শ, বিজ্ঞান, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার নিগুঢ়ে বাঁধা। কাউকে তার পাওনা থেকে বঞ্চিত করে না। সমান সুযোগ, সোহাগ-ভালবাসা, খাদ্য, বাসস্থান, মান-মর্যাদা দেওয়ার রীতি আছে। তেমনি সুখ-দুঃখ, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য-কর্মেরও সমান ভাগ দেওয়ার বিধান আছে। সম অজের ভিত্তিতে সামাজিক যৌথ কাজে ভাগ, ভোগ, ভেজা, বেউরি ও ভেট ভোজ প্রথা চালু করা হয়েছে।

সমাজের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাভক্তি করা, তাদের উপদেশ, আদেশ পালন করা এবং সমাজের অন্যান্য যার যেমন প্রয়োজন সেইরূপ ভাবে স্নেহ, ভালবাসা, সোহাগ, সেবা-যত্ন, মান-মর্যাদা সম্মান জানানোর নীতি-নিয়ম এমন কি পশু-পাখী, গাছ, লতা-পাতার ঠিক ঠিক যত্ন করা; আবার পুর্বপুরুষ যাঁরা ইতিপূর্বে প্রয়াত হয়েছেন সেই পিঢ়ি পুরুষ, পিঢ়ি জননীদের রাই-রাইয়া হিসাবে স্মরণ মনন ও পূজা করার বিধান দেওয়া আছে।

যার কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়া যায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, শ্রদ্ধাশীল, ইমানদারীর সঙ্গে গুণগান ও সুখ্যাতি প্রদর্শন করা হয়। মানব সভ্যতার হিতকারী শ্রষ্ঠা পুরুষ শক্তি, পরমা প্রকৃতি শক্তি ও অন্যান্য শক্তিকে রাই-রইয়াদের (দেব-দেবী) পূজা ও সম্মান জানানোর পদ্ধতি ও রীতি দেওয়া আছে।

পুরুষ ও প্রকৃতি শক্তির মিলনের ফলে জীবের জন্ম। একা পুরুষ ও প্রকৃতি কোন জীবের জন্ম দিতে পারে না। মানুষ পুরুষ শক্তিরূপে বিশ্বপিতা

সূর্য ও পৃথিবীকে বিশ্বমাতা জ্ঞানে মান্য করে। সেই কারণে কুড়মালি নেগাচারে সূর্যকে মহারাই ও পৃথিবীকে ধরতিমাঞ, মহামাঞ অথবা জাহিরমাঞ নামে শ্রদ্ধা পূজা করে থাকে। পিতামাতার মিলিত শক্তিতেই মানুষের জনম। সেই কারণে পিতা-মাতা সন্তানের কাছে পরম দেবতা। পিতা-মাতা না থাকলে এই বসমতা মায়ের কোলে কখনই সে জীবরূপে জন্মাতে পারত না।

এক সময়কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমূহ মানুষকে বলা হত 'হড়'। শিবকে বলা হত 'মহাহড়'। তিনি হড়দের দলপতি। ঈশ + হড় = ঈশ্বর। তিনি অলৌকিক নয় লৌকিক। কুড়মালি নেগাচারী হড়দের কাছে তিনি বুঢ়াবাবা, বড় পাহাড়। তিনি একাধারে তাঁদের দলপতি ও ধরম গুরু। কুড়মি তথা কুড়মালি নেগাচারী জাতিগোষ্ঠী সকলেই শিবকে নাম ধরে ডাকে না, তাঁকে বুঢ়াবাবা বলা হয়। তিনি কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচারের প্রবক্তা এবং তিনি আদিবাসী ধর্ম সারি-সত্য ধর্মেরও প্রণেতা। সেই কারণে আদিবাসী মানুষ মহাহড় শিব বুঢ়াবাবার অনুগামী ও ভক্ত।

বুঢ়াবাবার অনুগামীদেরও সবার পরিচয় এক সময়কাল পর্যন্ত ছিল হড় নামে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ আর্য জাতি অধিকার করার পর তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী নিয়ম-নীতি সমাজে চালু করেন। মনু এই নিয়ম-নীতি তৈরী করেন। মনুর নীতির অনুগামীদের মনুর নাম অনুসারে বলা হয় মানব। মানব থেকে মানুষ কথার চল হয়। যেহেতু রাজপাট আর্যদের হাতে। তাদের অধীন প্রজাদের, তাদের অনুগামী রীতি-নীতি মানতে বাধ্য করা হল। হড় মানুষেরও পরিচয় ক্রমে ক্রমে মানুষ হয়ে গেল।

বুঢ়াবাবার অনুগামী হড়জনেরা সব মানুষকেই সমান ভাবে। জন্মের কারণে কেউ বড় কেউ ছোট নয়। কোন মানুষই অস্পৃশ্য, ঘৃণিত, অবহেলিত নয়। জল চল। জল অচল। জাত-বর্ণ বলে কোন ভিন্ন ভেদ নেই। সবাই হড়। মনুর অনুগামীদের জন্ম থেকেই ছোট-বড়, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য। বিভেদকামী নীতি-নিয়মের ছোঁয়াচে রোগ পরবর্তীকালে দানা বাঁধে। তবে খুব জোর প্রভাব দেখা যায় না।

যতটুকু জানি-বুঝি সাধ্যমত কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচারের আলোচনা করার প্রয়াস রাখব। মানা না মানার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে যেটুকু দেখেছি, পূর্ব পুরুষদের বাঁধা পথে চললে সুখ-শান্তি নিরাপত্তা উন্নয়ন সবই পাওয়া যায়। বিপথগামী হলে উচ্ছৃংখল, হিংস্র, বিভেদকামী, সমাজবিরোধী, অকৃজ্ঞ, বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনে অশান্তি ভোগ করে। উন্নতি করার পথ অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে উন্নয়নের পরিবর্তে অবনতি হয়।

আমার ব্যক্তি জীবনের নেগাচার পালন করা না করার কিছু প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা উল্লেখ করার প্রয়াস করছি।

(১) গত ২০০5 সালে পুরুলিয়া কুড়মি মিলন সংঘের পরিচালনায় পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে কুড়মালি নেগাচার বিষয়ে আলোচনাকালে এক শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাঁর মতামত জানিয়ে বললেন, — "কুড়মিদের সামাজিক রীতি-নীতিতে অনেক কুসংস্কার চালু আছে। সেগুলি নিরসন আশু প্রয়োজন। যেগুলি সমাজের ক্ষতিসাধন করে। অনেক সময় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কাছে হীনমন্যতায় ভুগতে হয়। অপমানবোধে মাথা হেঁট করে থাকতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বললেন, — যেমন বিবাহের সময় 'আমলঅ খাওয়া'। যাকে বর-কনের থুথু খাওয়া বলা যেতে পারে। থুথু খেলে রোগ বীজানু সংক্রমিত হতে পারে। সাড়ম্বরে থুথু খাওয়া অনুষ্ঠান দেখে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গী বরযাত্রী হাসা-হাসি করে। 'আমলঅ খাওয়া' অনুষ্ঠান সমাজ থেকে তুলে দেওয়া দরকার।" জবাবী ভাষণে বলেছিলাম; — "কুসংস্কার বলে যে আচার তুলে দিতে চাইছেন, তুলে দেওয়ার পূর্বে গভীরভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখেছেন, কি না ? সত্যিই কি এই নেগাচারটি কুসংস্কার ? যদি বা কুসংস্কার হয়ে থাকে প্রাচীনকালে আরম্ভ হয়ে যুগ-যুগ ধরে মানুষ কেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত তা প্রতিপালন করে আসছেন ? আধুনিক কালেও ভাঁটা পড়ে নাই, কেন ?" আসুন একবার তলিয়ে দেখে নি। কোন কিছু ছাড়ার আগে একটু দেখে নি।

বিবাহ করতে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমগাছের সঙ্গে বরের বিবাহ দিতে হয়। ঐ আমগাছের তলে আমপাতার বোঁটা বর চিবোয়। মা-মাসী, পিসী, কাকী-জেঠি, ঠাকুরমায়েরা একে একে বরকে কোলে বসিয়ে হাতের চেটোয় তার আমলঅ নিয়ে পান করেন। অপরদিকে কনের সিঁথায় সিঁদুর পড়ার আগে কনেকে মহুল গাছের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে অনুরূপ আচার পালন করেন। এই আচার পালন করার জন্য মা-মাসীরা সারাদিন নিরম্বু উপবাস করে থাকেন। যৌথ পরিবারে ছেলে বা মেয়ে জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই ঐ সকল মা-মাসী, কাকী-জেঠির কোলে-পিঠে চড়ে তাদের আদর-সোহাগ খেয়ে সন্তান বড় হয়ে ওঠে। অনেক সময় তাদের বুকের দুধও সন্তান সেবন করে থাকে। যদি কোন রোগ সংক্রমন হবার থাকে ঐ সময়ই হতে পারে। যার সঙ্গে কনে-বরের নিকট রক্তের সম্পর্ক থাকে তারাই বর-কনের আমলঅ খায়। অন্যেরা খায় না। আরও একটি ব্যাপার আছে। যাদের সঙ্গে নিবিড় রক্তের সম্পর্ক থাকে তারাই সত্যিকারের আমলঅ খায়। অন্যেরা হাতের চেটোয় জল ঢেলে একরকম হাত

ধুয়ে কেবলমাত্র অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে থাকেন। যদি কোন ছেলে-মেয়ের ক্যানসার, টিবি, কুষ্ঠ কিম্বা অন্য কোন জটিল দুরারোগ্য সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় এবং কোন সুচিকিৎসক ডাক্তার সেই রোগের চিকিৎসা করেন। চিকিৎসার ফলে যদি রোগ মুক্ত সম্পূর্ণ ভাবে হয়েই থাকে ডাক্তারবাবু বড় জোর রোগ মুক্ত হয়েছে বলে তাঁর প্যাডে লিখিত সার্টিফিকেট লিখে দিতে পারেন। রুগী যে রোগ মুক্ত হয়েছে তার জন্য যতই টাকা দেন তিনি কখনোই কোন প্রকারেই লালারস পান করে প্রমাণ পত্র তিনি দেবেন না। কিন্তু মা-মাসী-পিসীরা এর প্রমাণপত্র অবহেলায় দিতে পারেন। তাঁরা প্রমাণ করে দেন যে পুত্র-কন্যাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সমাজকে নিরোগ সন্তান দিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ার কাজকে সাহায্য করতে সক্ষম।

যদি কোন পরিবার অন্য কারো ছেলে বা মেয়েকে লুকিয়ে কিম্বা অসামাজিক ভাবে নিয়ে এসে প্রতিপালন করেন। বিবাহের সময় অন্য কেউই তার আমলত খেতে রাজী হবেন না। তাঁরা আমলত খেয়ে শংসাপত্র দিয়ে থাকেন; — যে ছেলে বা মেয়েটির বিবাহ দেওয়া হচ্ছে, সে তাদের কুলেরই ছেলে বা মেয়ে। অসদ উপায়ে নিয়ে আনা অন্য রক্তের ছেলে-মেয়ে নহে।

পূর্ব-পুরুষরা জানতেন বৃক্ষ না থাকলে মানুষ কিম্বা অন্য কোন জীব বাঁচতে পারবে না। অকৃতজ্ঞ মানুষ কখনো বৃক্ষ কেটে ধ্বংস করে দিতে পারে। একে রক্ষা করা দরকার। বর্তমান কালের সরকারকে পর্যন্ত গাছ বাঁচাবার জন্য "একটি গাছ একটি প্রাণ" বলে বিজ্ঞাপন দিতে হচ্ছে। পূর্ব পুরুষেরা গাছের সঙ্গে মানুষের বিবাহ দিয়ে আত্মীক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন। যাতে করে মানুষ ঐ গাছ কাটতে না পারে। তার বিবেককে আঘাত করবে।

কনের সঙ্গে মহুল গাছের এবং আমগাছের সঙ্গে বরের বিবাহ দেওয়া হয়। মহুল গাছ বহু প্রসবা শক্তির অধিকারী, আমগাছ পৌরুষ শক্তিবৃদ্ধির অধিকারী। সেই কারণে তাদের সংস্পর্শে ঐ শক্তির গুণগুলি অর্জন করার জন্য বিবাহ দিয়ে যাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে।

পাশাপাশি এক সঙ্গে বসবাস করতে হলে অনেক সময় ঝগড়া-ঝাঁটি এমন কি খুন-খারাপি হয়ে যায়। কোর্ট-কাছারি, থানা-পুলিশ, মামলা-মকদ্দমা চলে। অনেক সময় সেগুলি মিটে যায়। আবার আগের মত আসা-যাওয়া, কথা-বার্তা, লেনদেন চলে। কিন্তু ছেলে বা মেয়ের বিবাহের সময় যদি জানান দেওয়া সত্ত্বেও কাকী-জেঠি আমলত খাওয়ার সময় গাছতলে এসে না দাঁড়ায় তা হলে গোষ্ঠী সম্পর্ক কিম্বা আত্মীয় সম্পর্ক জীবনভর ভেঙ্গে যায়। কোন কিছুর বিনিময়ে আর সেই আত্মীক সম্পর্ক জোড়া লাগানো যায় না। অনেক সময় দেখা গেছে

দীর্ঘ মেয়াদি পারিবারিক ঝগড়া-ঝাঁটি আমলঅ খেতে গাছতলে এসে দাঁড়ালেই সেই বিবাদ মিটে যায়। আমলঅ খাওয়া সেই গোষ্ঠীবদ্ধ, সমাজবদ্ধ ভাবে এক সাথে চলার একটি নেগাচার বলা যেতে পারে। বিভেদ ভুলে আন্তরিক সখ্যতার সাথে মিলে-মিশে থাকার, মেল বন্ধন দৃঢ় করার পূর্ব-পুরুষদের কৌশল কিনা কে বলতে পারে ?

আমলঅ খাওয়ার সময় গাছতলে এমন এক ভাবের পরিবেশ তৈরী হয় যা চোখে না দেখলে, অন্তর থেকে না বুঝলে, বোঝানো কঠিন। অন্তরের সঙ্গে অন্তরের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, যে দৃঢ় টান, যে বিষয়বস্তু, সেই আন্তরিক টানের আকর্ষণে প্রায়শই মা-মাসী, জেঠি-কাকী আত্মীয়দের চোখ সজল হয়ে আসে। এই আকর্ষণ সত্যিই বিশ্বজনীন।

আমলঅ খাওয়া নেগাচারের বিষয়ে যেটুকু জানা তার আলোচনা রাখলাম। যদি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে যাঁরা সপক্ষে আছেন তাঁরা হাত তুলে সমর্থন জ্ঞাপন করুন। দেখলাম একটিও হাত উঠল না। যাঁরা সচল রাখতে চান তাঁরা সমর্থন করুন। সভায় সকলেই দু-হাত তুলে সমর্থন জানালেন।”

(২) মানবাজার থানার জবলা গ্রামে আমার ফুলঘর। ফুলের সঙ্গে যুক্তি হয়েছে, ই বছর পরকুল মেলা টুসু পরব দেখতে যাব। সকালবেলা প্রথম বাসটি ধরে আমরা রওনা দিব। সেই কথা অনুসারে টুসু জাগরনের বাঁউড়ির রাতে আমাকে ফুলঘরে থাকতে হয়। ফুলঘরটি গাঁয়ের মাহাতঘর। গাঁয়ের প্রাথমিক শিক্ষক বানেশ্বর মাহাতর ঘর পড়শি ঘর। এক গোষ্ঠীর ই-ঘর উ-ঘর। শিক্ষকমশায়ের ছেলেরা এক ভাই ডাক্তার, এক ভাই হাইস্কুলের শিক্ষক, একজন উকিল, অপরজন পুরুলিয়া জর্জ কোর্টের মোক্তার। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও সবাই স্কুল-কলেজে পড়ছে। এক কথায় বলা যায় শিক্ষিত পরিবার। সেই সময় তাঁরা যৌথ পরিবারে বসবাস করছেন। ঘরের অবস্থা বেশ ভাল। মকর পরবে সবাই গাঁয়ে এসেছে। লোকজন মিলে জম-জমাট পরিবার। পরবে খাবার জন্যে নানা রকমের পিঠা-পায়েস তৈরী হচ্ছে। সন্ধ্যার পর পণ্ডিতমশায় নাতি-নাতনিদেরকে শুনিয়ে হাঁক দিয়ে বলছেন; — “এরে বাছারা! রা’তে ঘুমাবার সময় তল পায়ে, তল হাতে তেল মা‘খে ঘুমাবে। নাহলে ভূতে রক্ত চু’সে খাবেক্।” ঠাকুরদাদার কথা শু’নে কলেজে পড়া আধুনিক দু-এক জন নাতি-নাতিনা বলল; — “আমরা তেল লিব নাই। দেখি ন ভালা, কি ক’রে ভূতে রক্ত খায়। উ সব কুসংস্কার। এখন চলে না। তুমাদের আমলে যা কর’বার ক’রেছ। আমরা উ কুসংস্কার মা’নব নাই।”

দাদু আর কি করবেন ? চুপ্-চাপ্ শুয়ে পড়লেন। পরদিন মকরের সন্ধ্যার

সময় গাঁয়ের জনা পাঁচেক লোক এসে দাদুর সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে লাগলেন। দাদু বললেন; — "আমি সাত লাখ বলছি। তুমরা কত দিতে পা'রবে বল ?"

— "আমরা পাঁচলকে পাঁচ লাখ দিতে পা'রব। তবে এক মস্তে দিতে লা'রব। কিস্তি ক'রে দিব। তারপর আরঅ রেজিস্ট্রি খরচ আছে।"

— "তা হলে ঠিক আছে। ঐ পাঁচ লাখেই হ'ল। কবে দলিল ক'রতে যাবে বল ?"

— "দু-এক দিন বাদেই আমরা আ'সে ব'লে যাব।"

লোকজন চলে যাওয়ার পর ছেলে-নাতি-নাতরা বলতে লা'গল; — "কিসের দলিল ক'রে দিব ব'ললে ? উয়ারা পাঁচ লাখ টাকা দিব ব'লল ?"

— "কুলহি মুড়ার বড়অ বাঁধের আমাদের অংশটা বিকে দিব। উটা রা'খে কনঅ লাভ নাই। বরুম্ পাঁচ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিলে বহুৎ সুদ হবেক্। পাঁচ বছর পরে দশ লাখ হঁয়ে যাবেক্।"

— "তুমার কি মাথা খারাপ হঁয়েছে ? আমাদের টাকার কিসের অভাব যে বাঁধটা বিকে দিতে হবেক্ ? লাভ না হোক্, একটা মান-সম্মানের ব্যাপার বটে। আমরা ত লকের কাছে ব'লতেও পারি উটা আমাদের বাঁধ। আমরা তুমাকে ঐ বাঁধ কনঅ মতেই বিকতে দিব নাই। তুমাকে রেজিস্ট্রি ক'রতে ঘরেরলে যাতেই দিব নাই।"

— "আমার মাথা ঠিকেই আছে। তদের সবারেই মাথা খারাপ হঁয়ে গেছে। তা না হলে কি ক'রে তরা বলছিস্, আমাকে যাতে দিবি নাই ?"

— "আমরা ঠিকই বলছি।"

— "ঠিকই বলছিস্ ? ঐ বাঁধটার জন্যে এক ঝড়া মাটি ফেলার খরচা করি নাই। তদের বাপ-কাকারাও এক টাকা খরচ করে নাই। তাউ আপনার বলছি। উটা বিকতে আমাদের কষ্ট লা'গছে। উটা দিলে আমাদের মান-সম্মানে লা'গবেক্। বাঁধটা কন্ পূর্ব পুরুষে ক'রে গে'ছল কে জানে ? বলা যায় বাঁধটা পূর্ব পুরুষের সম্পত্তিকে আপনার বলছি, তেমনি নেগ্-নেগাচারও পূর্ব-পুরুষের দিয়া। উটা আমরা মা'নতে পারছি নাই। বলঅ ত হাতে-পায়ে তেল লিলে কি ক্ষতি হ'ত ? আমিঅ জানি, তেল না লিলে ভূতে রক্ত চু'সে খাবেক্ নাই। কি উপকারে লাগে সেটা পরের কথা। ঐগুলি আমাদের মান্য ক'রতে শিখায়। এখনকার ছেল্যা-ছুলুর না মানার ঝুঁক বা'ড়হেছে। যে যত না মা'নছে সে তত নিজেকে আধুনিক ভা'বছে। কিন্তুক ইটা কি ভা'বে দে'খেছ, আজ নেগাচার মা'নছ নাই। কাল আমাকে মা'নবে নাই। এমিন ক'রে ভাই দাদাকে মা'নবেক্ নাই। স্ত্রী স্বামীকে মা'নবেক্ নাই। ছেল্যা বাপের কথা শু'নবেক্ নাই। সংসারের

সারটায় চ'লে যাবেক্। সংসার অসার হঁয়ে যাবেক্। সমাজে শৃংখলা ব'লে কিছু থা'কবেক্ নাই। কেউ কাউকে মান্য ক'রবেক্ নাই। মানা-মানি হবেক্ নাই। তা হালে কি কারু ভাল হবেক্ ?"

— "হাতে-পায়ে তেল লিয়ার ভিতরে এত কথা ? আমরা বু'ঝে বলি নাই।"

— "আমার মাথা ঠিকই আছে। তুমাদের ভয়ের কনঅ কারণ নাই। বাঁধ আমি কাকউ দিব নাই। এমনকি দিব ব'লে মনেও করি নাই। ঐটুকু না ক'রলে কেউ কি আমার এত কথা মন দিঁয়ে শু'নতে ? তুমরাকে কথা শুনাব ব'লেই উয়াদের সঙে তুমরাকে শুনাঞ শুনাঞ বাঁধ বিকার গলফটা ক'রতেছিলি, এতখনে নিশ্চয় সবাই বু'ঝতে পা'রলে ?"

সবাই একে একে দাদুকে দণ্ডবৎ ক'রল। যাতে যাতে হাঁসা-হাঁসি ক'রে বলা বলি হতে লা'গল; — "ইয়াকেই বলে পুন্না চাল ভাতে বাড়হে।"

বানেশ্বর পণ্ডিতের এক নাতি আমার সহপাঠী। রা'তেই ঐ ঘটনার কথা শু'নেছি। পরদিন সকালে দাদুর কাছে আর একবার ভাল ক'রে শু'নে নিয়েছিলাম। সব শু'নে দাদুকে প্রণাম ক'রে ঘর ফিরলাম।

(৩) পুনঞা থানার জামবাদ গ্রামের শশধর রায়। গ্রাম সম্পর্কে তিনি আমার মামা। আমি লক্ষ্য করতাম, গ্রামের যে কোন লোকের বাড়ীর বিবাহ, শ্রদ্ধাপূজা কিম্বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে কেউ ডাকুন আর নাই ডাকুন হাতের ধরা ঠেংগা ঠুঁকে ঠুঁকে কোন না কোন এক সময় হাজির হয়েছেন। তিনি পৌছাঁনোর সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্তা সমাদর করে তাঁকে বসাতেন। কোথাও অন্যথা হয়েছে আমার নজরে তেমন পড়ে নাই। কারো বাড়ী যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনরূপ মান-অভিমান হয়েছে এমন কথাও শুনি নাই। তাঁর কুড়মালি সমাজ-সামাজিকতা ও নেগ-নেগাচারের জ্ঞান ছিল অগাধ। সামাজিক যে কোন জটিল সমস্যাকে অতি সহজেই মীমাংসা করে দিতে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। কুড়মি সমাজে এমন প্রত্যুৎপন্নমতি মানুষ অন্ততঃ আমার চোখে পড়ে নাই। আমার কোন সামাজিক প্রশ্ন থাকলে তাঁর কাছ যেতাম এবং তিনি তুরন্ত আমার প্রশ্নের সমাধান বলে দিতে পারতেন।

সম্ভবতঃ ১৯৭২-৭৩ সাল হবে, গত চাযের মরসুমে বৃষ্টির অভাবে গোটা মানভূম এলাকায় ভাল চায হয় নাই। জামবাদ গ্রামে তো খরাই বলা যায়। সেই বৎসর চাযের আগে শশধর রায় মহাশয়ের মা প্রয়াত হলেন। ঘরে বীজধানের অভাব, তেমনি সময়ে মায়ের কাজ-ভোজ করতে হবে। তিনি কঠিন সমস্যায় পড়ে গেলেন। তাঁরা এলাকার মাহাত ঘর। পরগনা জুড়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে

তাঁকে অনেকেই ডাকেন। নমঃ নমঃ করে মায়ের কাজ-ভোজ পার করার ক্ষেত্রে তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। বারে বারে তো এই রকম কাজ আসে না। বাধ্য হয়ে এক বড় বহাল ক্ষেত দেখিয়ে মহাজনের কাছে টাকা নিলেন। মহাজনের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হল, কাজ-ভোজের পর সুদ সমেত টাকা ফেরৎ না দিতে পারলে জমিটি কয়ালা দলিল করে একবারকেই দিয়ে দিবেন।

শশধর রায়ের আত্মীয়-কুটুম্ব বেশীর ভাগেই সচ্ছল পরিবারে। এই সময়কাল পর্যন্ত কুড়মালি নেগ-নেগাচার প্রথা এক রকম পুরোপুরি সমাজে সচল ছিল। সমাজে কোন আত্মীয়-কুটুম্বের সামাজিক কাজ পড়লে সেই কাজকে গোষ্ঠী-ভায়াদ, কুটুম্ব, ফুল-পরান এক রকম নিজের কাজ মনে করে যার যেমন সামর্থ কিম্বা আগের দেওয়া অর্থ-দ্রব্য যথা সময়ে পৌঁছে দেওয়ার চল ছিল। বলা যায়, গৃহকর্তাকে এককভাবে সবটা বহন করতে হত না।

শশধর রায়ের মায়ের কাজে আগা-গোড়া ছিলাম। আমার উপর ভার ছিল, কোন আত্মীয় কুটুম্ব কে কি নিয়ে আসছেন সেইগুলি লিখে রাখা এবং কাজের শেষে সেইগুলি জানান দেওয়া।

শ্রাদ্ধপূজার আগের দিন অর্থাৎ ঘাটসিনানের দিন সকাল থেকেই বিভিন্ন আত্মীয়-কুটুম্ববাড়ী থেকে, ভারে ভারে চাল, চিঁড়ে, গুড়, দই আসতে লাগল। কাপড়, টাকা, তরিতরকারী, খাসি পৌঁছাতে লাগল। কাজ-ভোজ পার হওয়ার পর দেখা গেল মহাজনের কাছে নেওয়া টাকা মায় অন্যান্য সমূহ খরচ-খরচা মিটিয়ে চাষ খরচ কেন আরও ছয় মাস সংসার চালানোর মত চাল-টাকায় অবহেলে চলে যাবে। সব হিসাব জমা হয়ে যাওয়ার পর মামা আমাকে বললেন; — "দেখলে ত ভাগ্না! আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কত বড় দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান ছিলেন ? তাঁরা জানতেন বলেই পরের প্রজন্মের মানুষ যাতে ভাল ভাবে সংসারে থাকতে পারে, সহায়-সম্বলহীন হয়ে একা হয়ে ভেঙে না পড়ে যায় তার কেমন পাকা বেন্দোবস্ত সমাজে চালু করে রেখে গেছেন ? আজ কাঙালের কেউ নাই রে... এটা হতে দেয় নাই। যখন আমি টুয়র হলি, বড় ভাবনায় পড়ে গেলি, অসহায় বোধ করলি, কত আপনজন আমার পাশে এসে দাঁড়াল। সবাই জানান দিঁয়ে গেল, মায়ের মত আমার জীবনের বটগাছ আমি আর পাব না ঠিকই, কিন্তু তুমার বেশী চিন্তার কারণ নাই। আমরা তুমার পাশেই আছি।"

কুড়মালি নেগাচারে অবাস্তব ও কাল্পনিক স্বর্গ-নরক বলতে কিছু নেই। ইহ জীবনের কর্মফল এই জীবনেই ভোগা-ভোগ করতে হয়। তেমনি কাল্পনিক কোন পাপ-পুণ্য বলেও কিছু নেই। সৎ বা ভাল কর্মের জন্য সুফল, সুখ্যাতি ও সুখ-শান্তি লাভ এবং অসৎ বা অপকর্মের কারণে কুফল, অখ্যাতি দুঃখ, অশান্তি,

কষ্ট ভোগ বাস্তব সংসার জীবনেই ফলাফল ভোগ করতে হয়।

কাল্পনিক কোন মূর্তি পূজারত কোন প্রচলনের কথা বলা নেই। যদি কারো কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়া যায় সরাসরি তাঁকেই সম্মান ও সুখ্যাতি করার কথা বলা হয়েছে। যদি বাস্তবে তাঁকে সামনে না পাওয়া যায় তা হলে তাঁকে স্মরণ করে সম্মান জানা যায়, তবে কখনোই তাঁর মূর্তি গড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নয়। আবার যদি তিনি প্রয়াত হয়ে থাকেন অর্থাৎ পরমা প্রকৃতি শক্তির সঙ্গে লীন হয়ে থাকেন তা হলে নিজের ভাল করার জন্যেই তাঁর সুনাম, সুখ্যাতি ও সম্মান জানানো যেতে পারে।

কুড়মালি নেগাচারে বুঢ়াবাবা শিব বলে গেছেন; — আমার পুজা করার তেমন প্রয়োজন নাই। সব সময় আমার বাণী স্মরণে রেখে সেই মোতাবিক কাজ করে যেতে হবে। সেই কারণে কুড়মালি নেগাচারী মানুষ আজও তাঁদের বিশেষ বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে শপথবাণী ধ্বনী রূপে উচ্চারণে ত্রি স্মরণ এবং বুঢ়াবাবার বাণীকে স্মরণ করে অনুষ্ঠান শেষ করেন। সেই ধ্বনী দিয়ে এই নিবন্ধের ইতি টানছি।

"আমরা সৎ ও সত্যের পথে চলব;
আমরা ন্যায় ও নীতির পথে চলব।
আমরা এক সঙ্গে মিলে-মিশে চলব।।
ব্যোম ব্যোম বুঢ়াবাবা, —
শিব বাণী বহো।
নমঃ নমঃ মহামাএঃ,
শিব বাণী বহো।।"

তথ্য সাহায্যকারী ঃ

১। চারিআন মাহাত (প্রবন্ধ - সারি ধরনের দার্শনিক তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়) — ফুসড়াবাদ, পাড়া;
২। নগেন পুনুড়িআর — টিমাংদা, ঝালদা;
৩। কর্মবীর মাহাত (জামবাদ - কেন্দা)
৪। রবীন্দ্রনাথ মাহাত (পাকবিড়রা পুনএ্যা)

কুড়মালি নেগাচারে জাগরণ

"অহিরে, — জাগো হো লক্ষ্মী জাগো হো ভগবতী
জাগে ত আমাবস্যার রাতিরে।
(আর) জাগেকা পতিফল দেবে গো মাঞই
পাঁচঅ পুতায় দশঅ ধেনুগাইঅরে।।"

উক্ত বাঁদনা গীতটিতে রাত্রি জাগরণের কথা বলা হয়েছে। জাগরণ করলে উপযুক্ত ফললাভের কথাও বলা হয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে রাত্রিতে না ঘুমালেই কি জাগরণ হয় ? না এর পরও কিছু বাড়তি কথা আছে ? 'জাগরণ' কথাটি জানার জন্য দু'চারটি বাড়তি কথা বলি।

জাগরণ কি ?

মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রাকৃতিক নানান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে, অনেক সংকট কাটিয়ে, কত ভুল সংশোধন করতে করতে, যুগ যুগ ধরে সে এগিয়ে চলেছে। সমাজ গঠন করেছে। এক সময় প্রকৃতির নিয়ম-নীতি মেনে মানুষের সমাজ ও জীবন ছিল সরল-সহজ ও সাধারণ। ক্রমেই জীবন ও সমাজ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে সমস্যা নতুন নতুন করে দেখা দিয়েছে। মানুষও নতুন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সমস্যার নতুন সমাধানের পথ খুঁজেছে। চলতে চলতে পথ তৈরী হয়। যাঁরা পথ দেখেছেন, পথ চিনেছেন তাঁরাই তাঁদের উত্তরসুরীদের জন্য পথের নিশানা, সমস্যার সমাধানের দিশা রেখে দিয়ে গেছেন। যাতে করে তাঁদের পরের বংশধরেরা সুখে সচ্ছন্দে সংসারে চলতে পারে। হোঁচট খেয়ে না মরে।

আমরা সবাই সমাজে বাস করি। বলতে গেলে সামাজিক জীব। আমাকে কেউ অসামাজিক বললে নিশ্চয় আমার রাগ হবে। সমাজে বাস করলে একা সব কিছু করতে পারি না। মূল্য দিয়ে হোক, অন্য কিছুর বিনিময়ে হোক, চেয়ে চিন্তে হোক আমার দরকারী জিনিসটি জোগাড় করে নিতেই হবে। এর জন্য কোন না কোন ভাবে সমাজের কাছে আমি ঋণী। অনেক সময় এই চিন্তা আমি করি না। মনেও রাখি না। বিশেষ ভাবে মানুষের ক্ষমতা বাড়লে অহংকার বাড়ে, দুর্নীতি বাড়ে। মানুয জন্ম সূত্রেই তার মনের ঝোঁক থাকে এক দিকে হিংসা ও বিদ্বেষ, সে অপরকে ধ্বংস করতে চায় আর তারই অপর দিকে থাকে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে অন্যের সাথে চায় মিলন।

প্রকৃতির বিধানে বংশ রক্ষার জন্য যেমন প্রয়োজন যৌনতা। জীবন রক্ষার জন্য চায় অন্ন বস্ত্র আর বাসস্থান। কিন্তু অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান নিয়েই কি মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে ? না, আরো কিছু চায় সে? মানুষের প্রবণতা অন্যকে বঞ্চিত করে চায় আরো সুখ আরো ভোগ করতে। ভোগে বিলাসী হতে হতে বিবেকবোধ, আত্মচেতনাবোধ হারিয়ে বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে। নিশ্চয় সমাজ তাতে ভাল থাকতে পারে না। কুড়মালি সমাজও এই নিয়ম-নীতির বাইরে নয়।

আমাদের কুড়মি সমাজের জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা সেই জন্যই নির্দেশ দিয়ে গেছেন, নিধান রেখে গেছেন, যাতে করে সদাই যেন আমরা সজাগ থাকি। জেগে থাকা মানে সচেতন থাকা। জেগে থেকে অচেতনে ঘুমিয়ে না পড়ি। "জাগরণ" কথাটা ভাঙলেই এর অর্থ পা্ওয়া যাবে। জাগ + রণ = জাগরণ। জাগ > না ঘুমানো, রণ > লড়াই করা। সমাজে নিজস্ব মর্যাদা নিয়ে সুন্দর ও সুস্থ ভাবে বাঁচতে গেলে সচেতন ভাবে লড়াই করেই বাঁচতে হবে। সে লড়াই সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কত রকমেরই হতে পারে।

বুদ্ধদেবও মানুষকে অতন্দ্র থাকতে বলেছেন। চেতনা যখন আচ্ছন্ন হয়, বুদ্ধিতে আসে জড়তা, তখনই বিপদ। আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন, মানুষ ভুল পথে চলবে। যা আমাদের সকলের মঙ্গল করবে, ভাল হবে, সেই কাজ, সেই কথা না মেনে লোভে-মোহে-চাপে পড়ে ফাঁদে ঢুকবে। বেঘোরে হালে-ডালে হয়ে মরবে।

সমাজ যত দিন থাকবে এর সমস্যা থাকবে। তার উন্নয়ণের কাজও থাকবে। দিন দিন মত পথ পরিবর্তন হবে। এই সব সাত-পাঁচ ভাবনা-চিন্তা করেই নির্দিষ্ট কিছু উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে জাগরণ প্রতিপালনের নিধান রেখে গেছেন। নিদান পক্ষে, ঐ বিশেষ দিনগুলিতে যাতে করে পাঁচ ভাই এক সাথে বসে আলাপ-আলোচনা করে ঐ ঐ বিশেষ বিষয়ে ভূত-ভবিষ্যত ও বর্তমানের সঠিক কাজের দিশা ঠিক করে নিতে পারে।

বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য থেকে যা জেনেছি বুঝেছি এবং আমার নিজস্ব যে ধারণা তৈরী হয়েছে সেই নিরিখেই কিছু বলার চেষ্টা করছি। যতটুকু গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে, সেইটুকু নিতেই অনুরোধ রাখছি। বাহুল্য বোধ হলে তা কখনও নিবেন না। সবই আপনার বিচার ও বিবেচনার উপর ছেড়ে দিলাম। তবে বিষয়টি অনেক বড় সংক্ষেপে বলতে গিয়ে কিছু ঘাটতি থাকবেই।

আমাদের কুড়মি সমাজের বিশেষ কোন ক্রিয়া উপলক্ষে এবং বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাদের জাগরণ প্রতিপালন করার চল আছে। জাগরণ না করলে ঐ ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ হয় না। সাধারণ

কথায় আধপুরা থেকে যায়। জাগরণের বিধান দেওয়া আছে কিভাবে, কেমন করে কোন কোন ক্রিয়া-কর্ম করে জাগরণের কাজ করবো। ঘুমানো মোটেই চলবে না। কঠোরভাবে তা নিষিদ্ধ। ঘুম হলে আর জাগরণ কি ?

জাগর জ্বালা ঃ জাগরণের সাথে সাথেই আবার জাগরের কথাও এসে যায়। দেখা যায়, বেশীর ভাগ জাগরণেরই জাগরণের প্রথম কাজ জাগর জ্বালা। আমরা সবাই জানি জাগর হল ঘিয়ের প্রদীপ। অবশ্যই প্রদীপটি একেবারে নতুন হতে হবে। একবার প্রদীপ জ্বালা হলে পর রাত ভর তা জ্বলবে। জাগরের খাবার ঘি অনুষ্ঠানকারীকে অতি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অনেক সময়ই জাগরহাঁড়ির ভিতরে জাগর জ্বালিয়ে রাখা হয়। হাঁড়িটিও নতুন হতে হবে। পুরাতন হাঁড়ি নৈব নৈব চ। হাঁড়ির গায়ে অসংখ্য ফুটো করে দিতে হয়। যাতে করে সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারে।

যাই হোক, আসা যাক জাগরণের কথায়। যদিও সবারই জানা কথা, নতুন কিছুই না। একবার উলট-পালট করে দেখা, এই মাত্র।

এবার দেখা যাক, আমাদের কুড়মি সমাজে কোন কোন উপলক্ষে জাগরণ করার আচার আছে। আমি যেটুকু জানি সেইগুলির কথাই উল্লেখ করছি। বাড়তি আরও থাকতেই পারে; দয়া করে যোগ করে নিবেন।

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে তিনটি বিশেষ দিন আছে। জনম, বিবাহ আর মরণ বা মৃত্যুর দিন। কারো জন্মের সময় বা দিনে জাগর জ্বালা বা জাগরণ করার কোন নেগ-নীতি আছে তা আমাদের জানা নেই। বিবাহের সময় ছামড়াতলে প্রদীপ জ্বালানো হয় ঠিক কথা, কিন্তু তাকে কখনই জাগরণ বলা হয় না। অনেকেই জেগে রাত কাটালেও তাকে জাগরণও কেউ কখনই বলেন না। একটু খেয়াল করে দেখুন, বিবাহের আগের দিন পর্যন্ত একটা কাজ পূর্ণ না হলে বিয়ের পিঁড়িতে বসার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। সেই কাজটি হল 'ধরম পূজা'। জন্মের পরে, বিবাহের আগের দিন অবধি ঐ কাজটি করে নিতেই হয়। ধরম পূজার বৃহৎ রূপ পাঁতাপূজা। নেগ-যোগ প্রায় একই।

ধরম পূজার জাগরণ ঃ ধরম পূজা করতে গেলে পূজার বার আছে, উপবাস আছে, আছে জাগরণও। দেখে নেওয়া যাক, কি সব নেগা-চারে ধরম পূজার জাগরণ করি। প্রথমে তুলসী পিঁড়হা/তুলসীথানে জাগর জ্বালতে হবে। ব্রতীরা সন্ধ্যা-প্রদীপ দিবে। জাগরের সামনে অনুষ্ঠানকারীর আত্মীয়-স্বজন, গোষ্ঠী-ভায়াদ, পাড়া-প্রতিবেশী, ফুল-পরাণ এক সঙ্গে বসে ধরম পূজার আচার গীত "মাহারায়" শুনবেন। মাহারায় গীতের দল রাত ভোর ঐ গীত গাইবেন।

গীতের ফাঁকে মাঝে মাঝে আবার ধর্ম বিষয়ে আলোচনা চলবে। আমাদের ধর্ম কি ? কেমন করে আমরা পালন করবো ? কেউ মান্যতা না করলে তার প্রতিবিধান কি হবে ? এইসব নানান কথা ও প্রশ্ন উঠে আসবে। প্রশ্ন উঠলে বিভিন্ন যুক্তি তর্ক চলবে। আলোচনা সাপেক্ষে মীমাংসাও উঠে আসবে।

"মাহারায়" কুড়মালি মহাকাব্য। কুড়মালিতে "রাই" হল পুরুষ দেবতা আর রইআ বা সিনি হল স্ত্রী দেবতা বা দেবী। যেমন গুঁসাঞ রাই পুরুষ দেবতা। গরইআ স্ত্রী দেবতা। তেমনি টাড়াসিনি, দুয়ারসিনি স্ত্রী দেবতা। মহারাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। "রা" বা রাই হল সূর্য্য দেব। সূর্য্যই হল কুড়মি জাতির শ্রেষ্ঠ উপাস্য দেবতা। বিশ্বাস, সূর্য্যই জনম-মরণ-বাঁচনের অধিকারী। সেই কারণেই তাঁকে সকাল-সন্ধ্যা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানোর রীতি আছে। তাঁকে স্মরণ করেই দিবা-রাত্রির কাজ আরম্ভ করা হয়। যদিও অচেতন ভাবে আমরা আমাদের আসল ধর্ম ভুলে বসে আছি। অজান্তে হিন্দু হয়ে গেছি।

আমাদের ধর্ম সত্য ধর্ম। যাকে বলা হয় সারি/সারনা। এর প্রচলনকারী আমাদের সমাজ গঠনকারী। একাধারে তিনি সমাজের নেগ-নীতি-নেগাচার, যোগ-সাধনা, কৃষিপদ্ধতি, চিকিৎসা বিদ্যা, নাচ-গীতের শ্রষ্ঠাও। তিনি কোন কাল্পনিক দেবতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন আমাদেরই মত রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। হড়। 'হড়' থেকেই বিকৃত হয়ে হয়েছেন "হর"। তিনি ছিলেন আমাদেরই সমাজের মানুষ। জ্ঞানে-গরিমায় চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষ। তাঁর অনুগামী মানুষকে বলা ত "হড়"। পরে মনুবাদীদের বলা হল মানুষ। যেহেতু মনুবাদীরাই দেশ শাসনের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করে নিল। চাপে-ভয়ে হড় সকল মানুষ হয়ে গেল। মনুবাদীর দল আমাদের হড় বংশের শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে কাল্পনিক দেবতা বানিয়ে নিজেদের থলিয়ে পুরে থলি ভর্তি করে নিয়েছে। আজও কিন্তু আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ শিবকে শিব বলে নাম ধরে ডাকি না। বলি বুঢ়াবাবা। ঐ নামেই তাঁকে স্মরণ করি। মনুবাদীরা কিন্তু কখনোই ভুল করেও বুঢ়াবাপ বলে ডাকে না।

সূর্য্য উদয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মাহারায় গীত গাওয়া শেষ হয় আর সঙ্গে সঙ্গে ধরম/সূর্য্যদেবের পূজা ও বলির কাজ আরম্ভ হয়ে যায়।

শ্রদ্ধা পূজায় জাগরণ ঃ আমাদের কুড়মি গোষ্ঠীর মানুষের মৃত্যু হলে সামাজিক ভাবে কিছু নেগ-যোগের কাজ করতে হয়। দশ দিন শোক পালন করতে হয়। তেল-খোল, তিতাভাত, কাঁধকাঠ্যা এবং দশ দিনের দিন কাচা-খরা, কামান-সিনান আর ঘাট সিনান করে ঘাটে উঠতে হয়। অজান্তে হিন্দু হয়ে

যাওয়ার ফলে অধিকাংশ লোক পূর্বের সেই রীতি-রেওয়াজ ভুলে ব্রাহ্মণ ডেকে শ্রাদ্ধ করি এবং বৈষ্ণব ডেকে মঙ্গল রাত্রি করে জাগরণ করি।

কুড়মি সমাজের কেউ মারা গেলে সমাজে শ্রাদ্ধের চল ছিল না। ছিল শ্রদ্ধা-পূজা; মৃত্য ব্যক্তিকে সম্মান জানার নেগ-যোগ। ব্রাহ্মণ ডাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রায় এক শত বছরের মধ্যে শ্রাদ্ধ করার চল হয়েছে। মৃত ব্যক্তির মেয়ের ছেলে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ছেলের ভাগ্নে শ্রদ্ধা-পূজার কাজ পরিচালনা ও সহায়তা করতেন। সেই কারণেই ভাগিনা বড় এবং মামী/মামা তার প্রণাম নেয় না।

১০ দিনের দিন ঘাট সিনানের পর ভাগিনার পরিচালনায় জাগর জ্বালা হয়। জাগরকে সামনে রেখে তুলসী থানের চারিদিকে সমস্ত ঘাটুয়ারা এক সঙ্গে বসে জাগরণ করেন। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, ফুল-পরাণ, গোষ্ঠী-ভায়াদ তো থাকবেনই; আর থাকবেন সমাজের বিশিষ্ট গুণী-জ্ঞানী জনেরা। জাগরণে ধরম গীত গাওয়া হয়। গীত-গানের ফাঁকে ফাঁকে সমাজ ও সামাজিক বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা চলে। উপস্থিত দর্শকদের মধ্য থেকে নানান বিষয়ে সমস্যার কথা বিশেষ কিছু জানার কথা তুলে প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন ব্যতিরেকে সমাজের ভূত-ভবিষ্যত ও বর্তমানের বিভিন্ন অবস্থার বিষয়ের কথা, তাঁদের নতুন নতুন পরিকল্পনা ও মতামত জানিয়ে থাকেন। এই ভাবে গীতে গানে আলোচনায় কখন ভোর হয়ে যায় বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি রাত্রিটি শেষ হয়ে গেল ? যদি একটু আরো বড় হত তাহলে আরো অনেক কথা জানা যেত। ঠিক সকাল হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে গৃহকর্তা জাগরকে তুলসী থানের সামনে থেকে মাথায় তুলে কোঠা ঘরে নিয়ে রাখেন। গৃহিনী জল ঢাল দিতে দিতে গৃহকর্তাকে নিয়ে যান। ভাগিনা ঘাটুয়াদের ব্যবহারের জন্য তেল-আলতা ছুঁয়ে দেন। এই ভাবেই শ্রদ্ধা-পূজার জাগরণের রাত্রি যাপন করা হয়।

এছাড়াও বৎসরের নির্দিষ্ট কিছু কিছু দিন অথবা বিশেষ কোন পর্ব উপলক্ষে কুড়মি জাতি জাগরণ প্রতিপালন করেন। নিচে কয়েকটির কথা উল্লেখ করলাম।

গাঁয়ের পরব/গাজন উপলক্ষে জাগরণ ঃ বুঢ়াবাবা শিবের গাজন উৎসবকে আমরা গাঁয়ের পরব বলে থাকি। এই উপলক্ষে ফলার, জাগরণ, ভগতাঘুরা ও তেল-হলদা এই চার দিনের অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনে পড়ে জাগরণ। এই পূজা উপলক্ষে অনেক গ্রামেরই মূল অনুষ্ঠান জাগরণের রাত্রি।

পরবতি ও ভগতা সারাদিন বুঢ়াবাবার স্মরণে নির্জলা উপবাসে থেকে সন্ধ্যায় পুকুর কিম্বা নদীর ঘাটে ভগতা সিনান সেরে দণ্ডী দিতে দিতে মড়পে

আসেন। রাত্রিতে ব্রতীরা জনে জনে জাগর জ্বেলে জাগরণ করেন। পহরে পহরে এক এক সময় পথ দক্ষিণা, জাঁঘাল, ফুল-খেলা করেন। ছো, নাটুয়া, কাপ-ঝাঁপ, মাছানী ইত্যাদি নাচ-গীত করে রাত্রি যাপন করেন। নাচগীতে বুঢ়াবাবার কথা, নিজের জীবন জীবিকা ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সাধারণ মানুষ সব কিছু অবহিত হন।

আদিবাসী সমাজে বুঢ়াবাবার গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের কাছে এঁর মান্যতাও অসীম। আর্যরা ভারতে এসে তাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ঠিক ঠিক প্রচার করতে পারছিলেন না। দেখলেন প্রায় সকলেই বাবার অনুগামী ও ভক্ত। সেই কারণেই বুঢ়াবাবা শিবকে অপকৌশলে গুপ্তভাবে কালকুটের বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল। আর্যরা জোর প্রচার করছিল, শিব বিষ পান করেছেন ঠিকই কিন্তু কণ্ঠে ধারণ করে অমর হয়েছেন। বুঢ়াবাবার ভক্ত/শিষ্যরা তাঁকে খুঁজে হয়রান। কোথাও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে মৃত্যুর দশ দিন পরে গঙ্গার জলে তাঁর মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। সত্য সহজে গোপন করা যায় না। ভক্ত/শিষ্যগণ মৃতদেহ চিনে ফেলেন। লোক মুখে মুখে দ্রুত খোবর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গাঁয়ে লোক যেমন যেমন খোবর পেতে লাগলেন অমনি তাঁকে স্মরণ করে শোক পালন, ঘাট সিনান ও শ্রদ্ধাপূজার কাজ আরম্ভ করে দিতে লাগলেন। গাঁয়ে গাঁয়ে প্রতিষ্ঠা করা হতে লাগল বুঢ়াবাবার থান/মড়প।

বর্তমান কাল পর্যন্ত অর্থাৎ আজও প্রতি বছর তাঁকে স্মরণ করে দিন ধরে ধরে শোকপালন, উপবাস, কামান, ঘাটসিনান, জাগরণ ও শ্রদ্ধা-পূজার কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে প্রতিপালন করে আসছেন। শিব গাজন আর কিছুই না বাবাকে স্মরণ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও শ্রদ্ধা-পূজারই অনুষ্ঠান মাত্র। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ফেরে পড়ে কিছু অদল-বদল হয়েছে বৈকি। ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা কঠিন হবে না। বাড়ী-বাড়ী যে পাট নিয়ে ঘোরা সে তো বুঢ়াবাবার মৃতদেহের প্রতীক। কেউ মারা গেলে পাটে উঠে। পাটকার পাট নিয়ে বাড়ীতে আসেন। ধরম পূজার জাগরণ উপলক্ষে কিছু কথা বলা হয়েছে। পুনঃরুক্তি আর দরকার বলে মনে হয় না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আদিবাসী মানুষ ব্যতিরেকে গাজনে অন্যরা কেহ পরবতি বা ভগতা হয় না। পরিষ্কার ভাবে বললে উচ্চবর্গের মানুষ ভগতা সিনানে অংশগ্রহণ করা, ব্রত পালন এমন কি লটনও দেয় না।

করম পূজায় জাগরণ ঃ বৎসরের ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে করম পূজা। আর ঐ দিনেই জাগরণ। কুমারী মেয়েরা ঠিক করম পূজার সাত কিম্বা নয় দিন পূর্বে সাত/নয় রকমের শস্যের দানা নিয়ে বাঁশের ডালা/ঝুড়িতে

জাওয়া পাতে। কঠোর নিয়ম পালনের মধ্য দিয়ে সুচারুরূপে পরিচর্যা করে। করমের দিন নির্জলা উপবাসে থেকে আখড়া/আঙিনায় করম ডাল পুঁতে তার সামনে জাওয়া-ডালি রেখে জাগর/প্রদীপ জ্বেলে ডাল পূজা করে। জাওয়া-করম নাচ-গীত করে জাগরণ করে। লায়া করম পূজা করেন। পাশাপাশি দুইটি করম ডাল পোঁতা হয়। একটি ডাল সুরজ দেবতা অন্যটি বসমাতা মাঞয়ের। হলুদ সূতার বেড় দিয়ে লায়া দু'টি ডালকে বেঁধে দেন। তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। সূর্য্য ও পৃথিবীর মিলন না হলে কোন ফসল উৎপাদন/জন্মানো সম্ভব নহে। তিনি ব্রতীদের পৃথিবীর সৃষ্টি, জীবকূল তথা মানুষ কুলের সৃষ্টির সঙ্গে অন্য কথা কাহিনীও শোনান। ব্রতীরা তো বটেই অন্যান্য দর্শক ও শ্রোতাগণও তা শোনেন মনযোগ সহকারে। ফলে অনেক অজানা কথা জানতে পারেন এবং বুঝতে পারেন।

আমাদেরই কুমারী মেয়েরা খেলার ছলে বহুকাল পূর্বে কোন এক সময় কৃষি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। এই কৃষি সভ্যতা আবিষ্কারের সূচনার দিনটি তারা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে এবং পালন করে। এখন অনেক অনেক জায়গায় লায়া পূজারীর পরিবর্তে ব্রাহ্মণ এলে তাঁর জায়গা দখল করে নিয়েছেন। তিনি আদিবাসী মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বের আর কৃষি আবিষ্কারের কথা কি বলবেন ? তিনি করম পূজাকে তাঁদের নারায়ণের পাশ ফেরার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। নারায়ণের পাশ ফেরার কাহিনী শুনে শুনে পুণ্য অর্জন করছি। না ডাকলে তো কেউ আসবে না। মূল্য দিয়ে, পায়ের ধূলা খেয়ে আজগুবি কল্প কাহিনীর কথা শুনতে সত্যিই বড় মধুর লাগে। সে মধুপান করে জাগরণ করলে উদ্ধার হওয়া কে আর ঠেকাবে ?

জিতিয়া পূজার জাগরণ ঃ ভাদ্র/আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা-অষ্টমী তিথি ধরে জিতিয়া পূজা। অনেকে বলেন ডাল পরব। এই পূজায়ও আছে জাগরণ। করম পূজায় ব্রতী কুমারী মেয়েরা এখানে ব্রতী সন্তানবতী মায়েরা। স্বামী-সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্রত উপবাস।

আখড়া/আঙিনায় আখ ডাল পুঁতে লায়া করেন জিতিয়া পূজা। মায়েরা ডালায় পূজা সামগ্রী, ফুল, কাঁকুড়ের ব্যাটা প্রদীপ, গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল, হলুদ বাঁটা নিয়ে ডাল তলে আসেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে লায়ার নির্দেশ মতো পূজা সারেন।

পূজায় লায়া ব্রতীদের শোনান। ছেলের জন্ম দিলেই প্রকৃত মা হওয়া যায়

না। আদি মাতা জিতিয়া প্রকৃত মা। মাতৃত্বের পূর্ণ আধার। তিনি স্নেহ, মায়া, মমতা, দয়া, ক্ষমা, লালন ক্ষমতা, ধৈর্য্যশীলা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, সংযম, সৎজ্ঞান, সৎচিন্তা, স্বাস্থ্যজ্ঞান, সামাজিকতা ইত্যাদি ষোলটি গুণের অধিকারিনী ছিলেন। মায়েরা জিতিয়া মায়ের সেই ষোলটি গুণ পাওয়ার জন্য, সত্যিকারের মা হওয়ার জন্য ব্রত-উপবাস-পূজা করেন। আপন আপন সন্তানকে প্রকৃত মানুষ, সমাজের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সন্তান তৈরী করার লালন ক্ষমতা জিতিয়া মায়ের কাছে কামনা করেন। কথা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে লায়া ব্রতীদের ঐ কথা শোনান। বছর বছর ঐ কথা শুনে শুনে আর যাই হোক মায়েরা ষোলটি গুণ না পেলেও এক আধটা কথা কানে বেঁধে রেখে দেন।

করম পূজার মতো জিতিয়া পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত এসেছেন। তিনি কখনই জিতিয়া মায়ের কথা ব্রতীদের শোনান না। তিনি সূর্য্যের জারজ সন্তান জিতবাহনের কথা ও কাহিনী ব্যক্ত করেন। যার কোন ভিত নেই, সম্পূর্ণ অবাস্তব মন গড়া এক কল্প কাহিনী। ঐ আজগুবি গল্প শুনে শুনে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ব্রত উপবাস করে অবৈধ জারজ সন্তানের পূজা আমরা করবো কেন ? কেউ সাহস করে পুরোহিতের সামনে এই প্রশ্ন তোলেন না। অভিশাপের ভয়ও থাকতে পারে অথবা বিশ্বাসে মিলায়ে শাস্ত্র, তর্কে বহুদূর। সাপ আর ব্যাঙ যাই হোক, সত্যি বলে মেনে নিতে বাধ্য। যুক্তি-তর্ক তোলা বৃথা।

তেলী ঘরের তেল ধবা ঘরের বাতি।
না জ্বলে জিয়ারা জ্বলে সারা রাতি।।

এই গীতিট ধরে আখড়ালকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে ব্রতীরা অন্ততঃ আড়াই পাক ঘুরবেন। পূজা শেষে প্রথমে ব্রতীরা ও অন্যান্য মা-বোনেরা দাঁড় ধরেন। আখ গাছকে ঘিরে ঘিরে পাঁতা নাচ-গীত করেন। অবশেষে আসেন পুরুষ মানুষের দল। ঢোল-ধমসা-মাদ্যল সহযোগে রাত ভর চলে পাঁতাশালিয়া নাচ।

ঝুমুরিয়া ঝুমুরে রেগ তোলেন, — যেমন —

মু ধূবি সকালে, বাস্যাম খাবি বিকালে।
কম কম খাবি বঁধু ই বছরের আকালে।।
হাঁটু ধর্যে বসবি, চাটু ধ'রে বাঁটবি,
টুইয়েক খাবি টুইয়েক জগাঞ রাখবি।
ছেল্যা কাঁদা মনে রাখবি।।

গীতগুলি সমাজ জীবনের দর্পন স্বরূপ। বড়ই প্রাণের, বড়ই আপনার। এমন অনাবিল আনন্দ, মেলবন্ধন ও সুস্থ জীবন বোধ আর কোথায় মিলবে ?

জিহুড় জাগরণ ঃ কুড়মি জাতি গোষ্ঠীর লোক মূলত কৃষক। কৃষিই এদের জীবন জীবিকা। তাঁর জিহুড় দিনটিকে বিশেষ দিন হিসাবে পালন করেন। বৎসরের আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন জিহুড়। ঘর-দোর নিকানো, খামার বাঁধা, একুশ রকমের শাক রান্না করে খাওয়া, ক্ষেতের গর্ভবতী ধানকে স্বাদ-অন্ন খাওয়ানো কাজতো আছেই আছে রাত্রিতে জিহুড় জাগার কাজ। লোক বিশ্বাস, আজের দিনে "জিহুড় জল" খেয়ে আসল যত সাপ সবই গর্তে ঢুকে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়বে। আবার ১৩ই জৈষ্ঠ্য রহিনের দিন বার হবে। জিহুড় জলে ধানে দুধ ভরবে, ঝিনুকে মুক্তা হবে, হাতীরমাথায় পড়লে গজমুক্তা ও সাপের মাথায় পড়লে মানিক হবে।

জিহুড় জল পেয়ে নীরোগ হওয়ার বাসনা নিয়ে মাঠে মাঠে, ক্ষেতে ক্ষেতে অনেক কৃষক ছড়িয়ে পড়েন এবং জোরে জোরে "জিহুড় জাগো—জিহুড় জাগো" ডাক দিতে দিতে অনেকে জাগরণ পালন করেন। কোথাও কোথাও খোলা আকাশের তলায় কাঠিনাচ, পাঁতা নাচ, নাচনী নাচ, ঝুম্যর নাচ ও গীতের অনুষ্ঠান করেন। আবার কোথাও আখড়ায় বসে জান কহনি, ভাঙান কহনির আসর। এগুলি সবই আমাদের জীবন কথা। কোথাও মজলিস। মজলিসে ফসলের রোগ, তার প্রতিকার, কিসে অধিক উৎপাদন হবে তার উপায়, নতুন নতুন চাষ-আবাদ, তার লাভ-ক্ষতিই বা কি এই সব নানা অভিজ্ঞতার কথা, হাস্য-কৌতুক, রঙ্গ-রসে রাত পার হয়ে যায়।

বাঁদনায় জাগরণ ঃ আশ্বিন মাসের শেষে কার্তিক মাসের মধ্যে যে দিন অমাবস্যা তিথি পড়ে সেই তিথি ধরেই বাঁদনা পরব। বাঁদনা কুড়মি জাতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। ঘাউয়া, অমাবস্যা গরইয়া, বুড়িবাঁদনা, কাঁটাকাড়া মোট পাঁচ দিনের বাঁদনা পরব। দ্বিতীয় দিনে অমাবস্যা আর ঐ দিন বাঁদনার জাগরণ। কুড়মি পরিবারের বৎসরের ব্যস্ততম দিন এইটি। কত রকমের নেগাচার পালন হবে, সন্ধ্যায় কাঁচঅ দূয়ারী, ছেলে মেয়েদের ইঁজই-পিঁজই খেল, গাই-বলদ-কাড়া-মোষের শিং-এ তেল দেওয়া, প্রত্যেককে পেট ভরে ঘাস-খড় দেওয়া, পিঠা-পায়েস তৈরী ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো আছে গোয়ালে গোয়ালে জাগর জ্বালা, ঝাঁগড় (অহিরা) দলগুলিকে আপ্যায়ন এবং বিদায় করার কাজ।

আদিবাসী মানুষ যাঁর কাছ থেকে কোন উপকার পায়, তার উপকার স্বীকার করে তাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। মাঠে-ক্ষেতে যে ফসল ফলেছে, তাতো একা কৃষকের শ্রমে হয় নাই। গরু-মহিষের প্রচণ্ড শ্রমের সহায়তা নিতে হয়েছে।

তাদের শ্রম ব্যতিরেকে ফসল ফলানোর কাজ প্রায় অসম্ভব। সেই কারণেই তাদের উপকারের কথা স্মরণ করে, তাদের ঋণ স্বীকার করে নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের শ্রদ্ধা পূজা দেওয়া ও বন্দনার গীত গাওয়াই হল বাঁদনা অনুষ্ঠান।

ঝাঁগড় দল বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বাজ-বাজনা করতে করতে গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারের বাড়ী যাবেন। গো বন্দনার গীত গাইবেন। গৃহকর্তা ঝাঁগড়দলকে সাধ্যমতো পিঠা-পায়েস-তামাকু দিয়ে আপ্যায়ন করবেন এবং সাম্মানিক কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় জানাবেন। ঝাঁগড়/ধেঙ্গুয়ান দল অন্য পরিবারের উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। নিম্নে একটি বাঁদনা গীতের উল্লেখ করছি। এই রকম হাজার হাজার বহু বিষয়ের গীত আছে।

"অহিরেঃ— কনঅ রাতি জাগয়ে দেবা-ধরমা রে বাবুহো।
কনঅ রাতি জাগে ধেনু গাই ?
(আর) কনঅ রাতি জাগয়ে ঘরেরঅ কিষনোয়া ভাই।
কনঅ রাতি জাগে রে গুলিন ?

অহিরেঃ— অহ রাতি জাগয়ে দেবা-ধরমারে বাবুহো।
পহর রাতি জাগে ধেনু গাই।
(আর) নিশি রাতি জাগয়ে ঘরেরঅ কিষনোয়া ভাই।
ভিনসরে জাগেরে গুলিন।"

সমস্ত রাত্রি এই বাঁদনা/অহিরা গীত চলে, আশেপাশের গ্রামগুলিতেও অনুরূপ অনুষ্ঠান চলতে থাকে। চারপাশে একটা বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। গীতগুলি প্রত্যেককে সমাজ সচেতন ও কৃতজ্ঞ পরায়ণ হতে সাহায্য করে। কর্মহীন ও অকৃতজ্ঞ না হওয়ার সাবধান বাণী শোনায়।

টুসু জাগরণ ঃ আদিবাসী কৃষিবর্ষের শেষ দিন মকর। ঐ দিন টুসু উৎসব। টুসু তিন দিনের অনুষ্ঠান। চাঁউড়ি, বাঁউড়ি আর মকর। অগ্রহায়ন সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় খামার থেকে 'ডিনি" মায়ের ধান নিয়ে মেয়েরা টুসু পাতে। সূর্য্য মকরের দিন উত্তরায়ন ছেড়ে দক্ষিনায়নে প্রবেশ করে। এই সূর্য্যর সঙ্গেও টুসু উৎসবের যোগ আছে।

টুসু মূলতঃ শষ্য উৎসব। ফসলের সৃজনী শক্তিই টুসু। টুসুকে দেবী, মা, কন্যা, খেলার সাথী বিভিন্ন রূপে কল্পনা করা হয়। গান বাঁধা হয়।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় গেঁদাফুল/বাঁদুফুল দিয়ে টুসুর পূজা করা হয়। চিঁড়ে ভাজা, চাল ভাজা ভোগ দিয়ে গীত গাওয়া হয়। মকরের আগের দিন বাঁউড়ি। টুসা জাগরণের রাত্রি। অনেক কাজ। কাল টুসু বিসর্জনের দিন। টুসুকে চৌড়লে

চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চৌড়ল সংগ্রহ করতে হবে, গেঁদা ফুলের মালা তৈরী করতে হবে। মনোমত জাগরণের জায়গা তৈরী করতে হবে। মকর স্নান করে তিলের নাড়ু, উঁধি পিঠা খেতে হবে তা তৈরী করে নিতে হবে।

রাত্রিতে ঐ সমস্ত কাজ সেরে মেয়ে-বউরা তল হাতে-তল পায়ে সরিষার তেল মেখে, সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে, টুসুকে শেষ গেঁদাফুল দিয়ে, সাধ্যমতো ভোগ দিয়ে সকলে বসে যায় টুসু জাগরণের গীত গাইতে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত গীতের ছেদ পড়বে না। মাঝে-মাঝে হাসি-মসকরা হয় বই কি। ছেলেছোকরার দলও বসে থাকবে না। ঢোল-ধমসা-মাদ্যল নিয়ে টুসু গীত গাইতে গাইতে পাড়া ঘুরে গাঁ জাগার কাজটি করবে।

টুসু গীত সহজ-সরল সুরের গীত। একটু চেষ্টা করলেই যে কেউ দু'চারটি গীত অবহেলায় জুড়তে পারেন। যেকোন বিষয়ের টুসু গীত বাঁধা যায়। এই গীতে সহজভাবে নিজের মনের কথা বলা যায়। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, আনন্দ-উচ্ছ্বাস সবকিছুই এই গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। টুসু গীত একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। একটি গীত যেমন —

ধুয়া — "ঘুষ না দিলে কাজ হয় না,
অফিসারেরা চ'খ রাঙায়।
টাকা পালেই হুদকে উঠে,
দালান গিলা আসে যায়।।"

রং — "কলি কালে কি হ'ল রে ভাই।
ভাসুর-বুয়াসিন একটা পিঁড়হায় বস্যে খায়।।"

সে যাই হোক রাত্রি শেষে-ভোরে এক একটি মেয়ের দল অপর দলের সঙ্গে মালা বদল করতে যায়।

"লে — লে — লে মালা বদল কর।
আমরা আস্যেছি মিলন আখড়ার দল।।"

সখ্যতার আদান-প্রদানেই হল টুসু জাগরণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বর্তমানে জাগরণ প্রতিপালনের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। তেমন আর উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায় না। কারণ অবশ্যই আছে। আপন আপন সংস্কার-সংস্কৃতি ত্যাগ করে ভিন্ন সংস্কৃতির চটকদারীর ফাঁদে ঢুকে পড়ার প্রবণতা বাড়ছে। নিজের সংস্কৃতিকে তুচ্ছ/তাচ্ছিল্য ভাবতেও বাধছে না। যুবক-



যুবতীদের অনিহা চোখে পড়ার মত। বেশী ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ কোথায় ? চোখে রঙিন চশমা। অনেক জায়গায় দেখা যায় নমঃ নমঃ করে দায়সারা জাগরণ অনেকেই করে থাকেন। দায়ে পড়ে করা।

সামান্য একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে জাগরণের প্রয়োজন ফুরায় নি। সমাজে যে রকম জটিলতা দিন দিন বাড়ছে, আরও বাড়বে বই কমবে বলে মনে হয় না। সমস্যার সমাধানের জন্য অবশ্যই চায় জাগরণ করা। শুধু জাগরণেই চলবে না। সমাজে আনতে হবে নবজাগরণ।

তথ্য সাহায্যকারীঃ-

১। চারিআন মাহাত (ফুসড়াবাদ পাড়া)

২। কর্মবীর মাহাত (জামবাদ, কেন্দা)

গ্রন্থ পঞ্জীঃ- প্রবন্ধ সংগ্রহ – ভাগ-১, অম্লান দত্ত।

কুড়মালি নেগ-নেগাচারে — "জন-জামাই-ভাগিনা"

একটা কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, প্রায়ই শোনা যায়;— "জন-জামাই-ভাগিনা, কেউ নয় আপনা।" এমনি অনেক অনেক কথা বা প্রবাদ বাক্য সমাজে প্রচলিত আছে, যেগুলি আমরা 'ডাক পুরুষের কথা' বলে থাকি। কে কবে কোথায় এর প্রথম প্রচলন করেছিল বা হয়েছিল তার কাল নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কথাগুলি আমাদের বড়ই আপন বলে মনে হয়। মনে দাগও কাটে। প্রবাদগুলি সাধারণভাবে চলতে ফিরতে আমরা ব্যবহার করি। কথাগুলি সাধরাণ মনে হলেও এর প্রভাব কিন্তু অপরিসীম। সমাজে কথাগুলি এতই দৃঢ় মূল যে, এগুলিকে এককথায় স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বলেই মেনে নেওয়া হয়।

"ডাক পুরুষের" এইসব নীতি কথাগুলি সচরাচর সহজভাবে ব্যবহার করা হলেও এখন দেখছি, এর সঠিক তাৎপর্য, গভীরতার প্রকৃত ব্যাখ্যা করি না। ভিতরে ঢোকার প্রবণতা কমে গেছে, উপর উপর ভাসা ভাসা ভাবই আমাদের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়। তলিয়ে দেখার সময় কোথায় ? প্রকৃত মূল্যায়ণ এখন আর হয়ে ওঠে না।নয় কি ?

আমাদের সাধারণ সমাজে দেখা যায়— 'জন-জামাই-ভাগিনা' এরা সবাই অতি আপনজন। আপন জন। চারপাশে এদেরকে নিয়েই তো আমাদের সমাজ। তাহলে ডাক মানুষেরা কেনই বা বললেন;— "জন-জামাই-ভাগিনা, কেউ নয় আপনা" — তাহলে কি তাঁদের প্রচলিত কথাটি সবই মিথ্যা ? ভুল ? নাকি বোঝার ক্ষেত্রে আমাদেরই খামতি থেকে গেছে ? নাকি এর ভিতর কোন গুঢ় রহস্য আছে ?

আমার মন যা বলে, অন্যান্য গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা শুনে যেটুকু জেনেছি, বুঝেছি তা দিয়েই এই নিবন্ধে এই প্রবাদ বাক্যটির আলোচনা করার প্রয়াস করছি।

আজকে আমরা মানুষের যে সভ্য, সু-সভ্য, অতি-সভ্য, জটিল-কুটিল, কঠিন-কঠোর সমাজ দেখছি, একদিনে হঠাৎ করে তা তো গড়ে ওঠে নি। মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়; — প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীতে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণের উন্মেষ থেকে হাজার হাজার বছর ধরে অজীবীয়, আদি জীবীয়, পুরাজীবীয়, পুরাপ্রস্তর, নবপ্রস্তর মানব কুল উন্নত হয়েছে।

মানুষ বন্য, বর্বর, অর্দ্ধ বর্বর, যাযাবর, শিকারী জীবন থেকে অতি ধীরে

ধীরে কৃষি পশুপালন ইত্যাদির দিকে সরে এসে কৃষি নির্ভর হয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। আস্তে আস্তে পরিবার থেকে বসতি, গাঁ গড়ে উঠেছে।একসঙ্গে অনেক পরিবার পাশাপাশি স্থায়ী বসবাসের ফলে সমাজ ও সামাজিকতা তৈরী হয়েছে। একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে কিছু জটিলতাও তৈরী হয়েছে। তা থেকে পরিত্রাণের জন্য যুক্তি পরামর্শ করতে হয়েছে। প্রয়োজন হয়েছে কিছু নিয়ম বাঁধার। মানা-না মানা নিয়েও কিছু বিধি-নিষেধ পালনের প্রয়োজন হয়েছিল।

একদিন মানুষের প্রয়োজন ছিল পেট, পিঠ ও মাথা বাঁচানোর। দিন যত এগিয়েছে সরল সাধারণ জীবনে ততই জটিলতা বেড়েছে। আজও সমস্যা-জটিলতা বেড়েই চলেছে। এর থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। সেই জন্য পালনীয় আইন-কানুনও তৈরী হয়েছে। বিধি নিষেধের মধ্যেও নানান সংযোজন-বিয়োজন ঘটে চলেছে।

কালে কালে মানব সমাজে বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী উপদল তৈরী হয়েছে। এক এক দল বা গোষ্ঠীর মানুষের নিয়ম-কানুনও কিছু কিছু ভিন্নতর হয়েছে। একটু আধটু লড়াই-বিবাদও হয়েছে। আবার প্রয়োজনে সমাজে বিবাহ প্রথা চালু হয়েছে। দলের মধ্যে কিম্বা অপর দল থেকেও ছেলে-মেয়েদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। ফলে দলে দলে কিম্বা অপর দলের সঙ্গে আত্মীয়তা তৈরী হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ নিজের দরকার মত সমাজ, সংসার, সামাজিকতা তৈরী করেছে। নিজেদের প্রয়োজনে ও কল্যাণে নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি চালু করে তা মেনে সভ্য সমাজ গড়ার দিকে ক্রমশ এগিয়েছে। জন্ম সূত্রে, গোষ্ঠী সম্পর্কে, বৈবাহিক সম্পর্কে একের সঙ্গে অন্যের আপনজন ও আত্মীয় তাঁর নানান সম্বন্ধ-স্থাপন হয়েছে। সম্পর্কের নিয়ম মেনে বাবা-মা, ভাই-বোন, কাকা-জ্যেঠা, মামা-মামী, দেওর-ভাজ, শ্বশুর-শাশুড়ি, বহনই, ভৌজি ইত্যাদি সম্বন্ধ তৈরী হয়েছে। কার সঙ্গে কে কেমন ব্যবহার করবে, সমাজে কার কি কি কাজ সে কথাও নির্ধারণ করা হয়েছে।সমাজের নির্দিষ্ট কাজ ঐ ব্যক্তিই করতে পারবে। অন্যে নহে। সমাজের বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এবং প্রখর বুদ্ধিমান মানুষেরাই সমাজকে সুস্থ ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আলাপ-আলোচনা করে নিয়ম-নীতি তৈরী করতেন। সমাজের একান্ত উপকারী ব্যক্তি মারা গেলে তাঁকে শ্রদ্ধা পূজা ভালবাসা জানাতে জানাতে এক সময় তাঁরাই দেবতা হয়ে গেছেন। ভারতীয় সমাজে তৈরী হয়েছিল সারি/সত্য ধরম। যার মূল প্রবক্তা বুঢ়া বাবা শিব। এই বুঢ়া বাবা শিব সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় বন্ধু বলে

আজও দেবতা রূপে পূজা পেয়ে আসছেন। আদিবাসী সমাজ আজও সেই যুগের রীতি-নীতি অধিকাংশ পালন করে আসছেন।

দিন বদলের সাথে সাথে সমাজে ব্যক্তি সম্পত্তি দেখা দিল। ব্যক্তিগত গুণ, কর্তব্য নিষ্ঠা, বুদ্ধিদৃপ্তি, কর্মতৎপরতা, সুযোগ-সুবিধা মতো যে যেমন পারল নিজেদের বিষয় আশয়-সম্পদ কেহ কেহ বাড়িয়ে নিতে পারল। অনেকেই তা পারল না। সমাজে দেখা দিল আর্থিকভাবে সম্পন্ন ও দুর্বল পরিবার। লোকবলও সমান থাকল না। ধান ভানতে শিবের গীত অনেক হল এবার "জন-জামাই-ভাগিনার" কথায় আসা যাক।

জন ঃ দেখা গেল সম্পন্ন পরিবারের কর্তা একা এবং পরিবারের লোকজন দিয়ে বাড়ীর সব কাজ করে উঠতে পারছেন না। তখন দরকার পড়ল অন্য পরিবারের অপর লোকের শ্রমের সাহায্য। যারা অর্থবলে দুর্বল অথবা বাড়ীতে যাদের প্রয়োজনের চাইতে বেশী লোক আছে, সম্পন্ন গৃহকর্তা সেইসব লোকের খোঁজ করলেন। বাড়ীর কাজের সাহায্য করার জন্য। বিনিময়ে তিনি খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থ দিবেন। চুক্তির ভিত্তিতে কাজের লোক বহাল করা হত। বছরের শেষে মাঘ মাসে মাহিনা দেওয়া হত। যে লোকটিকে কাজে বহাল করা হত তাকে বলা হত 'জন' বা 'বাগাল'। কখনো কখনো 'লোক'ও বলা হত।

কাজের লোকটি বাড়ীতে কাজ করতে করতে মেলামেশা করতে করতে সেও ঐ বাড়ীর একান্ত আপনজন হয়ে যেত। বাড়ীর অন্যান্য লোকের সঙ্গে তাকে বাইরের আলাদা লোক বলে ভাবা বা চেনা যেত না। বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হলেও পরের বছরও সে কাজের লোক হিসাবে থেকেই গেছে। এমনি করে একাধিক বছর একই পরিবারে সে কাজ করে চলে। এমনও দেখা গেছে বাচ্চা বয়স থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত একনাগাড়ে গলাঘরে বাগাল বা জন হিসাবে খেটে জীবন শেষ করে দিয়েছে। কাজের বিনিময়ে 'জন' বা 'বাগাল' মাঘ মাসে গলার কাছ থেকে 'মাহিনা' বা মূল্য নেয়। আমাদের সাধারণ ধারণা যেহেতু কাজের বিনিময়ে জন মাহিনা বা মূল্য নেয়, সেই জন্য সে পর; আপন নয়। সে সব সময় আপনার মাহিনা পুরোপুরি বুঝে নেয়। সাধারণভাবে কথাটি ঠিক, কাজের জন্য যে দাম নিবে সে আপনজন হবে কি করে ? সে কখনোই আপন হতে পারে না। কাজে, মিলামিশায় আপনজন মনে হলেও সে তো পর বইত নয়। আমরা এইভাবেই দেখি এবং বুঝিও। এইই আমাদের ধারণা। সেই কারণেই যে কোন ব্যক্তি যে কোন লোককে বর্তমানে মাহিনা দিয়ে জন/বাগাল রাখতে পারেন। তার বাছ-বিচার খুব একটা করা হয় না।

মোটামুটি ভাবে বুঝে দেখা হয়, যে লোকটিকে রাখব, তার শরীর স্বাস্থ্য কেমন ? কাজের মানসিকতা কেমন আছে ? বাড়ীর কোন জিনিস না বলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে কি নেই। অর্ধেক দিনে পালাবে না তো ? নেশা-ভাঙ পুরামাত্রায় কি খায়? স্বভাব-চরিত্র কেমন ? যদি দেখা যায় চলন সই আছে; দরে-দামে পটলে তাকে কাজে বহাল করে দেওয়া হয়ে থাকে।

আগে কিন্তু এই নিয়ম ছিল না। কোন লোককে কাজে নিয়োগ করার আগে জেনে নেওয়া হত তার সঙ্গে গোত্রের মিল আছে কিনা। যদি মিলে যায় তা হলে কিন্তু রাখা যাবে না। কবে থেকে এই চল উঠে গেছে তা কিন্তু বলতে পারছি না। মোট কথা গলা ও বাগাল কখনোই এক গোত্রের হওয়া চলবে না। সব সময় ভিন্ন গোত্রের হতে হবে (ভিন্ন ঝাড় বা বংশের)।

আপন গোত্রের 'জন' না রাখার সামাজিক গুঢ় কারণ নিহিত আছে। সমাজ সচেতন বুঢ়া-পুরখারা গভীরভাবে এই নিহিত কারণটি বহুদিন আগেই অনুধাবন করেছিলেন। যদি কোন কারণে কোনরূপ অঘটন ঘটেই থাকে,তার জন্য তাঁকে যেন মারাত্মক দোষে পড়তে না হয়। সমাজের সকলকেই সামাজিক বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে পালন করতে হত। আদিবাসী মানুষ অবহেলে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন কিন্তু বিধি ভাঙবেন না। এইটাই নিয়ম।

রূপক তুলেও লিখিত উদাহরণটি স্মরণ করা যেতে পারে। দেখা যায়, বালি-সুগ্রীবের লড়াইয়ে শেষবার সুগ্রীব লড়াই করতে আসে তখন সে গলায় 'লিয়ায়া ফুলের' মালার সঙ্গে ''ফড়িং''-এর মালা গলায় পরেছিল। ফড়িং (টিড়োর) যেহেতু বালির নিজের গোত্রের (বংশের) প্রতীক সেইজন্যই সে বার বার মার খেয়েও সুগ্রীবকে আঘাত করেনি। ভয়, তাকে আঘাত করার সময় যদি ফড়িং মরে যায় ? সে প্রাণ দিল কিন্তু সামাজিক বিধি ভাঙল না।

বাগাল/জন গলাঘরে আপনজন হয়ে তার বাড়িতেই বসবাস করে। খাওয়া-দাওয়া শোয়া গলাঘরেই হয়। দিন-রাত্রি অবাধ তার যাতায়াত। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে মেলামেশায় তার কোনরূপ বাধা নেই। বাড়ির বউ-বিটিদের তো কাজের লোকটিই বেশী দরকার। যেকোন কাজে তাকে লাগানো যায়। বাগাল/জন নির্বিবাদে বউ-বিটির কথা শোনে। অনেক

সময় মান-অভিমানে বাগাল/জনকে মনের কথা খুলে বলে। ফলে অন্তরঙ্গতা বাড়তে পারেই। প্রচলিত দাঁড় গীতে শোনা যায়; —

(১) "বাগাল্যারে বাগাল্যা,
তর্ গট কত ধূরে রে ?
যা ন নুনী,—
বল্যে দিবি ঘরে।
গাই গট আমার নদী ধারে।"

(২) "ই পারে গাই চরে —
উ পারে হাঁক পাড়ে।
বিদুমুখী;—
চুমা দেনঅ আমারে গো।"

(৩) "হল্যদ বরণ ধতিয়া,
কমরে গুঁজা বাঁশিয়া।
মনে পড়ে ধনি;—
পুরানঅ পিরিতিয়া।"

উপরোক্ত গীতগুলির আর নিশ্চয় বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়বে না। গীতগুলিতে কি ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা সহজেই বোঝা যায়। সমাজে ভুরি ভুরি এমন উদাহরণ আছে বাড়ীর সোমত্ত্ব বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাগাল পালিয়েছে। আরও অনেক অঘটন/দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাধ্য হয়ে কুল/মান রক্ষার খাতিরে বাগাল/জনের সঙ্গে মেয়ের সামাজিক ভাবে বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছে। সমাজে তো নিয়ম-বিধি আছে স-গোত্রে বিবাহ চলবে না। সেইজন্য সামাজিক অঘটন এড়াতেই বুঢ়ারা আগে নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন। আগাম সাবধান হয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত রূপে বলতে পারি, কুড়মি গোষ্ঠীর মানুষ বাঁদনা পরবে গরোয়া গুসাঞ-এর পূজা ও গাইচুমানের কাজ যে ভাবে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন এমন কঠোর ভাবে নিয়ম নিষ্ঠা অন্যান্য পূজা উৎসবে পালন করেন না। প্রচলিত গীত-বাঁদনা গীত/অহিরা গীত ও কাহিনীতে বাগাল ও গুলিনের এক অপূর্ব আখ্যানের বর্ণনা শুনতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে আখ্যানটি বলার চেষ্টা করছি।

এক সম্পন্ন গৃহস্থের গরুর বাড় এমন হল যে গোয়ালে তার গরু আর ধরে না/আঁটে না। গৃহকর্তা পড়ে গেল মহা বিপদে। এত গরু সে রাখবে কোথায় ? বাড়ির মালিক অনেক ভাবনা চিন্তা করেও কোন সঠিক কুল-কিনারা

খুঁজে পেল না। অনন্যপায় হয়ে শেষমেশ বাগালকে ডেকে সলহা করল। গলা বাগালকে তার সমস্যার কথা জানালে বাগাল বলল;— "গহাল বড়অ করঅ।" গলা জানাল এমন কথা সে হাজার বার ভেবেছে। এখন গহাল বড়অ করতে হলে কাঠ চায়, পুঁয়ালচায়, বহুৎ লোকজনেরও দরকার।ই-বছর করা অসম্ভব।

তা হলে উপায় ? ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। শেষ মেশ গলা-বাগালে রফা হল, বাগাল গটা বছর বন-পাহাড়েই গরু রাখবে। ঘর আনবে না। বছর শেষে বাঁদনা পরবের এক'দু দিন আগে বাগাল গরু নিয়ে গাঁয়ে আসবে। ততদিনে গহাল বড় করে তৈরী হয়ে যাবে।

যেমন কথা তেমন কাজ। পরের দিন থেকেই গরু পাল নিয়ে বাগাল বনের ভিতর চলে গেল। ঠিক বাঁদনা পরবের আগে গরুর পাল নিয়ে ঘরে এল। ততদিনে গরুর সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে গেছে।

গাঁয়ে বাঁদনা পরব আরম্ভ হল। অমাবস্যার রাতে গটা রাত গাই জাগা হল। পরের দিন গরয়া। ধুমধাম করে গরয়া পূজাও হল। সাঁঝের বেলা গুলিন লৌতন শাড়ি-সেমিজ পরে নতুন সূপে ধান দূর্বা, ধূপ, দীপ নিয়ে সিরিগাই বলদ চুমাতে গহালের দুয়ারে এসে দাঁড়াল। কিন্তু গুলিন পড়ল ফাঁপরে। গঙ্গা-গহাল ভরা গরু। তার মধ্যে কোথায় সিরিগাই আর কোথায় বা সিরিবলদ ? কোনটা খুঁজেই পেল না গুলিন। সে ত চিনে না। অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল তার। মনে মনে ভয় হল। বাঁদনার দিনে সিরিগাই না চুমালে ভগবতী ঘরে থাকবে ? ভগবতী না থাকলে সংসারের হাল কি হবে ? তাহলে এখন উপায় ? গুলিনীর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। বাগাল/অহিরাই তো চিনিয়ে দিতে পারে। গরু-বাছুর সবই তো ওরই হাতে। ওই তো অনায়াসে চিনিয়ে দিতে পারে কোনটা সিরিগাই আর কোনটা সিরিবলদ। বাগালের ডাক পড়ল। বাগাল এসে গহালের দুয়ারে দাঁড়াল। বাগাল এসেই বুঝে নিল কিসের জন্যে তাকে ডাকা হয়েছে। গুলিনের অবস্থা দেখে বাগাল মুখ টিপে কপট হাসি হাসতে লাগল।

সৌভাগ্যবতী গুলিন মুশকিল আসান বাগালকে দেখে আনন্দে মুখে পানখিলি গুঁজে বলল; —

"অহি রে—
দে ন রে দেন অহিরা সিরিগাই চিনহাএ।
কাকে ত দিব দুব ধানঅ রে ?"

অহিরা/বাগাল আদৌ বোকা নয়, সংসার বুদ্ধিতে বেশ পাকা। গুলিনের

মামুলি একটা অনুরোধে সে ভুলবে এমন বোকা সে নয়। এই বতরে গুলিনের কাছে একটা মনের মতন জিনিস আদায় করে নিতে পারা যাবে। কৌতুক করে সে বলল;—

"নেহিঁ যে দেবঁ গুলিন সিরিগাই চিনহাঞগো।
কাকে ত দিবে দুব-ধান ?"

বাঁদনার দিনে সিরিগাই চুমাতে পারব না, এমন অভাগিনী সে। বাগাল/অহিরা ছাড়া উপায়ই বা কি ? বাগালকে গুলিন ভুলাতে চাইল। এই বলে; —

"অহিরে—
শুনঅ রে শুনঅ অহিরা আমারি বচনঅ রে;
শুনি লিহো কানঅ লাগাঞ
তকে যে দিব অহিরা দুইঅ পায়ে রুচুমুচু জুতা গো;
দেনঅ অহিরা সিরিগাই চিনহাঞ।
কাকে ত দিব দুব-ধানঅ রে ?"

বাগাল এত সহজে ভুলল না। এই সময়ে সে তার দর দস্তুর মত বুঝে গেছে। সে গুলিনের কাছে আরও ভাল জিনিস পাওয়ার মৌকা ছাড়ে না। গুলিনকে বলে; —

"শুনঅ গো শুনঅ গুলিন, আমারি বচন;
শুনি লিহো কান লাগাঞ।
নেহিঁ যে লিব গুলিন, রুচুমুচু জুতা গো;
নেহি দেবোঁ সিরিগাই চিনহাঞ।।
কাকে ত দিবে দুব-ধান ?"

গুলিন এক এক করে বাগাল/অহিরাকে জামা-ধুতি, পাগড়ি, রূপায় বাঁধা বাঁশী, সোনার মাদুলী, এমন কি সে নিজের গলার সোনার হার খুলে দিতে চাইল। তবুও অহিরা ভুলে না। সিরিগাই চিনহাঞ দেয় না। সে দাঁড়িয়ে গুলিনের অবস্থা দেখে আরো মজা পেয়ে মিটি মিটি হাসতে থাকে।

গুলিনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ার দাখিল। লগন বয়ে যায়। বাঁদনা পরবের দিনে ধান-দূর্বা দিয়ে সিরিগাই চুমাতে পারছে না; এত বড় অভাগিনী সে। ঘরের বাগাল। এত কিছু দিতে চাইছি, তবুও কাজের বেলা ঘরের নয় ? তবে কি ভগবতীর অভিমান হয়েছে ? আমার কোন দোষ হয়েছে? নাকি আমার হাতের ধান-দূর্বা নিতে চায় না, তা না হলে বাগালর অহিরারই বা এমন মতি হয় কি করে ? গুলিনের চোখে জল ভরে এল। তার দুই গাল

বেয়ে অঝোরে লর ঝরে পড়তে লাগল। আর ত তাঁর দিবার মতন জিনিস তাঁর হাতে নাই ? কি দিয়ে সে বাগালের মন জয় করবে ? গলার সোনার হার দিতে চাইছি তাতেও তার মন ভরছে না। শেষ সম্বল বলতে আছে... মনে মনে ভেবে, তার অন্তরের হাহাকার মিশিয়ে গুলিন সব চাইতে বড় ধন দিবার কথা বাগালকে জানাল; —

"অহিরে, —
শুনঅ শুনঅ অহিরা, আমারি বচন;
শুনঅ অহিরা কানঅ লাগাঞ।
তকে যে দিব অহিরা কলেকেরি বিটি রে;—
দেন অহিরা, সিরিগাই চিনহাঞ।।
কাকে ত দিব দুব-ধান ?"

গুলিন জানে একি গোত্রের ছেলে-মেয়ের বিবাহ হয় না। হতে পারে না। যদি অহিরা/বাগাল নিজ গোত্রের হত তা হলে নিশ্চয় করে বলা যায়, এমন প্রতিশ্রুতির কথা গুলিন কোন প্রকারেই উচ্চারণ করত না। 'গঙ্গা-গহালে' দাঁড়িয়ে চরম এই মুহূর্তে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাগালকে কেবলমাত্র ভোলানোর জন্য এমন কথা মনে আনারও সাহস পেত না। দেখা যায়, বাঁদনা পরবে 'বুঢ়িবাঁদনার' দিন বাগালকে গুলিন দস্তুর মত মন ভরে পেট পুরে খাইয়ে গহাল দুয়ারে দাঁড় করিয়ে মাথায় সরিষার তেল ঢেলে দেয়। সেই তেল মাথা গড়িয়ে দুয়ারে পড়ে।

আরো একটি নেগাচার দেখা যায়, যেদিন বাগাল/জনকে মাহিনা দেওয়া হয় সেই দিন বাগাল মাহিনা বুঝে নেওয়ার পর ঐ মাহিনার ধান থেকে আঁজলা ভরে ধান নিয়ে গলার যাঁতা ঘরের মেঝেয় রেখে ঘর ভরে দেয়। ঐ দিন গলা ঘর থেকে আর কোন জিনিস কাউকে দিবে না।

দেখেছি, কন্যার বিবাহের পর বিদায় মুহূর্তে কন্যা আঁজলা ভরে চাল নিয়ে বাপ-মায়ের ঘর ভরে দিয়ে যায়। ঐ ঘরভরা অনুষ্ঠানটি এতই মর্মস্পর্শী যে তা সহ্য করা যায় না। সামাজিক নিয়ম অনুসারেই কন্যার সিঁথিতে সিঁদুর পড়ার পরপরই কন্যা পর গোত্রের হয়ে যায়। অপর বা পর গোত্র হয়ে যাওয়ার জন্যই বাপ-মায়ের এত দিনের ঋণ শোধ দিয়ে দিতে হয়। ঋণ শোধ করে যেতে হয়। যদি আপন গোত্রেই থাকত তা হলে কি এমনটি করতে হত ?

বিটি বিদায়ের সময় ঘর ভরছে, বাগাল মাহিনা নেওয়ার পর ঘর ভরছে এর ভিতর নিশ্চয় কোন রহস্য আছে ? দু'টি ঘটনার মধ্যে কি কোথাও কোন

মিল কিম্বা সামঞ্জস্য আছে ? নাকি আলাদা কোন তাৎপর্য ? অথবা পর গোত্রেরই রহস্য ?

জামাই ঃ কন্যার স্বামীই জামাই। আত্মীয়ের মধ্যে জামাইয়ের মত আপনার জন আর কে আছে ? কিন্তু ডাক পুরুষের কথা অনুসারে জামাইও পর। আপনার জন বা আপন জন নয়। জামাইও তার কাজের বিনিময়ে পাওনা বুঝে নেয়। পাওনা ছাড়া কাজ করে না। যেহেতু কাজের বিনিময়ে পাওনা নেয়, সে জন্য জামাইও পর। সাধারণভাবে এমন কথা আমরা জানি ও বুঝি।

এখন দেখা যাক, জামাই সমাজে কি কি কাজ করে ? শ্বশুরের ছেলে/মেয়ে সকলের বিবাহ কার্য্যে জামাই সঞ্চালক। দেখা যায় শালা/শালীর বিবাহে সে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পাত্র/পাত্রী নির্বাচন থেকে সকল কাজে তার পরামর্শ একান্তভাবেই জরুরী। পুত্র/কন্যার মতামত জানার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকায় মুখ্য। কেননা তার সঙ্গেই মন খুলে অকপটে মনের গোপন বাসনার কথাও বহনইকে জানাতে পারে। শালা-শালী মোটামুটি নিমরাজী হলেও সম্বন্ধের ব্যাপারে আগুয়ানো চলে, অন্যথায় অতি অবশ্যই থেমে যেতে হয়। দেখা-শোনা, দেনা-পাওনার লেনা-দেনা, কাজ-ভজ সব ব্যাপারেই জামাইয়ের দরকার পড়ে।

শালার বিবাহ হলে জামাই বরের বাগাল। যেদিন থেকে বর তেল হলুদ মাখবে তখন থেকেই অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বরের ছায়া সঙ্গী। দেখা যায়, হবু বর বিবাহে মত দিয়েও বিবাহের পূর্বে ঘর ছেড়ে পালায়। এই রকম নানা অঘটন এড়ানোর জন্যই সামাজিক এই ব্যবস্থা।

বিবাহের দিন সন্ধ্যায় বর ছামড়াতলে কামা-সিনান করে মামাঘরের দেওয়া বরসাজ পরে, মাথায় টোপর চড়িয়ে বিবাহ করতে বার হবে সেই সময় জামাই তাকে বংশ পিড়িতে বসার কথা স্মরণ করাবে। আদি ধরমের কথা শোনাবে। এই চল যদিও উঠে গেছে তবুও আমবিহা উঠে যায় নি। বহনই বরের সঙ্গে আমগাছের বিবাহের সমূহ আচার পরিচালনা করে এবং সর্বশেষে আমগাছের পাতা নিয়ে পাতার ভিতর চাল, দূর্বাঘাস ও হলুদ গেঁঠা রেখে আম বিহার সূতা জড়িয়ে পুটলি করে বরের কব্জিতে বেঁধে দেয়। এই অনুষ্ঠানকে কাঁখনা বাঁধা বলে। এই কাঁখনা বাঁধার কাজটি একমাত্র জামাই করতে পারে অন্য কেহ নহে। কাঁখনা না বেঁধে আজও কোন বর বিবাহ করতে গেছে এমন কথা শুনি নাই। জানিও নাই।

বিবাহের অনুষ্ঠানে তো বটেই তার পরেও নেগাচারে জামাইকে থাকতে হয়। ঘুরফের, জিরাগমন, বাঁদনাবাসী কোথায় জামাই নেই ? বাঁধা ধরা কোন

নিয়ম নেই কিন্তু প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান শেষে যার যেমন সামর্থ জামাইয়ের মান্যমান বাবদ পাওনা গন্ডা দিয়ে বিদায় করতে হয়।

বাঁদনা পরবে নূতন জামাইকে এনে শাশুড়িরা "জামাই বাঁধার" অনুষ্ঠান করেন। সেখানেও জামাইয়ের পাওনা আছে। আদিবাসী সমাজে সামাজিক বিধানেই আছে একই গোত্রে বিবাহ হতে পারে না। যখনই আত্মীয়তা পাতানো হয় তখনই প্রাথমিক ভাবেই জেনে নেওয়া হয়; পাত্র/পাত্রী একই গোত্রের হয়ে যাচ্ছে না তো ? যদিও সব দিক ঠিক থাকে আত্মীয়তা, বংশমর্যাদা, অবস্থা, স্বাস্থ্য, ব্যবহার, সামাজিকতা, পড়া-শোনা, বয়স, চরিত্র, গায়ের রঙ, উচ্চতা, গড়ন, দেনা-পাওনা, যোগযোগ ব্যবস্থা সব বিষয়ে যেমনটি চাইছি, তেমনটি মিলে গেলেও গোত্রে/বংশে মিলে গেলেই সম্বন্ধ ভেঙে যাবে। গোত্রের গরমিল চাইই। কন্যার বিবাহের পূর্বেই দেখে নেওয়া হয়েছে যাকে জামাই করা হয়েছে তার গোত্র আলাদা। অতএব গোত্র হিসাবে জামাই সব সময় পর হবে, আপন কোন প্রকারেই হবে না; এ আর নূতন কথা কি ?

ভাগিনা ঃ জন ও জামাইয়ের কথা কিছু বলা হল; এবার আসা যাক ভাগিনার কথায়। বোন বা দিদির ছেলেরা ভাগিনা আর মেয়ে হলে ভাগ্নি।

এখন দেখা যাক, সমাজে ভাগিনা হিসাবে তার কাজ কি ? ভাগিনার প্রথম কাজ হল তার পরিবার ও গোষ্ঠীর সঙ্গে মামাঘরের পরিবার ও গোষ্ঠীর মেল বন্ধনের ধারা রক্ষা করা। এমন চল প্রায় উঠে গেছে, বললে বাড়তি বলে মনে হবে কিন্তু এখনও সমাজে জামাই যেমন তাঁর শ্বশুর বাড়ীর বিবাহকার্য পরিচালনা করেন ভাগিনারা তেমনিভাবে মামার সব পারলৌকিক কাজ পরিচালনা করতেন। ধার করে অন্য সমাজ থেকে ব্রাহ্মণ ডেকে পুরোহিতের কাজ করাতে হত না। অন্যের পায়ে ধরে পায়ের ধূলা খেয়ে বাপ-মায়ের ঋণ শোধ করতে হত না। ভাগিনা পুরো পুরোহিতের কাজ সেরে দিতে পারতেন। অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হয়েছি প্রায় ৯০/১০০ বৎস পূর্ব পর্যন্ত সমাজে এই নীতির চল টিঁকে ছিল। তারপর থেকেই কুড়মি সমাজে ও অন্যান্য কিছু কিছু আদিবাসী সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিত এসেছে। সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদের ফাঁদে পড়ে আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা, আদিবাসী ধর্ম সারি/সত্য ত্যাগ করে বর্ণ হিন্দু হয়ে জগা খিঁচুড়ি হয়ে গেছে। না ঘরকা, না ঘাটকা, এই অবস্থা নয় কি ?

কথায় কথায় শোনা যায় - মামা-ভাগিনা মর্তের কুটুম। মামা ভাগিনার সম্পর্ক কতদূর ? ন, এক হাঁটু পর্যন্ত। অর্থাৎ মামা তার বাপ-মায়ের শ্রদ্ধাক্রিয়া করার সময় তুলসী পিঁড়ার সামনে, অত কুটুম-বাটুমের মাঝে হাঁটু গেড়ে বসবে তখন ভাগিনা তার পাওনার কথা বলবে। মামা অঙ্গীকার করলে ভাগিনা

শ্রদ্ধাক্রিয়ার কাজ করবেন। জানা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতীয় মানুষ মৃতদেহ কবর দিত। অনেক কাল পরে মূল ভারতীয় গোষ্ঠীর আদিবাসী মানুষ হিন্দুদের সম্পর্কে এসে নিজেদের আদিবাসী ধর্ম সারি/সারনা ছেড়ে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মৃতদেহ কবর দেওয়ার পরিবর্তে দাহ প্রথা চালু করে। আদিবাসী কুড়মি সমাজেও এই প্রথা চালু হয়।

কুড়মি সমাজের কেউ মারা গেলে তৎক্ষণাৎ মৃত ব্যক্তির ছেলেরা তার ভাগিনাকে খবর দিয়ে ডেকে পাঠাত। ভাগিনা কাল বিলম্ব না করে ঘরের কাজ ফেলে দৌড়ে মামাবাড়ী চলে আসতেন।

সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে মৃতদেহ কবর দেওয়া হত। আত্মীয় স্বজন, কুটুম্ব, ভাই-ভায়াদ, পাড়া-পড়শি, ফুল-পরান-মিতান সকলে সমবেত হয়ে মৃতদেহ নদীর ঘাটে কিম্বা শ্মশানে নিয়ে যেত। ভাগিনাকে সাক্ষী রেখে তার অনুমতি নিয়ে কবর দেওয়া হত। মৃতদেহের উপর ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হত। কিছু খাদ্যদ্রব্য ও মৃতব্যক্তির নিত্য ব্যবহার্য জিনিস-পত্রও দেওয়া হত। এক এক করে কবরে সকলে মাটি দিত। মাটি দেওয়া হয়ে গেলে কবরের উপর কোন গাছের চারা, নিদান পক্ষে কোন গাছের ডাল ভেঙে এনে ভাগিনা গুঁজে দিত।

বেনা গাছ গাড়া, তেলখোল, তিতাভাত, কাঁধকাঠ্যা, ঘাটে ওঠা, আড়াইপাক ঘুরা, শ্রদ্ধা-ক্রিয়ার কাজ ভাগিনার পরিচালনায় হত, ঐ কাজ করার জন্য ভাগিনাকে জমি, গরু, অর্থ ও কাপড় দান করা হত। গাঁয়ে খোঁজ করলে এখনও জানতে পারা যাবে ওমুক জমিটি ভাগিনা দানের জমি।

এই পারলৌকিক কাজ করার জন্যই ভাগিনাকে গুরু মানা হয়। ভাগিনা/ভাগ্নি বয়সে মামা-মামীর চাইতে ছোট হলেও আজও আদিবাসী সমাজের কেউ কখনো ভুল করেও ভাগনা-ভাগ্নির প্রণাম নেয় না। অবশ্য গুরু বলে কেউ প্রণামও করে না। অনেকে বলে থাকেন কৃষ্ণ ভাগিনা, কংস মামা। কৃষ্ণ ভাগবান, সেইজন্য বড়। বড় ছোটকে কি করে প্রণাম করবে ? ঐ পৌরাণিক গল্প আদিবাসী সমাজে আসতে পারে না। কৃষ্ণ-কংস — সম্পর্ক থেকে এই প্রথা চালু হলে পূর্ণ হিন্দু সমাজেও এই প্রথার চল থাকত। ঐ সমাজে দেখেছি, ভাগনা-ভাগ্নি দিব্বি মামা-মামীকে প্রণাম করে তাদের আশীর্বাদ নিতে। তাহলে দেখা যায়, কংস-কৃষ্ণের সম্পর্কের কথা এখানে খাটে না। আর ভাগিনা যদি পুরোহিতের কাজ না করে থাকেন তাহলে গুরু হতে যাবেন কোন সুখের আশায়।

আমার স্বামী আমার বাপের বাড়ীর বিবাহের কাজে প্রধান হবে এবং

আমার ছেলে মামাদের পুরোহিত হয়ে শ্রদ্ধা-ক্রিয়ার কাজ করবে। বাপের বাড়ীর লোক তার স্বামী ও ছেলেকে মান্য করবে তাতে স্ত্রী ও মা হিসাবে আত্মতৃপ্তিতে গর্ববোধ করবে। আত্মীয়তার টান দৃঢ় ও গাঢ় হবেই। আদান প্রদানে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। এই কারণেই আসা-যাওয়া, দিয়া-থুয়া, দেখা-শোনা, ভাব-ভালবাসা বাড়বে বই কমবে না কখনোই, এমন কথা জোর দিয়েই বলা যায়। সামান্যতম ভাবে ভাবলেই সহজে বোঝা যায় আমি-আপনি সমাজের সকলেই কেউ কারো জামাই, কারো ভাগিনা। লত ছাড়া না হলে প্রত্যেকেরই এই সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। সেই সূত্রে সবাই কখনো না কখনো কাঁকনলায়া (কাঁখনা বাঁধার অধিকারী) অথবা পুরোহিত এবং ঐ সকল কাজের নেগ-নেগাচার আমাকেও জানতে হবে। না জানলে কাজ পার করা মুশকিল হবে। আর সমাজের সামাজিক কাজ যদি সবাই জানে; তাহলে ভাল হবে না মন্দ হবে ? অতি মূর্খ লোকেও এই সহজ প্রশ্নের উত্তর অবহেলায় দিতে পারবে। এই সাত-পাঁচ ভেবে, আমার বাবা-মায়ের শ্রদ্ধা-ক্রিয়া আমার ভাগিনার পৌরহিত্যে সমাধা করেছি। বাড়তি ব্রাহ্মণ কিম্বা বৈষ্ণবের প্রয়োজন পড়ে নাই। সেই কারণে অযথা তাদের ডাকারও দরকার হয় নাই। এ কাজের পাওনাটুকু আমার বোনের বাড়ীতেই গেছে।

আমার বোন/দিদির সন্তান আমার ভাগিনা। বিবাহের কারণে আমার দিদি/বোন তার স্বামীর গোত্র পেয়েছে। ভাগিনাও তার বাবা-মায়ের গোত্র নিশ্চয় পাবে। তাহলে আমার সঙ্গে আমার ভাগিনার গোত্র কোন সময়ই এক হবে না। আলাদা হবেই। সেই হিসাবে সে আপন জন হবে না। তাহলে কি বলতেই হয়, — "জন-জামাই ভাগিনা কেউ নহে আপনা।"

তথ্য সাহায্যকারী গ্রন্থঃ-

বাঁদনা বর্দা বৃত্তান্ত — শ্রী বিনয় কুমার মাহাতা।

তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেঃ- চারিআন মাহাত, তরণীতারণ বানুহড়, অজিত পরামাণিক, শান্তিরাম মাহাত ও কর্মবীর মাহাত।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

ভিনসরলে নিশিরাত



সময় ও কালের ভাগ ঃ

সৌরমণ্ডলের সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহগুলির মধ্যে শক্তি বিনিময়ের যে নীতি-নিয়ম কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রিক নেগ-নেগাচার বা রীতি-নিয়ম তারই অনুরূপ।

নেগাচার কথাটি ভাঙলে আমরা পাই, নেগা + আচার = নেগাচার। অথবা নেগ + আচার = নেগাচার। নেগা অর্থে বাম বা দূর্বল ও আচার অর্থে আচরণ। বলা যায়, দূর্বলকে সঙ্গে নিয়ে চলা। আমার যে কোন ঘোরার কাজে ডান দিক থেকে বাম দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরা। নেগ-বিধি, নীতি-বিধান বা নিয়ম, নেগা— বাম, আচার— আচরণ এই সবগুলি পাই। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি শক্তিকে ভাগ করা যায় না। প্রকৃতি আপন নীতি-নিয়মে, আপন খেয়ালে আবহমান কাল ধরে সদা বহমান আছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে আপন সুবিধার কারণে প্রকৃতি শক্তির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে ঘটে চলা ঘটনা প্রবাহ যেমন সময় কালকে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বৎসর

হিসাবে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। অপর দিকে মানুষ নিজের নিজের মতো করে তিথি, বার, পক্ষ, মাস কালের নামকরণ করে নিয়েছে।

কুড়মালি নেগ-নীতি নেগাচারের প্রবক্তা মহান পূর্বপুরুষগণও তাঁদের উত্তরসূরীদের কল্যাণে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রবাহকে ভাগ ও নামকরণ করে দিয়ে গেছেন। এক দিনকে যেমন; — বিহান, বেসিয়াম, দুপহর, আড়বেলি; এবং রাতকে অহরাত, পহরাত, নিশিরাত ও ভিনসর এই চার-চার মোট আট প্রহরে ভাগ করা হয়েছে। তেমনি এক এক দিনের নাম, — (১) বেরাবার (Sun), (২) ইঁদঅবার (Mon), (৩) খরঅবার (Tue), (৪) হবার (Wed), (৫) ডিনিবার (Thu), (৬) ভুড়কাবার (Fri), (৭) ভাঙাবার (Sat)।

মাসের নাম ঃ (১) মাঘ মাস (২) মধু মাস (৩) চৈত মাস (৪) নিরন মাস (৫) ধরন মাস (৬) বিহন মাস (৭) রপা মাস (৮) ভাদর মাস (৯) টান মাস (১০) বাঁদনা বা সহরই মাস (১১) অঘন মাস (১২) পুস মাস।

কালের নাম ঃ (১) জাড়, (২) মধু, (৩) নিরন, (৪) বেরসা, (৫) হেমাল, (৬) আমল।

ভিনসর থেকে নিশিরাত আসতে গেলে দিনের চার পহর ও রাতের চার পহর অর্থাৎ একটা পুরোদিন আট পহর হয়ে যায়। কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচারে এক একটি পহরে কি কি বলা আছে, আসা যাক সেই কথায়।

(ক) ভিনসর (ভোর) ঃ

আগেই বলা হয়েছে, দিন ও রাত্রি মিলে আট পহরে একটা সম্পূর্ণ দিন হয়ে থাকে। কৃষিকেন্দ্রিক কৃষকের দিনের জীবন শুরু হয় ভিনসর থেকে। ভিনসর অর্থাৎ রাত্রির শেষ প্রহর থেকে। ভোর রাত্রি থেকে। বছরের দিন ও রাত্রির বাড়া-কমা আছে। স্থায়িত্বের মান সবসময় ঘড়ির কাঁটার হিসাব মত এক সময়ে হয় না। তবে শেষ রাত্রির প্রহর ধরে সাধারণতঃ হিসাব করা হয়ে থাকে। কিছু এদিক ওদিক হতেই পারে। যার যেমন সুযোগ সুবিধা সেই মত চললেই হয়ে যায়। যাই কিছু নিয়ম-নীতি থাক না কেন সব কিছুই কিন্তু জীবনের জন্যে। কঠোর নিয়ম নীতির জন্য জীবন নয়, এটা সব সময়ের জন্য মনে রাখতে হবে। আরও একটা কথা আছে শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়। এক দিনে হবে না, অভ্যাস করতে হবে। এক দিনে জোর করলে হবে না। বিপরীত ফল ঘটবে। সচেতনে অবশ্যই থাকতে হবে।

রাত্রির শেষ পহরে সাধারণতঃ ভিনসরে অর্থাৎ ভোর সাড়ে তিন বা চারটার মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের ঘুম ভাঙবে। এটা প্রকৃতির নিয়ম। এই সময় অনেক রকম পাখী জেগে ওঠে। পাখী বিভিন্ন সুর ও আওয়াজ করে ডাক দেয়।

বিশেষ করে মৌরগ জোরে আওয়াজ করে ডাকে। প্রত্যেক কৃষি পরিবারের গৃহকর্তাকে ঐ সময় বিছানা ছেড়ে ঘুম থেকে উঠতে হয়। অলস করে না উঠা, সেটা আলাদা ব্যাপার। কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার অনুসারে যে যে নেগ-নীতি-নেগাচার গৃহকর্তাকে পালন করতে হয়, সেগুলি হল —

(১) বিছানা ছেড়ে ঘুম থেকে উঠা;
(২) বসমতা মাঞকে গড় করা;
(৩) গাই-গরুকে কিছু খাবার দেওয়া;
(৪) মুখে-হাতে জল নিয়ে সাধ্যমত যোগ-সাধনা করা;
(৫) প্রয়াত পূর্বপুরুষদের স্মরণ-মনন করা;
(৬) বাড়ীর অন্যান্যদের ঘুম থেকে উঠার জন্য ডাক দেওয়া;
(৭) সারা দিনের কাজের মনে মনে ছক তৈরী করা।

গৃহকর্ত্রীর পালনীয় নেগ-নীতি-নেগাচার ঃ

(১) মুখে হাতে জল নিয়ে মাড়ুলি দেওয়ার জন্য জল আনা।
(২) মাড়ুলি দেওয়া; —
  (ক) তুলসী থানে;
  (খ) গোয়াল দুয়ারে;
  (গ) আঁখ দুয়ারে;
  (ঘ) প্রতিটি ঘরের দুয়ারে;
  (ঙ) ধান থাকলে খামারে
(৩) উনানে ছঁচ দেওয়া;
(৪) ঘর-উঠানে ছড়া-ঝাঁট দেওয়া।

পরিবারের অন্যান্যদের পালনীয় নেগ-নীতি-নেগাচার ঃ

(১) সূর্য উঠার আগে বিছানা ছেড়ে ঘুম থেকে উঠা;
(২) আগের দিনের নির্ধারিত কাজ স্মরণ করা;
(৩) পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ করে প্রার্থনা করা;
(৪) নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালন করা।

কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচারে তেমন নির্ধারিত কোন মন্ত্র নেই। মনের তল থেকে উঠে আসা কথা মনে মনে বললেই হল।

কুড়মালি নেগাচারে সব চাইতে বড় দেবতা বিশ্বপিতা মহারাই সূর্যদেব। সেই কারণে মাড়ুলি দিয়ে তাঁর প্রতিকৃতি এঁকে তাঁকে আহবান জানানো হয়।

মাডুলি ও সূর্যদেবের ছটা তৈরী করার সময় ডান দিক থেকে বাম দিকে হাত ঘুরিয়ে মাডুলি এবং হাতে জল নিয়ে ঘুরিয়ে জল ছিঁটিয়ে ছটা তৈরী করাই প্রকৃত নেগ।

বিহানের পূর্বে অর্থাৎ সূর্য উঠার আগেই শয্যা ত্যাগ করে ঘুম থেকে উঠা এবং নিজ নিজ নেগাচার পালন করলে সকলেই নীরোগ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। পরিবারের সুখ-শান্তি, উন্নতি দিন দিন বাড়ে। পরিবারের শৃঙ্খলা, সু-সম্পর্ক বজায় থাকে। আনন্দ-আহলাদে পরিবার সব সময় পূর্ণ হয়ে থাকে। অন্যথা হলে বিপরীত ফল দেখা দেয়।

(খ) বিহান (সকাল) ঃ

বিহানে পালনীয় নেগাচার

(১) প্রাতকৃতঃ বা মল ত্যাগ করা;
(২) দাঁতন দিয়ে মুখ-হাত ধোওয়া;
(৩) সূর্য প্রণাম করা;
(৪) গোয়ালের গাই-গরু বার করা;
(৫) নিজ নিজ কাজে মনযোগ দেওয়া;
(৬) বেসিয়ামের খাবার রান্না করা।

(গ) বেসিয়াম ঃ

(১) স্নান করা
(২) সূর্য প্রার্থনা করা;
(৩) জলখাবার খাওয়া;
(৪) পূর্ণভাবে নিজ নিজ কাজে লাগা;
(৫) দুপহরের খাবার রান্না করা।

সূর্য প্রণামের সময় উচ্চারণ করে নয়, মনে মনে বলা ঃ— "হে মহারাই সূর্যদেব তোমার দয়ায় এই সুন্দর পৃথিবীতে জন্মেছি, বেঁচে আছি, সংসার ধর্ম পালন করতে পারছি। তোমাকে স্মরণ করি, মনন করি, শ্রদ্ধা জানাই, কৃজ্ঞতা জানাই, তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তোমাকে প্রণাম করি।"

(দুই হাত জোড় করে নমস্কার করা।)

(ঘ) দুপহর ঃ

(১) স্নান করা;
(২) দুপহরের খাবার খাওয়া;
(৩) বিশ্রাম করা।

(ঙ) আড়বেলা ঃ

(১) কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘরে আসা;
(২) গাই গরুকে মাঠে চরিয়ে ঘরে ফিরা;
(৩) ছেলে-মেয়েদের খেলা ও শরীর চর্চায় মন দেওয়া ও অনুশীলন করা।

(চ) অহরাত (সাঁঝ পহর) ঃ

(১) গৃহপালিত পশু-পাখীদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা;
(২) গাই-বলদকে রাতের খাবার দেওয়া;
(৩) সন্ধ্যা-প্রদীপ দেওয়া;
(৪) ধূপ-ধুনা দেওয়া;
(৫) রাতের খাবার তৈরী করা;
(৬) আখড়ায় নৃত্য-গীতে অংশ নেওয়া।

(ছ) পহরাত ঃ

(১) রাত্রির খাবার খাওয়া;
(২) বিশ্রামের জন্য বিছানা গ্রহণ করা;
(৩) পূর্ব-পুরুষ রাই-রাইয়াদের স্মরণ করা;
(৪) ঘুম দেওয়া।

(জ) নিশিরাত ঃ

(১) গাই-গরুদের দেখা;
(২) বাড়ীর অন্য কারো অসুবিধা হলে দেখা;
(৩) খামার, ঘর দেখা।

- এক এক সময় কৃষিকাজের ধরণ পরিবর্তন হয়। সেই অনুসারে নেগাচারেরও কিছু এদিক-ওদিক হয়ে থাকে।
- বাড়ীতে আত্মীয় এলে তাকে জলঘটি দেওয়া। বয়স্ক ব্যক্তি হলে থালায় তাঁর পা রেখে ধুইয়ে দেওয়া। প্রণাম করা এবং যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন ও সেবা যত্নের ব্যবস্থা করা।
- বাড়ীতে কোন লোক কিছু চাইতে এলে তাকে সাধ্যমত কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করে বিদায় করা;
- কেউ কিছু বলতে এলে তার কথা শোনা;
- পাড়া-পড়শি, ফুল-পরান পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা;
- কারো সাহায্য-সহযোগিতার দরকার পড়লে সাধ্য মত সাহায্য-সহযোগিতা করা;

- দরকারে লোকের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়ানো;
- বাড়ীর কেউ কোন খারাপ অভ্যাস করছে কি না তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা;
- পরিবারের কোন সদস্য তার নিজের কাজের দায়-দায়িত্ব প্রতিপালন করছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে নজর রাখা;
- পরিবারের সকলের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকছে কি না, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকা।

(ঝ) সব সময়েয়র জন্য পালনীয় ঃ

- পারিবারিক সম্পর্ক অনুসারে এবং বয়স অনুযায়ী ব্যবহার করা;
- বয়োঃজ্যেষ্ঠদের সমীহ ও সম্মান করা এবং তাদের মতামত নিয়ে কাজ করা;
- সৌজন্য বোধ, কৃতজ্ঞতা বোধ, শৃঙ্খলা বোধকে সদায় জাগিয়ে রাখা;
- পরিবারের সকলের আয়, পরিবারের যৌথ আয় ভাবা;
- পরিবারের সুখ-সুবিধা, সম্মান, দায়দায়িত্ব সকলেই সমান ভাগীদার, একথা স্মরণে রাখা;
- অন্যের সুখ-সুবিধা বেশী বেশী চিন্তা করা;
- যৌথ ভাব ভাবনা বজায় রেখে যুক্তি ও পরামর্শ মত কাজ করা;
- কারো মতামতকে অবহেলা না করা;
- সুবিধা-অসুবিধার কথা অকপটে ব্যক্ত করা;
- কে কোথায় কি কাজে যাচ্ছে, কোথায় থাকছে তা পরিবারের অন্যান্যদের জানানো;
- কেউ করছে না এই অজুহাতে আমার দায়-দায়িত্ব থেকে কখনো সরে আসা চলবে না।
- এই নেগ-নেগাচারগুলি মেনে বা পালন করে চললে সেই পরিবারের সুখ, শান্তি ও উন্নতি বজায় থাকবে। সুনাম, যশ, আনন্দ, বল, প্রতিপত্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যথা হলে বিপরীত ফল দেখা দেয়।

প্রয়োজন ঃ সমাজ সংসারের প্রত্যেকটি দম্পতির কামনা ভাল সন্তান লাভ। সন্তান পুত্র কি কন্যা যাই হোক না কেন সে হবে চরিত্রবান, গুণবান, সৎ, কর্মঠ ও সাহসী। এইরূপ সন্তান পেলে সমাজ-সংসারে সুখ, শান্তি, প্রতিষ্ঠা, মান, মর্যাদা সব কিছুই লাভ করা সম্ভব। অন্যথায় পিতা-মাতাকে বিপরীত ফল ভোগ করতে হয়। তার জন্য দম্পতিকে ধৈর্যশীল, নিষ্ঠাবান ও সচেতন হয়ে জীবন অতিবাহিত করে চলতেই হয়। অসংযমী, অনাচারী, দুরাচারী হলে চলে না।

নর অথবা নারী প্রত্যেক মানুষেরই যৌন মিলনের প্রয়োজন আছে এ কথা

যেমন ঠিক, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন আছে সন্তান সৃজনের ক্ষেত্রে সময়ের মূল্য অপরিসীম। দিন-রাত্রির সময় ও ক্ষণ অনুসারে দেহ মনের পরিবর্তন ঘটে চলে।

পুরুষশক্তি ও প্রকৃতিশক্তির মিলন সংগঠিত না হলে যেমন কোন জীব সৃষ্টি হয় না, অপরদিকে তেমনি দেহ-মন ও ক্ষণের তারতম্য অনুসারে দেহ মিলনের ফলে মনুষ্য সন্তান জন্মলাভ করে থাকে। এই বিষয়ে পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হল; —

(ক) দিনে দৈহিক মিলনের ফলে সন্তান হবে; — ব্যাধিগ্রস্থ, অপরিণত, দূর্বল, বিকলাঙ্গ।

(খ) অহরাতির (সাঁঝ পহর) সহবাসের ফলে সন্তান হবে; — দুরাচারী, স্মৃতিশক্তিহীন, অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ও পেটুক।

(গ) পহরাতির (প্রথম পহর) যৌন মিলনের সন্তান হবে; — অসামাজিক, অহংকারী, নেশাসক্ত।

(ঘ) নিশিরাতের (দুপুর রাত্রি) দেহ মিলনের ফলে সন্তান হবে; — অর্থলোলুপ, স্বার্থপর, কূপমণ্ডুক ও ঘুম কাতুরে।

(ঙ) ভিনসরের (শেষ পহর) সহবাসের ফলে সন্তান হবে; — শান্ত, ধীর-স্থির, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ, স্মৃতিধর ও ধর্মপরায়ণ।

বিশেষ বিশেষ নেগ-নীতি-নেগাচারগুলিও ভিনসরলে-নিশিরাত এই সময়ের ভিতরেই প্রতিপালিত হয়ে থাকে। দিন ও রাত্রির বাইরে বাড়তি আর কোথাও কি সময় খুঁজে পাওয়া যাবে ? বিশেষ নেগাচার প্রতিপালনের আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে দেখানো হয়েছে। সেই অধ্যায়গুলি অনুধাবন করতে, অনুরোধ জানাই।



তৃ তী য় অ ধ্যা য়

জনমলে মরণ

পুরুষশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি অর্থাৎ নারী-পুরুষের মিলনে বিশেষ অবস্থা পরিবেশ ও সময় মিলে যে কোন জীবের জন্ম বা জনম হয়ে থাকে। একা পুরুষ ও একা নারী কোন জীব সৃষ্টি করতে পারে না। আবার প্রকৃতির ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই মহাপঞ্চভূতের বিশেষ অনুপাতের মিলনে বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে একটা জীবের জন্ম হয়ে থাকে। অর্থাৎ মাটি, জল, উত্তাপ, বাতাস ও আকাশের বিশেষ অনুপাতের সংমিশ্রণে সময় ও উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতিতে জীবনের সৃষ্টি হয়। কোন একটির অনুপাত কম হলে বা না থাকলে জীবনের মৃত্যু বা লয় ঘটে থাকে। কোন একটির অনুপাত অধিক হলেও মৃত্যু হয়। বিশ্ব প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে কোন জীবের জনম হলেই তার মৃত্যু অবধারিত। লক্ষ-কোটি বছর ধরে প্রকৃতির এই অদ্ভুত গুঢ় রহস্যের কঠিন নিয়ম আবহমান কাল ধরে বহমান রয়েছে। ব্যতিক্রম হয় নাই। জটিল এই রসহ্য আজও কেউ সঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারেন নাই।

মানুষের জনম ও জীবন প্রকৃতির এই নিগুঢ় নিয়মেই বাঁধা। মানুষের জন্য আলাদা কোন নিয়ম নেই। মানুষেরও জনমের শেষ পরিণতি মরণ। এই জনম-মরণের মাঝখানেই যত লীলা-খেলা, ঘটনা-অঘটন ঘটে চলে। মানুষের জনমের পরে পরেই এক একটা অবস্থা আসে। যেমন- শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ অবশেযে মৃত্যু যা মরণ। পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতের সঙ্গে মিলে যায়। কুড়মালি নেগাচার মতে মরণের পরে আর মানুষের কোন অবশেষ থাকে না। এইখানেই তার শেষ পরিণতি। তাকে আর মৃত্যু/মরণের পর নরক, স্বর্গ বাস করতে হয় না। এমন কি পুণর্জন্ম গ্রহণ করতেও হয় না। এই পৃথিবীতেই মানুষ তার সন্তান-সন্ততির মধ্যেই বেঁচে থাকে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ যা কিছু ভোগাভোগ সংসারে থেকেই নিজেকেই করে যেতে হয়। কৃতকর্মের ফল কিছু কিছু তার সন্তান-সন্ততিরা ভোগ করে থাকে।

কোন মানব সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলে পর সেই দিনটিকে সন্তানের

জনম দিন হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার জন্ম হয় তার বেশ কয়েক মাস আগেই। স্বামী-স্ত্রীর মিলনে পুরুষশক্তি ও প্রকৃতশক্তির সংমিশ্রণে সন্তানের জন্ম হয় এবং ভ্রূণ আকারে মাতৃ জঠরে দিনে দিনে পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ করে। তারপর পূর্ণাঙ্গ মানব সন্তান শিশুরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।

মানুষের জনম ঃ

(ক) জনমের আগে — সন্তান জন্মগ্রহণ করার আগে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন এবং জন্মানোর পর কুড়মালি নেগ-নেগাচারে কিছু নেগাচার পালন করতে হয়। সন্তানসম্ভবা মাকে অতি সাবধানে থাকতে হয়। মাতৃগর্ভে থাকা সন্তানের যাতে করে কোনরূপ আঘাত না লাগে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। মায়ের প্রতিদিনের ভাবনা-চিন্তা, শ্রবণ-দর্শন, প্রতিক্ষণের শারীরিক সুস্থতা-অসুস্থতা, আনন্দ-বেদনার প্রভাব সূক্ষ্মভাবে শিশুর শরীর-মন গঠন হতে থাকে। মায়ের গর্ভেই শিশুর স্বভাব-চরিত্র, গঠন, সহ্য-অসহ্য ক্ষমতা তৈরী হতে থাকে। সেই কারণেই সন্তানসম্ভবা মাকে সবসময় আনন্দে, হাসি-খুশি, আমোদ-আহলাদে রাখতে হয়।

শিশু ও মা দুটি জীবন। দুটি জীবনের জন্য পুষ্টিকর বাড়তি খাবার দিতে হয়। নজর রাখতে হয়, খাবার যেন সহজ পাচ্য হয়। মা যেন সহজেই হজম করতে পারে। হজমে যেন কোন অসুবিধা না হয়। খাবার পরিমাণ মতো অবশ্যই হবে। বাড়তি হলে চলবে না। বাপের বাড়ীর লোককে দেখলে মা আনন্দ পায়। তাদের সঙ্গে মন খুলে কথা-বার্তা বলে। হাসি-খুশিতে থাকে। সেই বাপের বাড়ীর লোক, মাসি-ঘর, পিসি-ঘরের লোক ফল ও দুগ্ধজাত পুষ্টিকর খাবার নিয়ে নিয়মিত দেখা করতে আসেন।

সন্তানসম্ভবা মা গরুবাঁধা পাঘা ডেঁহগে (লাফ দিয়ে পার) না হওয়া। বিশ্বাস, তাহলে প্রসবে অসুবিধা হবে। কাকে মুখ দেওয়া তেল মাখে না। মাখলে কাকবন্ধ্যা রোগ হবে। অর্থাৎ জীবনে একবারই সন্তান ধারণ করতে পারবে। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ দর্শন করা যাবে না। দর্শন করলে সন্তানের অঙ্গহানি বা বিকলাঙ্গ হবে। সাপ দেখা মানা। সাপ দেখলে সন্তান ক্রুর স্বভাবের হবে। মায়ের রাগ করা, ঝগড়া করা, কুকথা বলা থেকে বিরত থাকতে হয়। এগুলি করলে সন্তানও সেই রকম স্বভাবের হবে। মিথ্যা কথা বলা, কপটতা করা চলবে না। দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ করা নিষেধ। করলে মায়ের শরীর খারাপ হবে। সন্তানের উপর প্রভাব পড়বে। লোকের কুনজর এড়ানোর জন্য

শরীরে লৌহখণ্ড ধারণ করা এবং সরিষা পড়া বেঁধে রাখা হয়। ভূতের গল্প শোনা, ভয়ের কোন ছবি দেখা বারণ। মা ভয় পেলে ছেলে ভীতু হবে। সমাজের ভালো লোককে ডেকে এনে বা তার বাড়ীতে গিয়ে তার দর্শন করা এবং তার কথা শোনা দরকার। আদর্শ সন্তানের/মানুষের মত মানুষের সন্তানের মা হতে গেলে স্মরণে-মননে প্রকৃত মায়ের কঠোর নেগাচার অতি অবশ্যই পালন করতে হবে। অন্যথা হলে সন্তান কুকুর, বেড়াল, গাধা-গরুর মতো স্বভাবের জন্মাবে। জন্মানোর পর খেয়ো-খেয়ি করে জীবন কাটাবে। অর্থাৎ সন্তান গর্ভে থাকাকালীন তার চিন্তন-মননে, কাজে-কর্ম্মে প্রতিক্ষণে যে যে আচরণ করবে, সন্তান সেই রকমই হবে। সন্তানের নীতি-আর্দশ বলে কিছু থাকবে না। অনুরূপ ভাবে সন্তানের পিতাকেও সাবধানে-সচেতনে প্রতিদিনের আচরণ করে যেতে হবে। আমাদের কথায় আছে "বাপ কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।" আবার বলাই আছে; — "আম আঁঠিতে আমগাছ, জাম বীজে জামই ফলবে।" অতএব প্রকৃত সন্তানের বাবা হতে গেলে স্বামীর আচরণ ও মনন চিন্তন ভাল হতে হবে।

কুড়মালি নেগাচারে বলা হয়েছে যে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তারা পিতার অর্ধেক ও মাতার অর্ধেক নিয়ে জন্মায় একথা যেমন ঠিক তেমনি পারিপার্শ্বিক প্রভাবও বেশী বলে বলা হয়েছে। পিতার অংশ দশ ভাগ ও মাতার অংশ নব্বই ভাগ। মাকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, মা ইচ্ছা করলে সবরকম সন্তানেরই জন্ম দিতে পারে। সেই কারণে সন্তানের প্রতি মায়ের প্রভাব অপরিসীম। তার জন্য মাকেই ইচ্ছা ও সাধনায় বেশী বেশী ব্রতী হতে হয়। তাঁকেই অধিক নীতি-নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম পালন করতে হয়। সন্তান মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সামাজিক ভাবে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে বলা হয় লমাসি (নয় মাসি) খায়ানো।

লমাসি ঃ সাধারণতঃ হিসাব ধরা হয়, সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হলে পর ভূমিষ্ট হয়। অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে। সন্তান জন্মগ্রহণ করার আগে ন-মাসে লমাসি গর্ভবতী মাকে খাওনো হয়। শ্বশুরবাড়ী ও বাপের বাড়ীতে আলোচনা করে একটি শুভদিন ধার্য্য করা হয়। বাপের বাড়ী ও অন্যান্য মাসিঘর-পিসিঘর-মামাঘর থেকে অনেক রকম পায়েস-মিষ্টান্ন, মিষ্টি, লুচি, ফল, পিঠে, বিশেষ করে মাংস পিঠা, ছোলা ভাজা, চিঁড়ে ভাজা নিয়ে আসেন।

বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করে ডাকা হয়। ফুল-পরান, পাড়া-পড়শি গোষ্ঠী-ভায়াদদের নিমন্ত্রণ করে ডাকা হয়। বউয়ের বাপের বাড়ীর লোক ও অন্যান্য আত্মীয় এলেই তাঁকে পা ধোয়ার জলঘটি দিয়ে সাদর আমন্ত্রণ

জানানো হয়। কোন বয়স্ক মহিলা বা পুরুষ মানুষ এলে তাঁর পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। বউয়ের বাপের ঘর থেকে আনা ফল-মিষ্টান্ন তিনটি শালপাতায় পতরিতে সাজিয়ে তুলসী তলায় একটি সূর্যদেব — ধরম গুঁসাঞ, একটি আদি গুরু বুঢ়াবাবা, একটি মা ষষ্ঠী-জিতিয়া মাঞকে স্মরণ করে রেখে দেওয়া হয়। তারপর জলঢাল দিয়ে প্রণাম করা হয়।

সন্তানসম্ভবা মেয়ে বাপের ঘরের লমাসি খাওয়ার দিন লমাসি খাওয়ার আগে পর্যন্ত না খেয়ে থাকে। বাপের বাড়ী থেকে যে সকল খাবার আনা হয় বাপের ঘরের লোকেই একটি থালায় সাজিয়ে বিটি-জামাইকে এক সঙ্গে বসিয়ে সেই সকল খাবার খাওয়ান। নিমন্ত্রিত কুটুম্বদের বাপের বাড়ীর লোকেই পরিবেশন করে খাওয়ান। ধাঁই মাঞের জন্য একটি থালায় রেখে দেন। তাকেও বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে খাওয়ান, তারপর থালার সাজানো খাবার তাদের বাড়ীর লোকের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়।

বউয়ের শ্বশুর বাড়ীর পক্ষ থেকে বাপের বাড়ীর লোকেদের খাইয়ে বিদায় জানানো হয়। ঐ দিনেই ভাবি নাতি-নাতিনীর মঙ্গলের কারণে ধরম পূজা করব বলে বউয়ের শ্বশুর-শাশুড়ি ধরম ঠাকুরের মানত করে একটি নুতন কূলা ঘরের কোন সুরক্ষিত স্থানে রেখে দেন।

(খ) জনমের পরে — পরিবারের লোক যখন বুঝতে পারে বউ মা হতে যাচ্ছে, তখন বউকে নির্ধারিত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। অভিজ্ঞ ও ভালোমনের দু-চারজন মহিলাকে ডেকে আনা হয়। তাঁরাই বউকে কোন ভয় না করা ও অন্যান্য নানারকম কথায় ভুলিয়ে রাখেন এবং তাকে ধরে সামলান।

(১) চাল ঢাড়া; — শিশু প্রসব হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ কোন মহিলা হাতে কোন লাঠি নিয়ে সামনের ঘরের চালে জোর আঘাত করে শব্দ করেন। শব্দ শোনা মাত্র শিশু চমকে ওঠে। কান্না জুড়ে দেয়। সকলেই বুঝতে পারেন শিশুর কানের শ্রবণ শক্তি ও গলার স্বর সচল আছে। শিশুর কোন রকম অসুবিধা নাই। সন্তান না কাঁদলে ধরে নেওয়া হয় শিশুর কোন শারীরিক গণ্ডগোল আছে। তুকতাক করে না কাঁদলে, চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয়।

(২) নাড়ী তুপা; — সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ ধাইমাকে ডাকা হয়। ধাইমা এসে নাড়ী ছেদন করেন। নাড়ী ছেদন করার পর ঘরের কোণে একটি গর্ত খুঁড়া হয়। সেই গর্তের ভিতরে নাড়ী (ফুল) ফেলে দিয়ে গর্ত সমতল করে বুজিয়ে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে নাড়ী তুপা বলা হয়ে থাকে। যে বাড়ীর মেঝের কোণে নাড়ী পোঁতা হয় সেই ঘরের প্রতি সন্তানের জীবন

ভর একটা আন্তরিক টান থেকে যায়। মনের সেই ভালবাসার টান কখনোই শেষ হয়ে যায় না।

(৩) আঁতুড় ঘর; — যে ঘরের ভিতরে প্রসূতি অর্থাৎ মা ও শিশুকে রাখা হয় সেই ঘরটিকে আঁতুড় ঘর বলা হয়। ঘরটিতে ধাইমা সব সময় কাঠ কয়লার আগুন জ্বালিয়ে রাখেন। যাতে করে ঘর ঠাণ্ডা হয়ে না যায়। ঈষৎ উষ্ণ করে ঘরের ভিতরকে রাখা হয়। গর্ভের ভিতরে শিশু যেমন গরমে ছিল সেই রকম ঘরটিকে গরম করে রাখা হয়। তা না হলে হঠাৎ শিশু বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করতে পারবে না। আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে এলে শিশু বাইরের বাতাস সহ্য করে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আঁতুড় ঘরের দুয়ারের চৌকাঠে জাল ছেঁড়া বেঁধে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, দুয়ারে জাল দেওয়া থাকলে কোন দুষ্ট অপদেবতা, কোন দুষ্ট শক্তি, কোন দুষ্ট ক্ষতিকারক প্রভাব ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। আবার যে খাটিয়ায় প্রসূতি মা ও শিশু থাকে সেই খাটের তলায় লৌহার কোন অস্ত্র দিয়ে রাখা হয়। বিশ্বাস, যদি কোন ক্রমে কোন অপদেবতা বা দুষ্ট শক্তি ঘরে প্রবেশ করেই থাকে তা হলে ঐ লৌহার অস্ত্র দেখে তৎক্ষণাৎ নিজেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। কোন কুপ্রভাব, কুনজর কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না।

ধাইমা আঁতুড় ঘরের আগুনে গাব গাছের পাতা গরম করে প্রসূতি মায়ের কোমরে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা তিন বেলা সেঁক দেন। গাব পাতার গরম সেঁক প্রসূতি মায়ের সমূহ ব্যথা-বেদনা দূর করে দেয়। পরবর্তী কালেও কোন শক্ত কাজ করলে কখনো ব্যথা অনুভব করে না।

অনুরূপ ভাবে, ঘিয়ের প্রদীপ কিম্বা সরিষা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে হাতের বুড়ো আঙ্গুল গরম করে শিশুর নাভিমূল ধাইমা তিনবেলা সেঁক দিয়ে দেন। সেঁক দেওয়ার সময় দেখে নেন গরম শিশুর সহ্যের মধ্যে আছে কি না। এইভাবে নাড়ী বা নাভিমূলে সেঁক দিলে নাভিতে পাক ধরে না। আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এসে যায়।

প্রসূতি মাকে প্রথম দিন কোন খাবার খেতে দেওয়া হয় না। পরের দিন এক লট (এক হাতের তালুতে যতখানি ধরে) চিঁড়ে ভাজা, রসুন ও সামান্য গাওয়া ঘি গরম করে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়। শিশুকে ছাগল দুধ খাওয়ানো হয়। ছাগল দুধ খাওয়ালে শিশুর শরীর সুস্থ থাকে। হজমশক্তি বাড়ে।

(৪) পাঁশ বাড়হা; — শিশুর জন্মের তিন দিনের দিন পাঁশ বাড়হা। আঁতুড় ঘরে আগুনের যে পাঁশ (ছাই) জমা হয়ে থাকে ঐ দিন ধাইমা তা পরিষ্কার করে

গাঁয়ের দপথায় (রাস্তার মোড়ে) ফেলে দিয়ে আসেন। ঘরের কাপড়-নেকড়া পুকুর থেকে জলে ধুইয়ে পরিষ্কার করে আনেন হয়। পাঁশ বাড়হার দিন থেকে প্রসূতি মাকে সকালে রসুন-ঘি ফুটিয়ে চিঁড়ে ভাজার সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়। দুপুর বেলা কুত্থিভাজা সেদ্ধ করে কুত্থিসেদ্ধ জল সমেত খেতে দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ঔলের ঝোল করে ভাত খেতে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, এইভাবে প্রসূতি মাকে খাবার খাওয়ালে মায়ের ও শিশুর শরীর ভাল থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কোনরূপ অসুবিধা ঘটে না। শিশুর সর্দি দেখা দিলে ধাইমা ছাগল লাদাড়ি ও ইঁদুর হেথেল জলে পাতলা করে গুলে শিশুর পায়ের তলায় আলতো প্রলেপ লাগিয়ে সামান্য সেঁক দিয়ে দেন। শিশু জন্মানোর পর থেকে তিন দিন চাষের কোন কাজ করা হয় না। পাঁশ বাড়হা অনুষ্ঠান হয়ে গেলে পর বীজ ফেলা বা ধান্য রোপন সব রকম কাজ করা যায়। অন্যথা হলে ফসলে রোগ, রোগপোকা দেখা দেয়।

(৫) লয়াত; — শিশু ছেলে হলে জনমের নয় দিনের দিন, মেয়ে হলে সাত দিনের দিন, লরাতঅ করা হয়। বাড়ীর সকলের জামা-কাপড় কেচে পরিষ্কার করা হয়। অনেক সময় ধোপা নিযুক্ত করা হয়।সকালেই ঐ দিন ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। উঠান-আঙিনায় গোবর দেওয়া হয়। প্রসূতির বাপের বাড়ীতে আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়। ইতিপূর্বেই যদি বেহান দেখা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তা হলে মা, না হয়ে থাকলে বাবা কিম্বা দুধুমাঞ (মায়ের মা) প্রসূতির জন্য নূতন শাড়ি কাপড়, শিশুর জন্য নূতন জামা, চিঁড়ে, চাল, কুত্থি, ঔল, রসুন, গাওয়া ঘি নিয়ে আসেন। সঙ্গে মিঠাই-লাড্ডু নিয়ে আসেন।

তেল-হলুদ বাঁটা, আমলা-মেথি বাঁটা, সিঁদুর, কাজল নিয়ে ধাইমা প্রসূতি মাকে স্নান করানোর জন্যে পুকুর ঘাটে নিয়ে যান। প্রসূতির সঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য মা-বোনেরা, পাশাপাশি বাড়ীর ও গোষ্ঠীর অভিজ্ঞ মায়েরা পুকুর ঘাটে স্নান করতে যান। অবশ্যই সঙ্গে প্রসূতির মা/দুধুমাঞ পুকুরঘাটে যান। পুকুরে স্নানের সময় প্রসূতির মা প্রসূতির মাথায় তিন/পাঁচ/সাত আঁজলা জল দিয়ে স্নান করান। তারপর প্রসূতি পুকুরঘাটের কাছাকাছি পাশে সিঁদুর, কাজল, আমলা-মেথি, তেল-হলুদ বাঁটা দিয়ে জলদেবীকে স্মরণ করে প্রণাম করেন। তারপর তিন আঁজলা জল দিয়ে দেন।

বাড়ীতে নাপিত ডাকা হয়। নাপিত নখ, চুল-দাড়ি কেটে দেয়। নাপিত বউ মা-বোনেদের আলতা পরিয়ে দেয়। গোষ্ঠী-ভায়াদ, পাড়া-প্রতিবেশীদের ফুল, পরান, নিকট আত্মীয়কে ঐ দিন ডাকা হয়। তেল-হলুদ, পারলে মণ্ডা-মিঠাই বিলানো হয়।

হলুদ জল কাঁসার থালায় সূর্যের আলোয় গরম করে প্রথম ধাইমা তেল-হলুদ মাখিয়ে শিশুকে স্নান করান। পুকুর থেকে স্নান করে আসার সময় রাস্তার পাশে যদি কোনো গ্রাম্য দেব/দেবী যেমন – জাহির থান, মা ষষ্ঠীর থান, গরাম থান পড়ে সেই দেব/দেবীর থানে গিয়ে দেব-দেবীকে স্মরণ করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তেল-হলুদ, আমলা-মেথি বাঁটা দিয়ে প্রসূতি মা প্রণাম করেন। রাস্তায় যদি কোন গরুর গাড়ী থাকে সেই গাড়ীর চাকায় তেল-সিঁদুর, আমলা-মেথি দিয়ে প্রণাম করেন। বিশ্বাস, গাড়ীর চাকায় তেল-হলুদ দিলে সন্তানের জীবন ভালভাবে চাকার মত নির্বিঘ্নে গড়গড়িয়ে চলবে।

স্নান করে বাড়ীতে আসার পর মা তুলসী থানে, উপস্থিত গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিবেন। তারপর বাপের ঘর থেকে আসা চিঁড়ে ভাজা, ঘি, রসুন, কুত্থি সিদ্ধ খাবেন। রাত্রিতে ঔল সেদ্ধর ঝোল-ভাত খাবেন। অনেক সময় মা-বোনেদের মধ্যে পরস্পর হলুদ মাখামাখি, হাসি এমনকি নাচ-খেল চলে। অনেকে ঐ দিন সন্তানের মঙ্গল কামনায় কাপড়, টাকা দান করে থাকেন। আত্মীয়-স্বজনদের খাওন-দাওন চলে। রাত্রির দিকে অনেকে নাচ-গীতের আসর বসান। এমনি ভাবে দিনটি আনন্দে কেটে যায়।

(৬) শিশুর পরিচর্যা;— লরাতর পরের দিন থেকে প্রতিদিন সকালবেলা সরিষার তেল ও হলুদ বাঁটা মাখিয়ে রৌদে কিছুক্ষণের জন্য শোয়ানো হয়। তাতে তার চামড়া মসৃণ ও উজ্জ্বল হবে। কোন চর্মরোগ হবে না।

সুঁট, পিপল, মধু, তুলসী পাতার রস, গৈ সাপের শুকানো মাথা জলের সঙ্গে পাটিতে ঘঁসে এক সঙ্গে মিশিয়ে আলহৈ (চাটনি) পাথর বাটিতে রেখে প্রতিদিন সকাল-বিকাল সামান্য পরিমাণে শিশুকে চাটিয়ে খেতে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, আলহৈ শিশুকে খাওয়ালে তার কখনো পেটের অসুখে ভুগতে হবে না। কফ, সর্দি, কাশিজনিত রোগ বা কোন কঠিন ব্যাধি আক্রমণ করতে পারবে না। সরিষার তেল কোন কাঁচের শিশি বা বোতলে রেখে সেই তেলের মধ্যে 'গা-মচড়া' ফল ফেলে দিয়ে রাখলে, ঐ তেল শিশুকে মাখালে শিশুর গা মচড়া রোগ হবে না।

শিশুর কোমরে কমরদড়ির সঙ্গে একশিরা ফল, ভেলা বীজ, তামার মাদুলিতে আপাং (চিড়চিড়ি) — আঁকন্দ-শিকড়, দূর্বাঘাস রেখে মুখ মোম দিয়ে এঁটে বেঁধে দেওয়া হয়। কামার লৌহার দুধবালা তৈরী করে এনে দেন। শিশুর হাতে ঐ দুধবালা পরানো হয়। বিশ্বাস, এইগুলি করলে একশিরা, হার্ণিয়া, অর্শ রোগ হয় না। কোন কুনজর, কুপ্রভাব শিশুর উপর পড়ে না। শিশুকে রক্ষা করে বর্মের মত কাজ করে।

(৭) একুশা;— শিশু জনমের একুশ দিনকে বলা হয় একুশা। ঐ দিন বাড়ীর উঠান-আঙিনায় গোবর দেওয়া হয়। বাড়ীতে নাপিত ডেকে নখ-চুল-দাড়ি কেটে নেওয়া হয়। শিশুর পিতা অন্যান্যদের মত লরাতর দিন চুল-দাড়ি কাটে না। একুশার দিন পর্যন্ত রেখে দেয়। ঐ দিন বিশেষ করে বাবা চুল-দাড়ি-নখ কাটে। প্রসূতি মা ও শিশুকে নাপিত নখ কেটে দেয়। বাড়ীর সকলে জামাকাপড় কেচে পরিষ্কার করে নেয়। ধাইমা এলে পর তেল-হলুদ বাঁটা, সিঁদুর, কাজল, আমলা-মেথি বাঁটা নিয়ে প্রসূতি মাকে পুকুরে স্নান করাবার জন্যে নিয়ে যান। সঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য মহিলারা যান। পুকুরঘাটে ধাইমা তেল-হলুদ, সিঁদুর, কাজল, মেথি বাঁটা দিয়ে মা ষষ্ঠীর ও জলদেবীর পূজা দেন। লরাতর দিনের মতই পথে গ্রাম্য দেব-দেবীর থানে ও গরুর গাড়ীর চাকায়, প্রসূতি মাকে সিঁদুর কাজল দেওয়া করান।

স্নান করে বাড়ীতে এসে তুলসী থানে ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করেন। এখন থেকে মায়ের প্রসূতি অবস্থা শেষ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এরপর থেকে মা সব কাজ করতে পারবেন। আজকের দিন থেকেই মা আমিষ খাবার মাছ-মাংস খেতে পারেন। তবে স্নান ও খাবারের দিকে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হয়। কোন প্রকারেই মায়ের যেন অম্বল-পেট খারাপ না হয়ে যায়। মায়ের শরীর খারাপ হলে সন্তানেরও শরীর খারাপ হয়ে যায়। যতদিন শিশু মায়ের দুধ খেয়ে থাকে অন্য কোন খাবার দেওয়া হয় না। ততদিন পর্যন্ত মাকে অত্যন্ত সংযমে সাবধানে থাকতে হয়। অনেক সময় বাপের বাড়ীর, মামার বাড়ীর, মাসি-পিসি বাড়ীর লোকজনকে ডাকা হয়।

বেহান দেখা— মেয়ের শাশুড়ি ও মেয়ের মায়ের সম্পর্ক বেহান বেহান। অপরপক্ষে ছেলের শাশুড়ির সঙ্গে ছেলের মায়ের সম্পর্ক বেহান। বিবাহের পূর্বে ছেলের বাবা ও মেয়ের বাবার দেখাদেখি হয় অর্থাৎ বেহাইয়ে বেহাইয়ে বর-কনের বিবাহের আগে ও পরে দুই বেহাইয়ের সাক্ষাৎ বা দেখা হলেও বেহানে বেহানে দেখা-দেখি হয় না। বিশেষ অনুষ্ঠান করে দু-পক্ষের দেখাদেখির কাজটি করতে হয়। অনুষ্ঠান করে কনের মায়ের সঙ্গে বরের মায়ের দেখা-দেখির যে কাজ করা হয় তাকেই "বেহান দেখা" বলা হয়ে থাকে।

বেশ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত একটা নিয়ম ছিল কনের অর্থাৎ মেয়ের মা-বাবা মেয়ের কোন সন্তান না হওয়া পর্যন্ত মেয়ের শ্বশুরঘরে খাবার খাওয়া তো এতই দূর জল পান করা চলত না। এখন অবশ্য সেই চল আর তেমন কঠোর ভাবে পালনের রীতি প্রায় কমে গেছে। আমরা একটা প্রচলিত পুরাতন টুসু গীতে পাই; —

গীতটি এই রকম, — "বাড়ী নাময় কূয়া কুড়লাম,
ঘটি ভ'রে জল খাব।
এমনি কূয়া নিঠুর হ'ল,
শালুক ফুল ফু'টে গেল।।"

বাড়ীতে অনেকেই কূয়া বা কূপ কাটেন। কিন্তু দেখা যায় কূয়ায় কখনো শালুক ফুল ফুটে না। গীতটি একটি রহস্যে আবৃত। রহস্যের কথা হল; — মেয়ের বিয়ে দিলাম। মেয়ে সন্তান সম্ভবা হয়েছে। তার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। আর কিছু দিনের মধ্যে মেয়ে মা হবে। মেয়ে মা হলে তার শ্বশুরবাড়ীতে আনন্দ করে খাওয়া যাবে। কিন্তু হায়! মেয়ে মা হতে পারল না, গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। শালুক ফুল ফু'টে গেছে। সাধারণতঃ বেহান দেখা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে মেয়ের সন্তান হওয়ার পর। দুই পক্ষের আলাপ-আলোচনা করে অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ধার্য্য করা হয়। সাধারণতঃ লরাতর দিন, একুশার দিন এই অনুষ্ঠান করা হয়। আবার মুখে ভাত দেওয়ার পূর্বে করা হয়ে থাকে। আধুনিক কালে, এখন বিবাহের পরে পরেই এই অনুষ্ঠান অনেকে করে নিচ্ছেন।

বরঘরের পক্ষ থেকে বউয়ের মা, মাসি, পিসি, কাকী, জেঠিদের নিমন্ত্রণ করে বেহান দেখা করতে আসার জন্য জানাতে হয়। কনে ঘরের পক্ষ থেকে বেহান দেখার উপকরণ নিয়ে নির্ধারিত দিনে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে যেতে হয়।

মেয়ের মা তিনটি পানের খিলি, জামাই-বিটির জন্যে কাপড়, নাতি কিম্বা নাতনির জন্য পোশাক, বেহানদের বেহাইদের জন্যে নূতন ধুতি-শাড়ী, গুড়-চিঁড়ে, মিষ্টি নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে করে বেহাইঘর পৌঁছাবেন। বেহান আসার খবর পেয়েই বরের মা কোন ঘরে লুকিয়ে পড়েন। যাতে করে বেহান দেখার পূর্বেই বেহানে বেহানে দেখাদেখি হয়ে না যায়। মেয়ের মাও অপরঘরে বসেন।

ইতিপূর্বে ছেলের মা বেহান, বেহান দেখার উপকরণ সাজিয়ে রাখেন। আঙিনার মাঝখানে আড়াআড়ি ভাবে একটি শাড়ী কাপড় দিয়ে আড়াল তৈরী করা হয়। শাড়ীর দুই-দিকে দুই পক্ষের বেহানরা দাঁড়ান।

কাপড়ের মাঝখানে নীচে একটি কাঠের পিঁড়ি বসিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের মা ঐ পিঁড়ির উপর পা রাখেন। মেয়ের মা হলুদ গোলা জলে ঘটি ভর্তি করে বেহানের পা ধুইয়ে দেন। তারপর পায়ে তেল-হলুদ মাখিয়ে দেন। একইভাবে তিনবার অনুরূপভাবে পা ধুইয়ে দেন। পা ধোয়ানোর পর কনের মা বরের মাকে প্রণাম করেন। মেয়ের মায়ের মত ছেলের মায়েও বেহানের পা ধুইয়ে দেন। পায়ে হলুদ-তেল মাখিয়ে প্রণাম করেন। বরের মায়ের বয়স বেশী হলে

প্রণাম করা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

পা ধোয়া হয়ে গেলে পানখিলি তিনবার অদল-বদল করে একে অপরকে পান খাইয়ে দেন। রূপার সূত দুই পক্ষই একে অপরকে পড়িয়ে দিবেন। তারপর মাঝখানের শাড়ী গুটিয়ে নেওয়া হয়। দুই বেহানে কোলআঁকড় (আলিঙ্গন) করেন। অন্যান্য মাসি-পিসি কাকী-জেঠিরা দুই পক্ষের সঙ্গে প্রণাম, কোল-আঁকড় করেন। কনের মা সকলের জন্য শাড়ী দেন।

বেহাই ঘরে ভোজের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। সকলে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নেওয়ার পর বিদায় নেন। সেই সময়ের মধ্যে সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, জোর হাসি, গল্প চলে।

বিদায়ের সময় এ-ওকে প্রণাম করেন। ছেলের মা প্রত্যেককে নূতন শাড়ী দিয়ে বিদায় জানান।

(৮) কাজল পরহা;— শিশুর জনমের একুশ দিনের দিন শিশুর পিসীমা গাওয়া ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রদীপের শিশের মাথায় একটি গোটা পানপাতা ধরে কালি তৈরী করেন। সেই কালির সঙ্গে গাওয়াঘি মিশিয়ে কাজল তৈরী করেন। শিশুকে কোলে নিয়ে সেই কাজল মহামাঞ ষষ্ঠীকে স্মরণ করে তিনবার মাটিতে ফেলে দেন, তারপর শিশুকে চোখে পরিয়ে দেন। বাড়তি কাজল কাজললতায় সংরক্ষণ করে রেখে দেন। পরবর্তীকালে প্রত্যেক দিন স্নানের পর ঐ কাজল শিশুর মা শিশুকে পরিয়ে দেন। পিসীমা শিশুকে প্রথম কাজল পরানোর জন্য বাপেরবাড়ীর লোকের কাছে পাওনা পেয়ে থাকেন। জমি, গয়না, কাপড় বাপেরবাড়ীর সামর্থ অনুসারে যে কোন একটি কিম্বা একাধিক পাওনা পেয়ে থাকেন।

শিশুকে কাজল পরালে শিশুর দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। পরবর্তীকালে শিশুকে কোন কঠিন চোখের পীড়া ভোগ করতে হয় না। চোখের তারা বেশী রকম কালো রঙের হয়। ভ্রমর কালো চোখের তারা শোভাবর্ধক হয়। পরিণত বয়সে শিশু ঐ চোখের দৃষ্টিশক্তির গুণে লোককে নিজের প্রতি আকর্ষিত করতে পারে। বলে রাখা ভালো, বাজারী রেডিমেট কেনা কাজলে কিন্ত কোন সুফল পাওয়া যায় না। বরং বিপরীত ফল পাওয়া যায়। বাজারী কাজল সুলভ ও বেশী রকম শোভাবর্ধক হলেও আখেরে কিন্তু তেমন ভাল কিছু হয় না। পূর্বপুরুষের বহু অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত। কারো কথা শুনে নয়, দস্তুর মত ব্যবহারের মাধ্যমে পরখ করে সমাজে চালু করেছেন।

(৯) চিড়ি দেওয়া;— শিশুর জনমের একুশ দিনের মাথায় আর একটি

অনুষ্ঠান হল; শিশুকে চিড়ি দেওয়া। ধাইমা অথবা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই কাজটি করে থাকেন। প্রথমে শিশুর নাভিমূলের উপরে চারিপাশে আলতো করে গাওয়া ঘি অথবা সরিষার তেল বুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটি পরিষ্কার (নূতন) দা আগুনে গরম করে দায়ের মুখ দিয়ে নাভির চারপাশে সাত/নয় বার আলতো করে ছুইয়ে দাগ দিয়ে দেওয়া হয়। শিশু জোর চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়। তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। বরং শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ সচল ও সতেজ হয়ে যায়।

বিশ্বাস, এই চিড়ি দেওয়া অনুষ্ঠান করলে শিশুর সহ্য ক্ষমতা অধিক মাত্রায় বেড়ে যায়। শিশুর পরবর্তী অবস্থায় বহু রকম রোগ-ব্যাধির আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। টীকাকরণের কাজ করে। সাবধান, আনাড়ি হাতে এই কাজ যেন না করে থাকেন।

(১০) ভেলা দাগি;— শিশুর জনমের পর লরাতর দিন কিম্বা একুশার দিন ধাইমা একটি ভেলা বীজ ভেঙ্গে অথবা তার ডগা কেটে একটি নিম খড়িকার মাথায় ভেলা তেল নিয়ে শিশুর দুই ভ্রুর মাঝখানে কপালে এবং দুই ভ্রুর প্রান্তে কপালের উপরে আলতো করে ছুইয়ে দেন। যে শিশুর চামড়া সহ্য করার ক্ষমতা না থাকে তার এক আধটু ঘায়ের মত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঐ ঘা বিশেষ তেমন ক্ষতি করে না।

ভেলা তেলের দাগ দিলে চামড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। অনেক রকম চামড়ার রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বিশ্বাস, ভেলা দাগ দিলে শিশুর উপর কুনজর পড়ে না। কোন খারাপ শক্তি শরীরে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

(১১) মজুঁঠান/মুখে ভাত;— শিশুর বয়স যখন ছয় মাস পার হয়ে যায়, মনে করা হয় মায়ের দুধ ছাড়াও শিশুর পুষ্টির জন্য বাড়তি খাবারের প্রয়োজন এবং শিশু ঐ খাবার হজম করতে পারবে তখন কোন শুভ দিন দেখে পায়েস রান্না করে শিশুকে প্রথম অন্ন খাওয়ানো হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'মজুঁঠান বা মুখে ভাত' বলা হয়। পরিবারের সামর্থ থাকলে মায়ের মা, মাসিমা, মাসি-পিসিদের নিমন্ত্রণ করে জানানো হয়। তাঁরা যথা সময়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসেন। সঙ্গে শিশুর জন্যে জামাকাপড়, গয়না নিয়ে আসেন। মা-মাসি-পিসিদের খাইয়ে নুতন শাড়ী-কাপড় দিয়ে বিদায় জানানো হয়। কামার কিছু না খেয়ে লৌহার ধরমবেড়ি তৈরী করে শিশুর পায়ে পরিয়ে দেন। ধরমপূজার সময় ঐ বেড়ি খোলা হয়ে থাকে।

ধরম পূজা

কুড়মালি নেগাচারে ধরম পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূজা। এই পূজার নিয়ম-নীতি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয়। ধরম ঠাকুর স্বয়ং সূর্যদেব। ধরম পূজা অর্থে সূর্যের পূজা। এই নেগাচারে সূর্য অর্থাৎ ধরম ঠাকুর সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান দেবতা। কুলদেবতা। কুড়মালি মতে পুরুষ দেবতাদের বলা হয় রাই। আর স্ত্রী দেবতা দেবীদের বলা হয় রইআ বা সিনি। ধরম ঠাকুরকে বলা হয় "মহারাই"।

মনে করা হয়, সূর্যই বিশ্বপিতা। তাঁর দয়ায় পৃথিবীর জীবকুল, উদ্ভিদকুলের জন্ম। সূর্য না থাকলে যেমন কোন জীব জন্মগ্রহণ করতে পারে না, তেমনি সূর্য না থাকলে বাঁচতেও পারবে না। তিনি জনম, জীবন ও মরণেরও দেবতা। তিনি সন্তুষ্ট থাকলে, তাঁর দয়া হলে কোন বিপদ, রোগ, শোক আসবে না। বিশ্বাস, ধরম ঠাকুরকে মানত করলে সন্তান পাওয়া যায়। সন্তানের জন্মের পরে সেই জন্য সন্তানের মঙ্গল কামনায় ধরম পূজা করে মানত শোধ করা হয়। মানত না করলেও মনে করা হয় সন্তানের জন্ম হয়েছে ধরম ঠাকুরের দয়ায়। মানত না করলেও সেই কারণে প্রথম কন্যাসন্তান বা প্রথম পুত্রসন্তানের জন্য অতি অবশ্যই ধরম পূজা করতে হয়।

প্রথম পুত্র বা কন্যার বিবাহের পূর্বদিন পর্যন্ত ধরম পূজা করে নিতেই হয়। এটাই সামাজিক বিধান। ধরম পূজা না হলে বিবাহ কার্য করা চলে না। কুড়মি সমাজের একাশি গোষ্ঠীর ও কুড়মালি নেগাচারী সমাজের ইহাই সামাজিক ধর্ম।

ধরম পূজার একটি বিশিষ্ট নিয়ম হল — ধরম পূজা করতে হলে সেই গোষ্ঠীর বা ঝাড়ের কোন রমণী অন্তঃসত্তা থাকবে না। সেই বৎসরেই ধরম পূজা করা চলে। ঝাড় বা গোষ্ঠী বলতে ধরে নেওয়া হয়, একই গ্রামে বসবাসকারী পরিবার, যাঁদের সঙ্গে সামাজিক কাজে-ভোজে ভায়াদি করণ-কারণে আদান প্রদান আছে।

গোষ্ঠী বা ঝাড়ের লোকসংখ্যা অধিক হলে প্রত্যেক বৎসর ধরম পূজা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কারণ কোন না কোন রমণী গর্ভবতী হয়ে থাকেন। সেই কারণে ধরমের নামে সন্তানকে মাথায় চুটকি বা শিখা বহন করতে হয়। অনেকে পায়ে লোহার বেড়ি পরে থাকে। পূজার সময় প্রত্যেক ছেলেকে মাথার চুল মুণ্ডন করতে হয়। বড় মেয়ে হলে তার আগ চুল কেটে নিয়ম পালন করে থাকে।

গোষ্ঠীর এক এক পিড়হিতে ধরম পূজা করে নিতে হয়। সেইজন্য এই পূজাকে "পিড়হি পূজা"ও বলা হয়ে থাকে।

পারিবারিক ধরম পূজা পরিবারের তুলসী থানের পাশে হয়ে থাকে। আবার বার বছর অন্তর এক এক গোষ্ঠীর মানুষ সম্মিলিত ভাবে আগের থেকে পূর্বপুরুষদের নির্দিষ্ট স্থানে কিম্বা সেরকম কোন স্থান না থাকলে যুক্তি সাপেক্ষে নির্বাচিত স্থলে পূজা করা হয়ে থাকে। এইরূপ ধরম পূজাকে "পাঁতা পূজা" বলা হয়।

কোন গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ও পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু অনেক সময় বেশ কয়েক বছর ধরম পূজা আটকে থাকে। কারণ গেষ্ঠীর পরিবারের কোন মহিলা গর্ভবতী থাকেন। সেই কারণে বিবাহ যোগ্য পুত্র-কন্যাদের ধরম পূজা না করে যেহেতু বিবাহ দেওয়া যায় না সেজন্য বিবাহও আটকে থাকে। সেইক্ষেত্রে সামাজিক ভাবে তাৎক্ষণিক বিধান দেওয়া হয়, — যে পরিবারে মহিলা গর্ভবতী হয়েছেন সেই পরিবারকে বাদ রেখে ধরম পূজা করা হয়। গোষ্ঠীর পংতি বা পাঁতা ভোজের সময় কিন্তু ঐ পরিবারের গর্ভবতী মহিলা বাদ দিয়ে অন্যান্যরা অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

পূজার দিন ঃ ধরম পূজা করার জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন থাকে না। বৎসরের যে কোন শনিবার শুক্রবার পূর্ণিমা তিথি পড়লে, সেই দিন লক্ষ্য করে পূজার দিন স্থির করা হয়। দেখে নেওয়া হয়, রবিবার দিন ভোর থেকে পূজা আরম্ভ হয়ে সূর্য উদয়ের মুহূর্তে যেন অন্ততঃ প্রথম পাঁঠা বলি করা যায়। প্রথম সূর্য উদয়ের সময় থেকে বলিদান আরম্ভ হয়ে যতক্ষণ বলির পাঁঠা থাকে ততক্ষণ বলিদান করা যায়।

পূজার স্থান ঃ পরিবারের পূজা হলে পরিবারের তুলসী থানের কাছে বা তুলসী থানে পূজা করা হয়ে থাকে। পাঁতা পূজা বা আখড়া পূজা হলে গাঁয়ের বাইরে তুলসী থান তৈরী করে সূর্য মন্দির তৈরী করে পূজা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ইতিপূর্বেই সে রকম আলোচনা কিছু করা হয়েছে। পাঁতা পূজার জন্য প্রায় প্রতিটি গ্রামেই এক এক গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের নির্দিষ্ট স্থান থাকে। তবে সব গোষ্ঠীর এবং সব গাঁয়েই এ রকম নাও থাকতে পারে। পূর্বপুরুষদের পূজার স্থলটির নাম হয় 'ধরম থান' বা 'ধরম ঘুটা'। এক একটি এলাকায় জায়গা ছেড়ে দেওয়া থাকে যে স্থানগুলিতে কখনো কেউ কোন চাষ-বাস করে না। এমনকি ভুলক্রমে হাল বাহে না। সবসময়ের জন্য পতিত পড়ে থাকে। বারো বৎসর অন্তর পাঁতা পূজার জন্যই ঐ স্থানটি ব্যবহার করা হয়।

নিমন্ত্রণ ঃ কোন পরিবারের ধরম পূজা হলে নিমন্ত্রণ করে গাঁয়ের গোষ্ঠী-ভায়াদ, অপর গ্রামের নিজস্ব আত্মীয় কুটুম্বদের ডাকতে হয়। নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি একটি নতুন মাটির ভাঁড়ে হলুদ, গাবা চাল ও গোটা সুপারী নিয়ে আত্মীয় কুটুম্ব বাড়ীতে যাবেন এবং আঙিনায় চাল কিছু ছড়িয়ে দিয়ে বলবেন, — "অমুক গ্রামের অমুক গোষ্ঠীর অমুক লোকের এত তারিখে ধরম পূজা, পরিবারের সকলের নিমন্ত্রণ।"

পাঁতা পূজা হলে, নিমন্ত্রণকারী বাইরের গ্রামের গোষ্ঠী-ভায়াদদের বাড়ীতে যাবেন। সেখানে ভায়াদের তুলসীতলায় হলুদ গাবা চাল ছিটিয়ে গোটা সুপারী রেখে দিয়ে বলবেন, — অমুক গ্রামের অমুক গোষ্ঠীর আখড়া পূজার নিমন্ত্রণ। অমুক দিনে পূজা হবে।"

কোন একটি গ্রামের সেই গোষ্ঠী বা ঝাড়ের সবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণকারী নিমন্ত্রণ না দিতে পারলেও ধরে নেওয়া হবে গোষ্ঠীর নিমন্ত্রণ। তখন সকল পরিবার একসঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে পূজার আগে চাল, টাকা, পাঁঠা পৌঁছে দেন এবং যদি কোন ভায়াদের সন্তানের মানত থাকে তাহলে বার-উপবাস করে চাল-পাঁঠা নিয়ে আগের দিনেই পূজা স্থানে হাজির হন।

পাঁতা পূজার বৈশিষ্ট্য হল ঃ ঝাড় বা বংশের লোক বৃদ্ধি হেতু সুযোগ সুবিধামত বাইরে দূরদূরান্তের গ্রামে বসবাস করেন। অন্যদের বসবাসের কারণে সকলের সঙ্গে সকলের জানা-শোনা, আদান-প্রদান অনেক সময়েই হয়ে ওঠে না। সেই কারণে বারো বছর অন্তর অন্ততঃ একবার পাঁতা বা আখড়া পূজা করা হয়। ধরে নেওয়া হয় পাঁতা পূজায় ভায়াদদের প্রত্যেক ঘরে হাঁড়ি নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সকলের আত্মীয়-স্বজন-ফুল-পরানের বাড়ীতেও হাঁড়ি নিমন্ত্রণ করা হয়। এক এক গোষ্ঠীর লোক পূজার জাগরণে ও পঁক্তি বা পাঁতা ভোজে একত্রিত হন। সকলের মধ্যে আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে। অনেক সময় দুঃখে বিপদে পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন।

পূজারী ঃ যে বংশের ধরম পূজা করা হবে সেই বংশের বড়ঘরের যে বড় সেই হতে পারেন পূজার লায়া। তিনি করবেন পূজা। তিনি তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে বংশের একজনকে দেহরি এবং অপরজনকে সুসারী নিয়োগ করেন। বড় বংশের বড় থাকতে অন্য কেউ পূজার অধিকারী হন নাই। অনেক সময় তিনি অসমর্থ হলে তাঁর অনুমতিক্রমে অপরজন সেই বংশেরই কেউ লায়ার কাজ চালিয়ে যান। ধরম পূজার লায়াকে বার উপবাস করে নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে থাকতে হয়। তাঁর সাহায্যকারীদেরকেও বার উপবাস ও সংযমের মধ্যে থাকতে হয়।

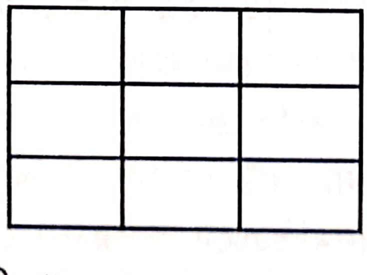
বার ও উপবাস ঃ রবিবারের ভোরে পূজা হলে তার আগের দিন বার-উপবাসে থাকতে হয়। যে পরিবারে যার যার নামে ধরম পূজা তাদের তো বটেই অন্যান্যদেরও বার-উপবাস করতে হয়। যে বংশের পূজা পারিবারিক পূজা হলেও প্রত্যেকটি পরিবার থেকে অন্ততঃ একজন পূজায় ব্রতী হিসাবে অংশ নিতেই হয়। প্রত্যেকটি পরিবার থেকে পূজার ভোগ ও বলি দেওয়ার জন্য পায়রা বাচ্চা নিয়ে পূজাস্থলে হাজির হন। পারলে প্রতিটি পরিবার থেকে বাড়ীর গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী উপবাসী হয়ে পূজায় অংশ গ্রহণ করেন।

যারা বার-উপবাস করে থাকেন তারা সন্ধ্যার পূর্বে পারলে রামদাঁতুনে মুখ ধুয়ে পুকুরে স্নান করে পূজার স্থানে তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যাবাতী জ্বেলে প্রণাম করেন। সাধারণতঃ শালপাতার বঁহতার ঘিয়ের প্রদীপ করে সন্ধ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

পূজার স্থান সাজানো ঃ সন্ধ্যার আগে লায়া ও তাঁর সাহায্যকারীগণ স্নান করে আসেন। ইতিপূর্বেই সকালেই ঘর-আঙ্গিনায় গোবর দেওয়া হয়ে যায়। পূজা স্থানেও গোবর দেওয়া হয়। তুলসী থানের সামনের জায়গা বর্গাকারে চার কোণে চারটি শরকাঁড় গেড়ে দেওয়া হয়। বেলপাতার বনমালা তৈরী করে শরকাঁড় গুলির মাথা ঘুরিয়ে বনমালার বেড় দেওয়া হয়। বেড়ের মাঝখানে একটি শালকাঠের পিঁড়ি চালগুঁড়ি দিয়ে গাবিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়।

বংশের কোন বধূ বার উপবাস করে স্নান সেরে প্রদীপদিয়ে প্রণাম করার পর আতপ চাল ধুইয়ে এনে উখোল (কাঠের তৈরী গড় বা গর্ত করা), ধূসলা (লোহার বেড়ি মুখে বসা) কাঠের দন্ড দিয়ে গুঁড়ি কোটেন।

সেই উখ্যল কুটা চালগুঁড়ি নিয়ে লায়া তুলসী থানের সামনে একটি নয়টি ঘর তৈরী করে একটি খঁড় আঁকেন। এই খঁড়ের দাগের এই এক একটি ঘরকে এক এক জন দেব/দেবীর স্থান হিসাবে মনে করা হয়। খঁড়টি নিম্নরূপের হয়। যেমন —



তুলসীমঞ্চে যদি তুলসী গাছ না থেকে থাকে, আগে থেকেই লায়া সেদিকে লক্ষ্য রেখে একটি তুলসী গাছ এনে লাগিয়ে দেন।তুলসী মঞ্চের সামনে মাঝবরাবর একটি আলপনা দেওয়া করান। সেই আলপনার উপর ঘট স্থাপন

করা হয়। ঘটের বাম পাশে অপর একটি আলপনা করা হয়, সেখানে জাগর হাঁড়ি বসানো হয়। আলপনার উপর ধান দেওয়া হয়, যাতে করে ঘটভাঁড় ও জাগরহাঁড়ি ঠিক মত বসে। উলটে পড়ে না যায়। আলপনা দেন বংশের কোন কুলবধূ। তিনি অবশ্যই বার-উপবাস করে থাকবেন।

ঘট স্থাপন ঃ লায়া একটি ঘটিতে জল নিয়ে তাতে তিনটি আম পাতা চুবিয়ে নিজের মাথায় ও অন্যান্য সাহার্য্যকারীর মাথায় ছিঁটিয়ে দেন। তারপর কপালে চন্দন/রোহিন মাটির টিপ নিয়ে ঘট হাঁড়িতে তিনটি সিঁদুরের দাগ দিয়ে আলপনার ধানের উপর বসিয়ে দেন। তারপর দুই হাতে জলঘটি নিয়ে ঘটটি পূর্ণ করে দেন। ঘটের ভিতরে একটি হরিতকি/গোটা সুপারী ফেলে দেন। ঘটের মুখে পাঁচ/সাতটি পাতা যুক্ত আমের ডাল গুঁজে দেন। তার উপরে একটি গোটা নারিকেল এবং নারিকেলের উপর একটি গামছা দিয়ে দেন। হাঁড়ি গামছা সবই হতে হবে নূতন। কোন পুরাতন জিনিস চলবে না।

কাটরা বা হাঁড়ি কাঠ গাড়া ঃ দুটি শাল কাঠের খুঁটি জাগর হাঁড়ির সামনের দিকে পাশা-পাশি গাঁ ঘেঁসে গাড়া হবে। ঐ খুঁটি দুটিকে খড়ের বড় বেড়ি করে গোড়ায় বেঁধে দেওয়া হবে। পরখ করে দেখা হবে বলি দেওয়ার সময় খুঁটি না নড়ে যায়, কিম্বা উপড়ে না পড়ে যায়। খড়ের বেড়ির উপরে খানিকটা সামনের অংশে গুঁড়ি লেপে তিনটি সিঁদুরের দাগ কেটে দেওয়া হয়।

জাগর জ্বালা ঃ একটি নূতন মাটির হাঁড়ির গায়ে দা দিয়ে কিছু ছিদ্র করে দেওয়া হয়, যাতে করে হাঁড়ির ভিতর বাতাস প্রবেশ করতে পারে। ঠিকমত বাতাস প্রবেশ না করলে হাঁড়ির ভিতরের প্রদীপ নিভে যেতে পারে। একটি নূতন মাটির প্রদীপে ঘি ঢেলে পলিতা দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়। মহারাই সূর্যদেব — ধরম ঠাকুরকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে লায়া প্রদীপ জ্বেলে হাঁড়ির ভিতর তলদেশে কিছুটা গোবর রেখে দেন। যাতে করে প্রদীপটি ভালভাবে বসে যায়। কাঁচা গোবর দেওয়া থাকলে প্রদীপের ঘি গরম হয়ে যায় না। পরিমাণ মতো ঠিক প্রদীপ জ্বলতে থাকে। জাগর হাঁড়ি বসানোর আগে লায়া হাঁড়ির গায়ে তিনটি সিঁদুরের দাগ এঁকে দেন। ঘিয়ের এই প্রদীপকে বলা হয় 'জাগর'। সমূহ অনুষ্ঠানকে বলা হয় জাগর জ্বালা। জাগর হাঁড়ি বসিয়ে লায়া ধরম ঠাকুরকে স্মরণ করে প্রণাম করেন।

দেব-দেবী — রাই-রইআদের আমন্ত্রণ জানানো ঃ জাগর জ্বালার পর লায়া ধরম ঠাকুর ও অন্যান্য দেব/দেবীদের আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা সকলেই ধরম পূজার সময় যেন পূজা স্থানে উপস্থিত হন। তাঁরা যেন আশীর্ব্বাদ ও

সহায়তা করেন, যেন পূজা নির্বিঘ্নে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়। পূজা যেন সার্থক হয়। বংশের কেউ মারা গেলে তাঁর স্মরণে শ্রদ্ধা পূজা করার পর মনে করা হয় তাঁরা রাই-রইআ হিসাবে সূর্যদেবের অঙ্গে বিরাজ করেন। তাঁদেরকে সামাজিক কাজে স্মরণ করা হয়। তাঁদের সহায়তা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হয়। ধরম পূজার সময় প্রয়াত পূর্বপুরুষদেরও আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ জানানো হয়।

লায়া হাতে গোটা পানপাতা ও গোটা সুপারী নিয়ে হাঁটুগেড়ে জোড় হাত করে এক একটি দেব/দেবীকে স্মরণ করে প্রত্যেকের জন্য আলাদা পান-সুপারী বনমালা দিয়ে যে মন্দির/থান বানানো হয় তার মাঝের পিঁড়ির উপর রেখে দেন।প্রথমে ধরম গুরু বুঢ়াবাবা, মহামাঞ, বসমতা মাঞ, জাহির মাঞ, গাঁগরাম, গরৈইআ ও অন্যান্য দেব/দেবীদের স্মরণ করে আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ করলেই হয়। বাকী কাজ পূজার আগে করতে হয়। ভোরের সময় অতকিছু কাজ করতে অনেক সময় অসুবিধা হয়। সেই কারণে আগে থেকেই জাগর জ্বালার সময় বাড়তি কাজ করে রেখে দেয়। তবে পূজার আগে করলেই ভাল হয়।

জাগরণ ঃ জাগর জ্বালানোর পর জাগরকে ঘিরে গোটা রাতভর জাগরণ করা হয়। ব্রতীগণ, আত্মীয়-কুটুম্ব, ফুল-পরাণ সকলেই জাগরণের সময় উপস্থিত থাকেন। ধরম পূজার জাগরণের আচার গীত হল 'মহারাই গীত'। যাঁরা ভাল মাহারাই গীত গাইতে পারেন তাঁদের আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ করে আনা হয়। গায়ক শিল্পী তাঁর সহযোগী বাদ্যকারগণকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। মাহারাই কুড়মালি ভাষায় রচিত কুড়মালি মহাকাব্য।

জাগরণের রাতে মাহারাই গীতের ফাঁকে ফাঁকে অনেকে সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক প্রশ্ন তোলেন এবং তার সমাধানের জবাব জানতে চান। অভিজ্ঞ ব্যক্তি সমুচিত প্রশ্নের সমাধানের জবাব দেওয়ার প্রচেষ্টা করেন। গানে-গীতে-আলোচনায় কখন ভোর হয়ে যায়। অনেক সময় সে কথা মনেই থাকে না। লায়া তাঁর সহযোগীদের নিয়ে পূজার কাজ আরম্ভ করে দেন।

পাকা ভোগ রান্না ঃ লায়া তাঁর সহযোগী কিম্বা বংশের কোনকূলবতী বধূকে দিয়ে পূজা স্থলের পাশে নূতন উনান তৈরী করে নূতন মাটির হাঁড়িতে পাকা ভোগ রান্না করেন। আতব চাল, দুধ, গুড় মাটির হাঁড়িতে ফেলে সেদ্ধ করে পাকা ভোগ রান্না করান। পাকান্ন হয়ে গেলে ভোগ উনান থেকে নামানো হয়।

লায়া খঁড়ের প্রত্যেকটি ঘরে এক একটি দেব/দেবীকে স্মরণ করে প্রথমে সিঁদুরের দাগ দেন, তারপর সিঁদুর দাগের উপরে তুলসী পাতা, দূর্বাঘাস, আতব

চাল ও অন্যান্য ভোগ নিবেদন করেন। শেষে দেন পাকা ভোগ। ভোগ দেওয়ার পর বেলপাতা ও অন্যান্য ফুল এক একটি দেব/দেবীদের স্মরণ করে প্রতি ঘরে দিয়ে দেন।

পূজার বলি ঃ ধরম পূজায় পায়রা বাচ্চা ও পাঁঠা ছাগল পূজার বলি হিসাবে দেওয়া হয়। পায়রা বাচ্চার মাথায় জল ছিটিয়ে সিঁদুর দেওয়া হয়। তারপর পাকা ভোগ খাওয়াতে হয়। ভোগ খাইয়ে বলি দেওয়া হয়। পাঁঠা চরানোর আগে পায়রা আনার জন্য ডাক দেওয়া হয়। ডাক দেওয়ার পর কেউ পায়রা না আনলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়। তারপর পাঁঠা বলির কাজ আরম্ভ করা হয়। পাঁঠা চরানোর কাজ আরম্ভ হওয়ার পর যদি কেউ পায়রা বাচ্চা নিয়ে আনেন তার পায়রাকে আর কিছু খাওয়ানো হয় না। এমনি ভাবেই বলি দেওয়া হয়। সূর্য উদয়ের মুহূর্তে প্রথম পাঁঠা বলি হয়। পায়রার মত পাঁঠাকেও প্রথমে জল ছেটানো হয়। তারপর মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেওয়া হয়। ভোগের সামগ্রী ও আঁওলা পাতা পাঁঠাকে খেতে দেওয়া হয়। পাঁঠা যদি খায় তাহলে ঠিক আছে ধরে নেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে পাঁঠা চরানো বলা হয়। পাঁঠা যদি না চরে তাহলে পাঁঠার কোন দোষ আছে বলা হয়। আলাদা পাঁঠা আনতে বলা হয়। আলাদা পাঁঠাও যদি না চরে তাহলে গৃহকর্তার কোন দোষ বা অনিয়ম হয়েছে ধরে নেওয়া হয়। তাঁকে গলায় কাপড় জড়িয়ে পূজা স্থানে প্রণাম করে দোষ বা অনিয়ম স্বীকার করে পুনরায় মানত করতে হয়। বলিদানের সমূহ মাথাকে পূজা স্থলের বাম পাশে জমা করে রেখে একটা বাঁশের ছাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

পূজার সময় ব্রতীদের কাজ ঃ পূজা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই প্রতিটি ব্রতীকে পুকুরে ভোরে স্নান করে এসে ভিজে কাপড়ে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ভিজে কাপড়ের জল চুঁইয়ে পড়তে থাকে। কাপড়ের জল মোছানোর বিধি নেয়।

অপর দিকে যে যে ব্রতীর মানত থাকে তাদের মাথার চুল মন্ডন করে স্নান করে ভিজে কাপড়ে পূজাস্থলে হাত জোড় করে এসে দাঁড়াতে হয়। ব্রতী বড় মেয়ে হলে তার মাথার চুল মুন্ডন না করে আগচুল কেটে স্নান করলেই হয়। যদি কোন ব্রতীর পায়ে ধরম বেড়ি থাকে তাহলে স্নান করার সময় ঐ বেড়ি খুলে পুকুরের জলে ধরম ঠাকুরকে স্মরণ করে ফেলে দেওয়া হয়। অনেক সময় বেড়ি খোলার জন্য কামারকে ডেকে বেড়ি খুলানো হয়। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত ব্রতী যখন পূজাস্থল ঘিরে জোড় হাত করে দাঁড়ায় এবং নীরবে পূজা চলতে থাকে তখন এক আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরী হয়ে যায়। একটা ভাব

ও ভক্তি যেন ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। ধরম ঠাকুর সূর্যদেবকে কুড়মালি সংস্কৃতির মানুষ কত মান্যতা দেয়, ধরম পূজা তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বলি শেষে সকল ব্রতী প্রণাম করে নিজ নিজ কপালে পূজাবলির রক্তের টিকা নেয়।

বলি শেষ করে লায়া পূজা স্থানে জল ঢাল ও দুধ ঢাল দিয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করেন এবং পূজায় যদি কোন ভুল বা অনিয়ম হয়ে থাকে তা হলে অনিচ্ছাকৃত সেই ভুলের জন্য বিশ্বপিতা ধরম ঠাকুর সূর্যদেবের কাছে অপরাধজনিত ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

পুরন্দরি রান্না ঃ নূতন মাটির হাঁড়িতে পরিমাণ মত জল ও আতপচাল হলুদ দিয়ে রান্না করতে হয়। রান্নার সময় লবণ বা তেল মশলা দেওয়া চলবে না। যিনি রান্না করবেন তিনি ঐ বংশেরই লোক হতে হবে । তিনি অতি অবশ্যই বার উপবাস করে থাকবেন। রান্না সুদ্ধ মনে, সুদ্ধ চিত্তে করতে হবে। কোন অনিয়ম করা বারণ। রান্না হয়ে গেলে পর উনান থেকে নামানো হয়।

ধরম ডাক ঃ ধরম পূজার ভোজ গোষ্ঠী ভোজ। রান্না হয়ে গেলে বংশের-গোষ্ঠীর প্রত্যেককে এক পংতি বা পাঁতা ভোজনে অংশগ্রহণ করতে হয়। ভোজ আরম্ভ হওয়ার আগে লায়া কিম্বা বংশের অপর কোন বয়ঃজ্যোষ্ঠ ব্যক্তি গাঁয়ের পথে দাঁড়িয়ে জোর ডাক দিয়ে বলেন — "পাঁতা ভোজ আরম্ভ হয়ে গেছে। গোষ্ঠীর যে যেখানে আছ, চলে এসো। যে আসবে না, তাকে আজ থেকে বংশ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।" এই ডাককেই বলা হয় ধরম ডাক।

পুরন্দরি খাওয়া ঃ ধরম পূজার নিয়ম হল, ভোজ রান্না হলে পর আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের না দিয়ে প্রথমে ঝাড় বা বংশের সকলে পূজা স্থলকে ঘিরে ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি প্রত্যেকেই একসঙ্গে বসে ভোজন করবেন, বংশের খাওয়া হয়ে গেলে পর আত্মীয়-কুটুম্বদের ভোজ খেতে দেওয়া হয়। থানের ধার পাশে বংশের সকল সদস্য বসলে পর পাতা দিয়া হয়। সকলের আগে হলুদ গাবা আলুনা ভাত পরিবেশহ করা হয়। এই ভাতকে বলা হয় 'পুরন্দরি'। পুরন্দরি ভাত সকলের পাতে পড়লেও ঝাড়/বংশের কোন সদস্য হাজির না থাকলে তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হয়। অপেক্ষার পরও যদি দেখা যায়, কেউ এসে থাকলে তাকে পাঁতায় বসতে বলা হয় এবং তাকে পুরন্দরি ভাত পরিবেশন করা হয়। দেখা যায় যদি কেউ না এসে থাকে তা হলে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি খাওয়া আরম্ভ করবেন ; তাঁর দেখাদেখি অন্যেরা খাওয়া শুরু করবেন। পুরন্দরি ভাত সব শেষ করে খেতে হয়। হলুদ ভাত খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ভাত-ডাল-তরকারী

এবং পূজার রান্না করা মাংস পরিবেশন করা হয়। সকলের খাওয়া হয়ে গেলে উঠবার অনুমতি দেওয়া হয়। খাওয়ার পাতা উঠিয়ে ফেলার নিয়ম নেই। সব পাতাকে একসঙ্গে ঠেলে ঠেলে এক জায়গায় জড়ো করা হয় এবং পাতাগুলিকে একটি বাঁশের ছাতায় ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়। সবশেষে একটি গর্ত খুঁড়ে পাতাগুলিকে পুঁতে ফেলা হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় পুরন্দরি খাওয়া।

ধরম পূজার ভোজ ঃ পুরন্দরি/পাঁতা ভোজ বংশের লোকে খাওয়ার বাদে অপরাপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভোজ খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ভোজ খাওয়া আরম্ভ হলে পর যেমন যেমন লোকজন ভোজ খেতে আসেন, তেমন তেমন ব্যবস্থা করা হয়। নিমন্ত্রিত না হলেও ধরম পূজার ভোজ শুনেই অনেকেই ভোজ খেতে আসেন। তাঁকেও খাওয়ানো হয়। ধরম পূজার ভোজে মাস কলাই ও মুসুর ডাল চলে না। ডাল হিসাবে অড়হর ডাল রান্না করা হয়। ভোজ চলে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত।

সন্ধ্যার ধরম থানে সঁনঝা বাতি দেওয়ার পর গোষ্ঠী ভায়াদের লোকজন একত্রিত হয়ে বলির মাথাগুলি বার করা হয়। ঐগুলি বংশের লোকেই যে যেমন ভাবে পারেন পুড়িয়ে, রান্না করে, মাংস পিঠা তৈরী করে খান। যদি খেয়ে শেষ করা না যায় তা হলে বাড়তি মাথা এবং রান্না করা বাড়তি মাংস একটি গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলা হয়।

পাঁতা বা আখড়া পূজা হলে একটা মোটা রকমের খরচ বসে। বহু লোকের সমাগম হয়। সেইরকম অনেক জিনিসপত্রের দরকার পড়ে। অনেক লোকের মিলে অনুষ্ঠান। কমবেশী যাই হোক সকলেই হাসিমুখে তা বহন করেন। পারলে রাত্রির মধ্যেই সব রকম হিসাব পত্র সমাধা করার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময় ঐ দিন রাত্রিতে নাচ-গীতেরও আসর বসে। দূর-দূর থেকে গোষ্ঠী-ভায়াদ ভোজ খেয়ে বাড়ী যেতে না পারলে নাচ-গীত দেখে শুনে রাত্রি কাটাতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। আখড়ায় ছাদনের ব্যবস্থা করাই থাকে। ইচ্ছা করলে ওখানেও গল্প করে রাত্রি পার করেন। পুরাতন সম্পর্ক ঝালিয়ে নিতে পারেন। এলাহি এত বড় অনুষ্টান সুষ্ঠভাবে পার করার ফলে ব্যক্তি ও সমাজ-গোষ্ঠী জীবনে একটা বল বাড়ে। এত এত আপনজন আছেন। অনেকের সঙ্গে নূতন করে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। নূতন করে নূতনভাবে আদান-প্রদান চলতে থাকে। দশ গাঁয়ের পাঁচ আপনজন একত্র হয়ে নূতন কোন বড় সামাজিক উন্নয়নের কাজ হাতে নিতে পারেন। কথায় বলে, — দশে মিলে করি কাজ। অসম্ভব বলে মনে হবে না।

কুড়মালি বিহার নেগ-নেচার

ভারতবর্ষে বিহা বা বিবাহ প্রথা অতি প্রাচীন। কথায় বলে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ কখন হবে কেউ বলতে পারে না। তবুও মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্যে বিহা বা বিবাহ একটি অন্যতম প্রধান ঘটনা। অনিশ্চিত হলেও সংসার জীবনে এর মূল্য অপরিসীম। বিহা একটি বিশেষ সামাজিক প্রথা বা অনুষ্ঠান। এক সামাজিক স্বীকৃতি যার মাধ্যমে দুটি নর-নারী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারে। জনক জননী হয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে সংসারকে সচল রাখে। সুষ্ঠু জীবন প্রবাহ বয়ে চলে।

ভারতবর্ষে সমাজপ্রথা, সামাজিক রীতি-নীতির সঙ্গে বুঢ়াবাবা শিব এই বিবাহ প্রথা প্রচলন করেন। সেই কারণে ভারতের মূলবাসী আদিবাসী মানুষজন আজও মনে করেন শিবের বিহা পার না হলে বিহাঘর করা চলে না।

কুড়মি একটি জাতি বা গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায় যাই বলা হোক না কেন আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে "কুড়মালি" একটি জাতীয়তার নাম। যৌথ পরিবারের বয়োঃজেষ্ঠ ব্যক্তির পরিচয়েই পরিবারের সকলের পরিচয়। তেমনিভাবে একটি বড় গ্রামের পরিচয় একটি অঞ্চলের পরিচয়। এতদ্ অঞ্চলে কুড়মি বড় গোষ্ঠী সেইজন্য এই মিলিত সংস্কৃতির নাম "কুড়মালি"। ভারতের আদিম দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কুড়মি, কামার, কুমার, চামার, হাড়ি, ডোম, রাজোয়ার, ঘিসি, মাহালি, বাগাল, কুইরী, ভূমিজ, ভুঞা প্রমুখ জাতিগুলি এই কুড়মালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক ও পালক। সেইজন্য এই সকল সাম্যবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃহত্তম কুড়মি গোষ্ঠীর বিবাহ পদ্ধতি আলোচনা করলে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির বিবাহ পদ্ধতিও জানা হয়ে যায়। অষ্ট্রীক গোষ্ঠীর সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, কোল, কড়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিহার নেগ-নেচারের পার্থক্য অতি সামান্য। যেই যা ভাগ করে দেখাক না কেন যেহেতু মূলবাসী ভারতীয়রা সকলেই "খেরোয়াল" জনগোষ্ঠীর লোক সেই হেতু আদান-প্রদান, মেলা-মেশা, অনুসরণ-অনুকরণ যাই হোক না কেন একথা মানতেই হবে মূল শিকড় কিন্তু কেউ হারান নি।

আগেই বলেছি বিহা বা বিবাহ সংসার জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কুড়মিদের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের চাইতে আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। বিবাহ না হলে কোনো ছেলে/পুরুষকে "পিড়হি পুরুষ" (generation) গণনায় গণ্য করা হয় না। অবিবাহিতের বয়স যতই হোক না কেন, মৃত্যু হলে তার জন্য "কাজভজ" করার রেওয়াজ নেই। তাকে কিন্তু নাবালক হিসাবেই গণ্য

করা হয়। এমনকি তাকে গাইডহরে পুঁতে ফেলার রীতি আছে।

আমাদের সকলের সাধারণ ধারনা বিহা বা বিবাহ একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মিলনের অনুষ্ঠান বা প্রথা। কুড়মিদের ক্ষেত্রে কিন্তু কেবলমাত্র একটি বর ও কনের মিলনই নহে, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আর এক গোষ্ঠীর মিলন।

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ দেশাচার, নেগাচার, কুলাচার ও বেদাচার এই চারটি ধারার বিবাহ প্রথা চালু আছে। কুড়মি জাতির বিবাহ নেগাচার ও কুলাচার প্রথায় সম্পন্ন হয়। নেগ > নিয়ম আচার > পালনীয় করণ-কারণ। এই নিবন্ধে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে সকল নেগ-নীতির মাধ্যমে বিবাহ কার্য় সমাধা করতেন এবং এখনও সমাজের ৯৭ ভাগ মানুষ করে থাকেন তারই আলোচনা করার প্রয়াস করছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটিকে নাচ-গীতের মাধ্যমে জীবন্ত-সচল-প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে রাখা হয়। সেই জন্য গীতকেও অনুষ্ঠানের একটি নেগ বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই কারণে কিছু কিছু গীতেরও এখানে উল্লেখ করার প্রচেষ্টা রাখছি।

পাত্র বিবাহযোগ্য হলেই জনক-জননী সচেতন হয়ে উঠেন, ছেলের বিবাহ দিতে হবে। অতএব যেখানে যেখানে পাত্রীর সন্ধান আছে, আত্মীয়, স্বজনকে দিয়ে তারই খোঁজ-খবর নিতে অনুরোধ করা হয়। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের ঘরে পাত্রী থাকলে আরও ভালো। পুরাতনকে আরো নূতন করে ঝালিয়ে নেওয়া হবে। লতে লতে মিল হলে ভাল। নিজেরাও পাত্রীকে বাইরে বাইরে দেখে মনে মনে পছন্দ করে রাখেন। উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পেলে আত্মীয় -স্বজনকে নিয়ে পাত্রপক্ষ "আড়ে-উড়ে" (প্রাথমিক) কনে দেখতে যেতে হয়। কন্যাপক্ষের লোক কখনই প্রথমে পাত্র পক্ষের বাড়ী আসবেন না।

আড়ে-উড়ে দেখা ঃ শুভদিন দেখে আড়ে-উড়ে কনে দেখতে যাওয়া হয়। ৫, ৭, ৯, ১১ এমনি বিজোড় সংখ্যার দিন পাত্রী দেখতে যাওয়ার রীতি। ঝাড়ে-ঝাড়ে বিবাহ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এই দিকে পাত্রপক্ষ সবসময় সচেতন থাকেন ঝাড় বা গোত্র কোন প্রকারেই যেন এক না হয়।

যে গ্রামে পাত্রী আছে, পাত্রপক্ষ সেই গ্রামে পৌঁছে সোজাসুজি পাত্রী পক্ষের বাড়ীতে যাবেন না। সেই গ্রামের জানা-শোনা অপর কোন বাড়ীতে উঠবেন। তারপর পাত্রী পক্ষের বাড়ীতে খবর পাঠানো হবে। অনুমতি পেলে তবেই যাওয়া হবে।

গ্রামে যাওয়ার সময় কিছু শুভ/অশুভ লক্ষণও দেখা হয়। শুভ লক্ষণ দেখলে বিহা মঙ্গলজনক হবে। অশুভ লক্ষণ দেখলে ভাল হবে না। এমনকি সম্বন্ধ করার দিকে আর অগ্রসর হন না। শুভ লক্ষণ যেমন — জলভর্তি হাঁড়ি

কলসী দেখা, গাই বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে, ডানদিক থেকে শিয়াল বাম পাশে চলে যাচ্ছে এবং যাওয়ার সময় পিছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে ইত্যাদি। অশুভ লক্ষণ - কারো বাড়ীতে আগুন লাগা, কুঠার দিয়ে কাঠ কাটছে, গরু কিংবা অন্য মরা জীব-জন্তু ফেলার জন্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি।

পাত্রী পক্ষের বাড়ীতে পৌঁছলে হাত-মুখ ধোয়ার জন্য জল ঘটি দিবে। কুশল কিছু কথা আদান-প্রদানের পর বরপক্ষ তাঁদের আগমনের কথা ব্যক্ত করেন। দিদি কিম্বা অন্য কারোর সঙ্গে পাত্রী এসে প্রণাম করে দাঁড়ায়। কখনো একা আসে না। পাত্রপক্ষ নানাভাবে খুঁটিয়ে কন্যা দেখেন। নাম, বাবার নাম, মামাবাড়ী কোথায়? ইত্যাদি সামান্য দু-চারটি প্রশ্ন করে পরখ করে নেন। কন্যার কথা বলা, গলার স্বর, ঠিক মতো শুনতে পায় কি না জানা হয়ে যায়। পছন্দ হলে পর পাত্র দেখার জন্য কন্যা পক্ষকে অনুরোধ করা হয়। লেনা-দেনার প্রশ্নও তোলা হয়। এক কথায় কি পাকা হয়? সাত কথার লেন-দেন ওঠে।

অনুরূপ ভাবে কনে পক্ষও "আড়ে-উড়ে" পাত্র দেখতে যান। ভাল ভাবে চর্চে দেখে নেওয়া হয় ; পাত্র কেমন? তার স্বভাব, ব্যবহার, আয়, রোগাদি, বিদ্যা বা গুণাবলী সব কিছু খুঁটিয়ে অন্যের কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয়। বাইরে থেকেই জেনে ঠিক মন মঞ্জুর হলে পর পাত্রপক্ষের বাড়ী যাওয়া হবে। দুই পক্ষের 'আড়ে-উড়ে' দেখার পর ঠিক মন মঞ্জুর হলে পর মা-বোন সকলের মতামত নিয়ে — আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী, গোষ্ঠী-ভায়াদ, ফুল-পরানের উপস্থিতিতে বিবাহের কথাবার্তা পাকা করা হয়। গ্রামের মোড়ল/মাহাতর মতামত তাঁর উপস্থিতি একান্ত ভাবেই চাওয়া হয়। পাকা কথা হওয়ার পর দু-পক্ষের সুবিধা-অসুবিধা বিচার-বিবেচনা করে "রেবাড়" বা কন্যা আশীর্ব্বাদের দিন ধার্য করা হয়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আনন্দের আবহাওয়া তৈরী হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিহা গীত শুরু হয়ে যায়।

পাত্র পক্ষের লোক পাত্রী দেখতে আসছে। যে ভাবেই হোক মেয়ে "কানে-কুনে" এই কথাটি জেনে যায়। কন্যার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

"নদিয়াকা ধারে ধারে কুইলিকা শবদ গো।
আস্য কুইলি বস্য নিম ডালে গো।।
মাচিলায় বস্যে আছে হামর বাবা গো।
শুনঅ বাবা কুইলিকা শবদ গো।।
কিঅ শুনিব মাঞগো কুইলিকা শবদ গো।
আঁখি হামর ঢরকিছে, ছাতি-হামর বিদরিছে গো।।"

অভিভাবকদের কথায় বিবাহ পাকা হলেও পাত্র-পাত্রীর মতামত প্রচ্ছন্নভাবে জেনে নেওয়া হয়। ঠারে ঠুরে পাত্র কিম্বা পাত্রী তাদের মনোমত পাত্র-পাত্রীর কথা জানিয়েও দেয়। তবে সব ক্ষেত্রে এমনটি হবে তার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। গোপন ভাব-ভালবাসা কুড়মি সমাজে স্বীকৃত নহে। সেই ভাব ভালবাসাকেই সমাজ মেনে নেয় যা সামাজিক ভাবে উঠে আসবে। কোন ছল-চাতুরী থাকবে না। একটি বিহাগীতে প্রাক্ বিবাহ সম্বন্ধে পাত্র-পাত্রীর মত বিনিময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। গীতটি এই রকম —

"কনঅ আমা হরি হর, কনঅ আখা পিঅর গো।
কনঅ আমা সিঁদুরঅ বরণ?
সেহঅ আমা বিছে গেল্, কন্যা কুঙারি গো।
রাজা বেটায় ধরলঅ আঁচর।।
ছাড়ু ছাড়ু রাজা বেটা হামারি আঁচর হো।
হামে হেঁকঅ কন্যা কুঙর ।।
তঁহি জে হেকিস ভালা কন্যা কুঙারি গো।
হামে হেঁকঅ বরঅ কুঙর গো।।
তঁয়ে জে হেকিস ভালা বরঅ কুঙর গো।
চলি জাহ আজাকে বাখ্যাল।।
কৈইসে চিনবঅ কন্যা, তরঅ আজাঘার হো।
কৈইসে চিনবঅ আজা তর?
উঁচঅ উচঁঅ বাখলী, গমহির গমহির পিঁড়হা গো।
উপরে ত ঘুরে রাজাহাঁস।।
আজা কেরা দরবারে, আঁজরা ভরি টাকা দেবে।
তখন রাজা হবঅ তহর।।"

রেবাড় বা আশীর্ব্বাদ ঃ পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট দিনে পাত্রপক্ষ আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে কন্যা পক্ষের বাড়ীতে হাজির হবেন। শাড়ী-সায়া-ব্লাউজ, গয়না, প্রসাধন সামগ্রী যা কন্যার ব্যবহারে লাগবে তা অতি অবশ্যই সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। আরো নেওয়া হবে মিঠাই। যার যেমন সামর্থ তেমনই নেওয়া হয়। বাঁধা-ধরা তেমন কোন নিয়ম নেই।

কনে বাড়ীতে ভোর থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। সকালেই আঙিনা-উঠান সব লরা-প্যাতা হয়ে যায়। তুলসি থান বা পিঁড়হা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়। একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার কুড়মিদের নিজস্ব কোন অনুষ্ঠান হলেই

কিন্তু প্রথম কাজ হবে ঘর-দোর নিকানো বা লরা-প্যাতা করা। কাজ-পাট করতে করতে মা-বোনেরা বিহা গীত গাইতে থাকেন। এই গীতেই জানান দেয় কি হতে যাচ্ছে। কারো জানতে বাকী থাকার কথা নহে।

"বাবারঅ বাড়িয়ে কুঁদরিরঅ লত্ গো।
ফলে-ফুলে ঝাবরলি ডাল গো।।
মাচিলায় বস্যে আছেন হামর আজা গো।
বলঅ আজা ফুলে কেরি দর গো।।
সুন্দর সুন্দর ফুল দেখ্যে খদ্দ্যারঅ লাগিল গো।
বলঅ আজা ফুলে কেরি দর গো।।
যদি ফুলের দর করি দশ কুটুম খুজি গো।
কুটুম থ্যাকে দিবঅ যে মুলাঞগো।।"

কনে ঘরের লোক প্রস্তুত হয়েই থাকেন। সম্বন্ধ করতে গেলে একজন দুপক্ষের মধ্যস্ত লোকের প্রয়োজন হয়। তাকে "আগান-পেছান" বা এককথায় "রাইবারি" বলা হয়। তিনি আগাম এসে খোবর দিয়ে দেন কুটুম গাঁয়ে পৌঁছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রী পক্ষের লোক জল-পিঁহড়া নিয়ে কুলহির দুয়ারে অপেক্ষা করতে থাকেন। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বয়োঃজ্যেষ্ঠদের পিঁড়ির উপর পা রেখে পা ধোয়ানো হবে। অন্যদের হাতে হাতে জল ভর্তি ঘটি দেওয়া হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা মুখে-হাতে জল নিবেন। কুটুমদের বসার বন্দোবস্ত করাই থাকে। ওখানে নিয়ে বসানো হয়। কনেকে তৈরী হওয়ার জন্য পাত্র পক্ষ শাড়ী-সায়া ও অন্যান্য সামগ্রী কন্যা পক্ষের হাতে দিয়ে দেন। জলযোগের পরে দুপুর পার হলে কনে আশীর্ব্বাদের কাজ আরম্ভ হয়।

ইতিমধ্যে কনে বর ঘরের দেওয়া শাড়ী ইত্যাদি পরে তৈরী হয়েছে। তুলসী পিঁড়হার সামনে আলপনা দেওয়া হয়েছে। কুটুমের বসারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলপনার উপরে একটি গুঁড়ি মাখানো মহুল কাঠের পিঁড়হা বসানো হয়। একটি কাঁসার থালায় ধান-দূর্বা, চন্দনের বাটি, ধূপ-দীপ সাজিয়ে এবং একটি ঘটিতে জলভরে তাতে ৩/৫ টি আমপাতা যুক্ত ডাল গুঁজে জল ঢাল দিতে দিতে কনেকে তুলসীতলায় আনা হয়। অবশ্যই দুয়ারে চৌকাঠার উপর দুদিক থেকে গামছা বা কাপড় ধরা হয়। শাঁখ বাজা হয়। কনের কাকীমা অথবা দাদার বউ কনেকে কোলে করে কিম্বা হাত ধরে এনে পিঁড়ির উপর বসায়।

প্রথমে পাত্র পক্ষের বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আম ডাল ঘটিতে চুবিয়ে তিনবার জলের ছিঁটে কনের মাথায় দিবেন। তারপর চন্দনের টিপ দিয়ে তিনবার ধান-দূর্বা দিয়ে চুমাবেন। ঘটির জলে কনের ডাইনে-বামে জল ঢাল দিবেন এবং

শেষে গয়না-টাকা অথবা মিঠাই হাতে তুলে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন এবং চুমা খাবেন। সঙ্গে সঙ্গে কনে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। এমনি করে পাত্র পক্ষ ও পাত্রী পক্ষ মিলিয়ে ৫,৭,৯ বিজোড় সংখ্যায় কনেকে আশীর্ব্বাদ করা হয়। তারপর উলু দিয়ে হবু কনেকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ফিরে প্রণাম করতে আসবে।

আশীর্ব্বাদ পর্ব শেষে চলে খাসির মাংস দিয়ে ভোজ। খাওয়ান-দায়নের পর দু'পক্ষের শলা-পরামর্শ চলে "পা-ধূয়া" বা বর আশীর্ব্বাদের দিন নির্ধারণ। দিন ঠিক হলে পর বিদায়ের পালা। দু'পক্ষের বেহাই সম্বন্ধ হবে এমন লোকজন পরস্পরকে পায়ে হাত দিয়ে "গড়-লাগি" করেন। "বেহাই-বজড়" অর্থাৎ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়। সেই ফাঁকে কনের মা-কাকীরা তৈরী থাকেই পিঠে হলুদ গোলা জলের চিহ্ন দিয়ে দেন। কাপড়ে হলুদের দাগ দেখে রাস্তার অন্যান্য গ্রামের লোকজন সহজেই বুঝতে পারেন এঁরা কি অনুষ্ঠান করতে ভিন গাঁয়ে গিয়েছিলেন।

পা-ধোয়া বা বর আশীর্ব্বাদ ঃ কনে আশীর্ব্বাদের মতই নির্দিষ্ট দিনে কনে পক্ষের লোক বরঘরে আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে হাজির হন। কনে ঘরের মতই বর ঘরেও ঘর-দোর নিকানো থেকে অন্যান্য সকল কিছুই করা হয়। কুটুমকে কুলহির দুয়ারে পিঁড়ি পেড়ে পা-ধোঁয়ানো থেকে সব কিছু আপ্যায়নের কাজ করে থাকেন, সবাই সদা সতর্ক থাকেন কোনরূপ অবহেলা, কথা-বার্তায় যেন অনাহক অকথা-কুকথা না উঠে আসে। তুলসী-থানের সামনে আলপনা দেওয়া হবে। আলপনার উপর গুঁড়ি গাবিয়ে আম কাঠের পিঁড়ি বসানো হবে। জলযোগের পর আসন বিছিয়ে দিলেই কুটুম-বাটুম সবাই বসবেন। দাদা সম্পর্কীয় কেহ হবু বরকে হাত ধরে এনে পিঁড়িতে বসাবেন। কন্যা আশীর্ব্বাদের মতই চন্দন টিপ, আমডালের জলের ছিঁটা, ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করা হবে। বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হবু বরকে বালা (রূপার তৈরী) পরাবেন। এর ইঙ্গিত তোমার হাতে আমাদের এক "বালার" (কন্যার) ভারাবার দিচ্ছি। বর্তমানে বর আশীর্ব্বাদ ও বালা পরানোর চল প্রায় উঠেই গেছে।

আশীর্ব্বাদের পর ভোজের ব্যবস্থা। তারপর দু'পক্ষ বসে বিয়ের দিন নির্ধারণ করে নিবেন। মাশাড়ী কটি লাগবে? গাঁ-গরামের জন্য কত কি লাগবে? সব কিছু লেনা-দেনার কথা পাকা করে নেওয়া হবে। নেগ-নেগাচারের কি জিনিস লাগবে? গয়না-গাঁটি কি দেওয়া হবে সব ঠিক করে নেওয়া হয়। কারণ বিহার দিন যেন অযথার্থ কথা কাটা-কাটি করতে না হয়।

সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে বেহাইবজড় করে বিদায়। বেহানরা হলুদ জলের ছাপ দিতে কিন্তু ভুলবেন না। গীতও চলতে থাকে।

"ধনিকে যে মানুষ করলাম,-
কাঁচা দুধের সরে গো
এবার ধনি চল্যে যাবেক,-
মাঞ-বাপকে কাঁদায়ে গো।।"

লগন বাঁধা ঃ দুই পক্ষের পূর্ব আলোচনা সাপেক্ষে ৩, ৫, ৭ দিন বিবাহের আগে পাত্র বাড়ীতে লগন বাঁধা হয়। সেই লগন গামছায় বেঁধে কনে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হয়। গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি লগন বাঁধেন। তাঁকে "লগনলায়া" বলা হয়। লগনের সামগ্রী ৩/৫ পাই আতপ চাল, হলুদ গুঁড়া বা বাঁটা, একটি কাঁসার ডুভা (বাটি), কাচা শন, একটি রূপার টাকা, কয়েকটি হলুদ গাঁঠা, একটি গোটা সুপারী বা হরিতকি।

লগন লায়া হাতে কাচা শন পাকিয়ে যতদিনের লগন বাঁধা হবে ততগুলি গিঁট দিবেন। আতপ চাল হলুদ বাঁটা দিয়ে রাঙিয়ে রঙিন করে নেওয়া হয়। তারপর টাকা গোটা সুপারী/হরিতকি, শনের বিঁড়ি বাটিতে রেখে তুলসী থানে পিঁড়িতে বসিয়ে চুমাতে হয়। এক দিনের টিপ লগনও অনেক সময় বাঁধতে হয় অর্থাৎ যে দিন বিহা সেই দিনেই লগন। তুলসী থানের ধান-দূর্ব্বা দিয়ে চুমানোর সময় মা-মেয়ে বউয়েরা ঘিরে দাঁড়ায় ও গীত গাইতে থাকেন।

"চার কুননা পখরটিমা ফুটিলঅ শালুকঅ ফুল।
শালুক ফুলে লগন ধরাই।
কনঅ ফুলে লগন ধরাই, কনঅ ফুলে বিহা গো ?
কনঅ ফুলে হইঅত বিদাই ?
শালুক ফুলে লগন ধরাই, আকন ফুলে বিহা গো।
পলাশফুলে হয়অত বিদাই।।
বাহিরাগো বরেক আজি লগনঅ চুমাইতে গো।
লগনঅ চুমাইতে আধা রাত।।
লগনে উঠ পুতা লগনে ব'স গো।
জড়অ হাতে লেহ গুয়া পান।।"

বর ঘরে লগন চুমানোর পর ৩/৫ জন তৈরী থাকে কনে বাড়ীতে লগন পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কনে বাড়ীতে লগন না পৌঁছালে কনেকে "তেল-হলুদ" মাখানো যাবে না। যারা লগন নিয়ে যাবে আবার তাদের ফিরে আসার রেওয়াজ।

লগন কনে ঘরে পৌঁছালে সকলেই নিশ্চিন্ত। বিবাহের আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। একেবারে মোক্ষম আদান-প্রদান। কনে ঘরে লগনের জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তুলসীথানের সম্মুখে পিঁড়ির উপর একটি কাঁসার বাটি (ডুভা) রাখতে হয়। সেই বাটির ভিতরে লগনচাল সন্তর্পনে ঢেলে দিবে যাতে করে কোন শব্দ না করে। প্রবাদ আছে শব্দ করলে নব দম্পতির ঝগড়া হবে। উলু দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে ধূপ-দীপ জ্বেলে ঐ লগনকে চুমিয়ে ঘরের ভিতর সাবধানে নিয়ে রাখা হবে।

গায়ে হলুদ ঃ কনেকে তুলসীতলায় এনে তেল-হলুদ মাখানো হবে। গলায় সরষে-পড়া বেঁধে দেওয়া হবে এবং হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে কাজললতা। কনার সাথে তার বোন সম্পর্কীয় কোন মেয়েকে কাছে বসিয়ে দেওয়া হবে। সে হবে "নিত-বউ"। বিহা পার না হওয়া পর্যন্ত সর্ব্বক্ষণ সে কনের ছায়া সঙ্গী হয়ে থাকবে। কোন প্রকারেই সে কাছ ছাড়া হবে না। কোন বিশেষ কারণে যদি কিছুক্ষণের জন্যও তাকে ছাড়তেই হয় পরিবর্তে কাউকে অতি অবশ্যই সঙ্গী করে রেখে যাবে। এক পলকও সঙ্গী ব্যতিরেকে থাকবে না। অর্থাৎ কনেকে চোখে চোখে রাখতে হবে। অপর দিকে বরঘরে বরকেও তাই করা হবে। তারও সঙ্গে থাকবে ভাই সম্পর্কের "নিতবর"। উভয় বাড়ীতেই দাদার বউ হলুদ বাঁটবে এবং সেই কনে/বরের অষ্টঅঙ্গে প্রথম হলুদ লেপন করবে। সেই হবে "বাহির ভিতরি"। গায়ে হলুদ পড়তে পড়তে কনের মনে চিত্ত বৈকল্য দেখা দেয়। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এক ভাবের আবেশে ডুবে যায়। এই পরিচিত ঘর-দোর, সঙ্গী-সাথী, বাপ-মাঞ, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আপনজন সকলকে ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। একটি সাঁওতালি বিহা গীতি এই বিষয়ে উল্লেখ করছি।

"সুনুম সাসাং পে অজঃ কেদিঞ।
ভিতর বলন পে খানা কেদিঞ।।
দেন আয়ু জাড়ি-জুতি।
ডুলৌ পাড়ন রিঞ ফাঁসি গজুঃ।।"

বঙ্গানুবাদ ঃ

"তেল-হলুদ মাখাল।
ভিতরে ঢুকতে মানা করল।।
দে-মা এক টুকরা দড়ি।
পিড়ীতে ঠেস্ দিয়ে ফাঁসি দিয়ে মরি।।

তেল-হলুদ মাখা ও সারুয়া মুড়ি ঃ বাড়ীর লোকেই তেল-হলুদ মাখালেই অনুষ্ঠান শেষ হয় না। বিহা যেহেতু সামাজিক অনুষ্ঠান সেই জন্য সমাজের গুষ্টি-ভায়াদ, পাড়া-পড়শি, ফুল-পরান ও অন্যান্য বাড়ীর মহিলাদের উভয় পক্ষেরই (বর/কনে) ঘরের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সন্ধ্যায় তেল-হলুদ মাখাবার জন্য ডাকতে হয়।

মা-বোন-মেয়ে সকলে সন্ধেয় হাজির হবেন। এই "তেল-হলুদ" মাখা অনুষ্ঠান একান্ত ভাবেই মহিলা বা নারী-সমাজের। এখানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার নেই। উভয় বাড়ীতেই বর/কনেকে তাঁরা নিজস্ব হেপাজতে নিয়ে নেন। কনে ও বরকে তেল-হলুদ মাখাতে মাখাতে হাসি-মস্করা, নাচে-গীতে মেতে ওঠেন। এক নষ্টালজিয়ার আবহাওয়া তৈরী করেন। এখানে অনেক সময় বাঁধনহারা হয়ে পড়েন। নাচ-গীতের পর বাড়ী ফিরে যেতে যেতে সকলের আঁচলে "টুপায়" মেপে মেপে মুড়ি দেওয়ার রীতি আছে। এই মুড়ি দেওয়াকে "সারুয়া মুড়ি" দেওয়া বলে। মনে হয় বহুপূর্বে টুপা বা বাটির পরিবর্তে মাটির সারুয়ায় মুড়ি মাপ করা হত।

"রাঙি ধানেক খৈ আজা গাঁঠিএঃ বাঁধি লিহা হো।
শতলী বাজারে অজা হলদি মালাই গো।।
সেহ হরদি আজা কনে পিসতা গো।
সেহ হরদি আজা কনে মাখতা গো।।
সেহ হরদি আজা ভৌউজি পিসতি গো।
সেহ হরদি আজা বাবুই/মুনুই মাখতা গো।"
"কঠা ঘরের দুয়ারে বাবুর/মুনুর মাএঃ কিসের বাতি জ্বলে?
আমদে বাবুই/মুনুই হল্যদ মাখে ঘিয়ের বাতি জ্বলে।।"

নিমন্ত্রণ ঃ বিবাহ একক পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়। সামাজিক অনুষ্ঠান। সেইজন্য ভাই-ভায়াদ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, ফুল-পরান, হিত-মিতান সকলকেই নিমন্ত্রণ করে আনতে হয়। না ডাকলে না নিমন্ত্রণ করলে কেউ কিন্তু আসবে না। এখানে সম্মান ও মান-মর্য্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আত্মীয়তার মানের ক্ষেত্রে কিন্তু সকলই সমান। লগনের দিন থেকেই নিমন্ত্রণ দেওয়া আরম্ভ করা হয়। "টিপ লগন" এক দিনের লগন হলে আগেই নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়।

একটি ছোট হাঁড়িতে "হাঁড়িকায়" হলুদ গাবা চাল ভরে, মুখে শালপাতার

পতরি এবং তা দড়ি দিয়ে এক বিশেষ কায়দায় বাঁধতে হবে যাতে হাতে ধরে সহজেই বহন করা যায় এবং কোন প্রকারেই খুলে না যায়। সঙ্গে নিবে গোটা সুপারী বা হরিতকী ফল। নিমন্ত্রণ দিতে যাওয়া ব্যক্তি কোন আত্মীয় বাড়ী পৌঁছলেই হাত-পা-মুখ ধুতে জলঘটি দিবে। এই সামাজিক চল। কুটুমকে পা-ধোয়ার জলঘটি না দিলে অবজ্ঞা করা হয়। পা-ধুয়ে বসে পর আত্মীয় বাড়ীর লোককে বলা হবে — "এক ঘটি জল আনঅ।" হাতে 'হাড়িকা' ঝোলা কুটুম দেখলেই সকলে বুঝে যায় নিশ্চয় কারো বিবাহ হবে। নিমন্ত্রণ দিতে এসেছে। ঘটিতে গোটা সুপারী হরিতকী ফেলে দিয়ে বলবে — "অমুক গাঁয়ের অমুক লোকের ব্যাটার সঙ্গে অমুক গাঁয়ের অমুক লোকের অমুক তারিখে বিটির বিহা। তুমাদের হাঁড়ি নিমন্ত্রণ।" এই কথা বলার বাদে হাঁড়ির পতরি ফুটো করে চাল বার করে আঙিনায় ছড়িয়ে দিবে। পরদিন পর্যন্ত অর্থাৎ আঙিনায় পুনরায় ঝাঁট না পড়া পর্যন্ত যে কেউ বাড়ীতে এলেই বুঝে যাবেন; এই পরিবারকে কোন বিহাঘরে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

বহনই (ভগ্নিপতি) কুড়মি বিবাহ ঘরের পরিচালক। সেই জন্য বহনই এর মান বড়। সেই আবার "বরের বাগাল" আবার কাঁখনা বাঁধার কাজ তারই। সেইজন্য তাকে বলা হয় "কাঁখনা লাইয়া"। বহনইকে জোড়া সুপারী দিয়ে নিমন্ত্রণ জানাতে হয়। একটি তাদের পরিবারের জন্য, অপরটি তার ব্যক্তিগত। বর্তমানে বেশীরভাগ লোকেই বিহার কার্ড ছাপছেন।

"বিহা বিহা শুনি আমরা কবে, মুনুর/বাবুর বিহা গো ?
মুনুর / বাবুর মামাঘরে নাই পাল্য গুয়া গো।।
গুয়াযদি পাল্য মামিয়ে খাঁড়া-খুঁসা শুয়া গো।
খাঁড়া গুয়া পায়েঁ মামীর মনঅ হল্য গসা গো।।"

কুড়মি জাতির লোকেরা "প্রকৃতি পূজক" "নেগাচারী" অর্থাৎ বামপন্থায় বিশ্বাসী। বর্তমানের তথাকথিত নকল বামপন্থা নহে। বিশ্ব প্রকৃতির বামপন্থা নীতি এঁদের। বাম অর্থাৎ নেগা। দুর্বলকে সঙ্গী করে চলার পন্থা এবং এঁদের আচার ইঙ্গিত বাহি। ইঙ্গিতেই একটা বড় বিষয়কে সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ।

গনা দিন শেষ হয়। বিবাহের দিন এসে যায়। উভয় পক্ষের বাড়ীতেই সাজঅ সাজঅ ভাব। ব্যস্ততম দিন। এক নজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে কি কি কাজ ও ঘটনা ঘটছে। প্রধান বিষয়গুলি এমন; —

বিহাঘর

বরঘরে অনুষ্ঠান	কনে ঘরে অনুষ্ঠান
১। ঘর দুয়ার (লরা-লাপটা)	১। ঘর-দুয়ার (ঘর-দোর গোবর জল দিয়ে নিকানো)
২। ছামড়া বাঁধা	২। ছামড়া বাঁধা
৩। বনমালা টাঙ্গা	৩। বনমালা টাঙ্গা
৪। বড়িপাড়া (পিড়হি পাড়া)	৪। বড়ি পারা (পিড়হি পাড়া)
৫। আমডাল গাড়া	৫। মহুল ডাল গাড়া
৬। মাড়ুয়া পূজা	৬। মাড়ুয়া পূজা
৭। বর সিনান	৭। কনে সিনান
৮। থুভড়া ভাত খাওয়া	৮। থুভড়া ভাত খাওয়া
৯। সাজনি সাজা	৯। মহুল বিহা
১০। আম বিহা	১০। সিঁদুর দান ও অন্যান্য
১১। মু-দেখা (গুড় খাওয়া)	১১। বাঁদানি চুমান
১২। বাঁদানি চুমান	১২। ঘর ভরা
১৩। বর-কনে সিনান	১৩। সঙ ছাড়া (বিদায়)
১৪। ঘুর-ফের্	

প্রধান বিষয়গুলি একটু আলোকপাত করা যেতে পারে। যেমন —

ছামড়া বাঁধা ঃ কনে-বর উভয় পক্ষের বাড়ীর আঙ্গিনায় তুলসী পিঁড়হাকে মধ্যিখানে রেখে চার কোনে চারটি খুঁটি পুঁতা হবে। বর্গাকৃতি আকারে শাল অভাবে বাঁশ আড়া-আড়ি ভাবে দিতে হবে। যাতে করে জাম ডাল দিয়ে ছাউনি করার সময় পড়ে না যায়। জাম ডাল দিয়ে ছাউনি করার পর, ছাউনির চারপাশে আমপাতার বনমালা তৈরী করে চারদিকে বেড় দিয়ে দিতে হবে। নীচে চার খুঁটির এক খুঁটি থেকে আর এক খুঁটি বরাবর মাটির ছোট আইল বেঁধে দেওয়া হবে। যারা ছামড়া বাঁধবে তারা পাওনা হিসাবে এক পটলা বাতাসা পাবে এবং তাদের ভাত খাওয়াতে হবে।

বড়ি (পিড়হি) পাড়া ঃ কনে-বরের দাদার বউ বড়ি (পিড়হি) পাড়বে। তাকে "পিড়হি সুসারি" বলা হয়। বিরি-কলায় ভিজিয়ে ভালভাবে বেঁটে বাঁশের ছাতার উপরে বড়ি দিতে হয়। ছাতার মাথার মধ্যিখানে অপেক্ষাকৃত বড়

আকারের দুইটি বড়ি তৈরী করা হয়। সেই বড়ির মাথায় এক এক গুচ্ছ দুর্ব্বাঘাস গুঁজে দেওয়া হবে এবং তিনটি করে সিঁদুর দাগ কেটে দিতে হবে। ঐ দুটি বুঢ়াবাপ ও মহামাঞের প্রতীক। তারপর পূর্ব পুরুষদের স্মরণ করে ছোট ছোট আকারের অনেকগুলি বড়ি পাড়তে হয়। ছাতার বাঁট খুলে অতি সন্তর্পনে ছামড়ার উপর তুলে দিতে হবে।

ধরম পূজা ঃ কুড়মি সমাজের প্রথা আছে ছেলে/মেয়ের বিবাহের পূর্বে ধর্ম-পূজা (ধরম পূজা) (সূর্য পূজা) অতি অবশ্যই সেরে নিতে হয়। এই পূজা না হলে বিবাহ দেওয়া চলে না। পাত্র/পাত্রী যোগ্য হওয়ার পূর্বেই এই কাজ সমাধা করে রাখেন। যদি কোন কারণে না হয়ে থাকে তা হলে বিবাহের দিন ভোরে ঐ পূজা সাঙ্গ করে নিতে হয়। বংশের বড় তাঁদেরকেই পূজার কাজ করতে হয়।

মাড়ুয়া পূজা ঃ মাড়ুয়া পূজা পূর্ব্বপুরুষের পূজা। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁদের স্মরণ, স্থাপন ও অনুমতি নেওয়া হয়। যাতে করে কোরূপ অঘটন বা বিঘ্ন না ঘটে। বরঘরে আমডাল ও কনে ঘরে মহুলডাল গাড়া হয়। প্রথমে আম/মহুল ডাল কেটে আনা হবে। তুলসী থানের বামপাশে গর্ত খুঁড়তে হবে। গর্তের ভিতরে লৌহা, তামার টুকরা, হরিতকি, গটাসুপারী, হলুদ গাঁঠা, আতপ চাল, দূর্ব্বাঘাস দিয়ে দিতে হবে এবং তারপর ডাল গাড়া হবে। ঐ কাজ বহনই সমাধা করবে। এরপর ডালের গোড়ায় তিনপাক বড় (খড়ের তৈরী বেড়) দিতে হবে।

পিড়হিসুসারি ঐ বড়ের উপরে ডালসহ চন্দন গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল ও তেল-হলুদলেপন করে দিবে। পিড়হি লায়া (বংশের বড়) স্নান করে ভিজে কাপড়ে এসে পূজায় বসবেন। ধূপ-দীপ, পূজা সামগ্রী তৈরী থাকে। লায়া প্রথমে আম/মহুল বড়ের উপরে চন্দন, সিঁদুর ও কাজলের দাগ দিবেন। মাটিতে গুঁড়ির খঁড় তৈরী করবেন। খঁড়ের প্রতি ঘরে সিঁদুরের দাগ দিবেন। তাতে তুলসী পাতা রেখে ভোগ দিবেন। তারপর পাঁঠি ছাগল অথবা কাটুল মুরগী বলি দিবেন। পাঁঠি ছাগল ও মুরগীকে উর্বরতার প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। সবশেষে দুধ ঢাল ও জল ঢাল দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে পূর্ব পুরুষদের, আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে পূজা সাঙ্গ করেন। পিড়হি লায়া নির্জলা উপবাসে থাকেন। সেইজন্য অতি তাড়াতাড়ি তাঁর জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময়ই তাঁকে প্রণাম করে তাঁরও আশীর্ব্বাদ নেওয়া হয়।

থুভড়া ভাত ঃ বিবাহের দিন বর-কনের বাপের বাড়ীর খাবার খাওয়া বারণ। আত্মীয়-স্বজন ঐ দিন বর-কনেকে খাবার খাওয়াবেন। মামাঘরের খাবার প্রথমে খাওয়ানো হয়। তবে অন্যান্য খাবার দেওয়ার কোন বিধি নিষেধ নেই। এই অনুষ্ঠানটিকে "থুভড়া ভাত খাওয়া" বলা হয়। যে খাবার খাওয়াবে সে বর-কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে তেল-হলুদ মাখাবে। গলায় আকন ফুলের মালা পরিয়ে দেবে এবং বর হলে ধুতি ও কনে হলে শাড়ি দিবে সঙ্গে টাকা-পয়সা হাতে গুঁজে দিবে। সর্ব্বশেষে কোলে বসিয়ে চুমা খাবে। এই কাপড় ও টাকা দেওয়াকে "ভাত-খাওকি" বলা হয়। গাঁয়ে-ঘরের গুষ্টি-ভয়াদরা তাঁদের বাড়ীতেও ডেকে নিয়ে যান থুভড়া ভাত খাওয়ানোর জন্য।

সাজনি সাজা ঃ ইতিমধ্যেই আত্মীয়-স্বজন এসে গেছেন। বাজনদার বাজ-বাজনা পাল্কি-গাড়ী তৈরী হয়ে যাবে। বৈরাত বর-যাত্রী হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। তাদের "বৈরাত-ভোজ" দেওয়ার জন্য ব্যস্ততা, ঠিক ঐ সময় পারঙ্গম বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা ছামড়া তলায় বসে যান সাজনি সাজতে। তাঁরা দেখে নিবেন প্রতি নেগে নেগে যা যা জিনিস লাগে তা ঠিক ঠাক নেওয়া হয়েছে কিনা। ভুল-চুক হয়ে গেলে তাঁদেরকেই কথা শুনতে হবে। প্রথমেই দেখে নেওয়া হবেকনের সাজ (শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ, পাতখাড়ু (পিতলের তৈরী পাতলা চুড়ি) গয়না-গাটি, আইশাড়ি, ধাইশাড়ি, মাইশাড়ি(যতগুলি বলা আছে), দইচুকা, মাছের চুকা, সিঁদুর (৩) কাচাশন, লাটাই, পানখিলি (৬), আকন ফুলের মালা (২) সিনই, মোড়ধান, বাতাসা তিনহাঁড়ি, গুড় পটলা (৪), সিরিবারি, চুমানডালা, সার-ভারের ডালা (তাতে থাকবে কনের জন্মের পরে 'লওা পর্যন্ত যা কিছু জিনিস লেগেছিল তা শোধ দেওয়ার জন্য ধান খৈ, কুত্থিভাজা, চিঁড়ে ভাজা, ঘি, রসুন, গাবফল, পানপাতা, ছাগল-নাদাড়ি, ইঁদুর মাটি, হলুদগুঁড়া, সরিষার তেল, চোখপুরার জন্য গুঁড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। পানখিলি, আকনফুলের মালা, সিনই সিদুঁরপটলা ঐ খানেই জামাইয়ের জিম্মায় রেখে দেওয়া হয়। ঠিক সময়ে যোগান দেওয়ার দায়িত্ব তারই। গয়না ও অন্যান্য সিঁদুরপুরঙ্গ থাকবে বর কর্তার দায়িত্বে এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের ভার দেওয়া হবে তৎপর কোন আত্মীয়ের হাতে। সিরিবারিতে জল ভরা হবে। তার উপর চারদিক মুখওয়ালা প্রতীপ বসানো হবে এবং ঐ প্রদীপে বিরিকলায় দিয়ে তেলভর্তি করা হবে। সন্ধ্যায় নাপিত এসে ছামড়াতলে বরের নখ কেটে রঙ পরিয়ে দেবে। বহনই কোদাল দিয়ে একটি চারকোনা প্রতীকি পুকুর কাটবে। বরকে জোঁয়ালের উপর বসিয়ে বরের মাথায় শালপাতার পতরি ঢাকনা দিয়ে ঘটির জলে স্নান করাবে। ওখানেই

মামাবাড়ীর দেওয়া নূতন-ধুতি-জামা পরবে। বরকে চন্দনের ফোঁটা সিঁদুরের ফোঁটা, কাজল পরিয়ে, মাথায় মৌড় (টোপর) পরিয়ে গলায় মখমলের উড়নি দেওয়া হয়। তারপার কোলে করে বার করা হয়। বরের আর ঘরে ঢুকা বারণ। সানাই, ঢোল, চেড়পেটি বাজনা বাজতে থাকে এ যেন যুদ্ধ যাত্রার প্রতীক। হাতে থাকবে জাঁতি।

আম বিহা ঃ বাজ-বাজনা সহযোগে বরকে কোলে তুলে নিয়ে একটি প্রাচীন আমগাছের তলায় নিয়ে যাওয়া হবে। ঐ সময় মা-বোনেদের গীত তুঙ্গে উঠে। গাছটি অবশ্যই ফলন্তি গাছ হতে হবে। আম গাছটির গোড়ায় প্রথমে গুঁড়ি, কাজল ও সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয়। বর গাছটিকে আলিঙ্গন করে। এই অনুষ্ঠানটিকে আমবিহা বলা হয়। বহনই (কাঁখনা লায়া) আমগাছের গোড়ায় লাটাই জড়ানো কাঁচা সূতা ৩ (তিন) পাক বেড় দেয়। তিন পাক হয়ে গেলে বরকে সূতার খেই চেপে ধরতে বলা হয়। ঐ সূতা তারপর বরের কানে ও বামপায়ের কড়ে আঙ্গুলের ফাঁক গলিয়ে তিন পাক বেড় দেওয়া হয়। বরের কান ও কড়ে আঙ্গুলের সূতা নিয়ে আম গাছ থেকে আম পাতা পেড়ে ঐ পাতার ভিতরে আতপ চাল, একটি হল্যদ গাঁঠা, তিনটি দূর্বা ঘাস দিয়ে মুড়ে নিয়ে বরের কব্জিতে বহনই বেঁধে দেয়। এইটিকে কাঁকন বা কাঁখনা বলা হয়। মঙ্গল কামনা, প্রজনন ক্ষমতা প্রার্থনা, সন্তান প্রাপ্তি, বৃক্ষপূজা, বৃক্ষরক্ষা, গোষ্ঠীর মেলবন্ধন এই আচার পালনের মূল উদ্দেশ্য। এই সময় রঙ্গ-রসিকতা, হাসি-ঠাট্টা ও অন্যান্য গীতও গাওয়া হয়।

"চাঁড়ে কাঁকন বাঁধ বহনই চাঁড়ে খাতে দিব।
কাট্যেছি পূঁয়ালের ছানি গো বহনই সেই খাতে দিব।।
কাঁকন বাঁধা লকটি কন্ গাঁয়ের বঠে ?
উত্তর-দক্ষিণ পূরব-পশ্চিম গো মা আমডিহার বঠে।।"

আমলঅ কাওয়া ঃ এই সময় আম তলায় এক অদ্ভুত স্ত্রী আচার পালন করা হয়। আম গাছ থেকে কচি আম পাতা পেড়ে, পাতার বোঁটা ছিঁড়ে বরকে চিবুতে দেওয়া হয়। তারপর তার মুখের অম্লরস পিসী-মাসী, কাকী-জেঠি, মামী, ঠাকুরমা, মা বরকে কোলে নিয়ে কোলে বসিয়ে হাতে নিয়ে ঐ রস একে একে পান করেন এবং মুখ চুম্বন করেন। একে "আমলঅ খাওয়া" বলা হয়।

"আম গাছে তিন খেই সূতা আম গাছকে সাজ্যেছে।
সোভাগিনী সদর মাসী আমলঅ খাতে বস্যেছে।।"

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচার। যাঁরা আমলঅ খান তাঁরা সারাদিন উপবাস করে থাকেন। অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট আবেগধর্মী। প্রায়শইঃ চিত্তবেদনার প্রকাশ ঘটে। মা-মাসী-পিসীদের চোখ সজল হয়ে ওঠে। সব শেষে মা ছেলেকে কোলে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন "কথা যাচ্ছিস্ বাপ ?" ছেলে বলবে ; "কামিন আনতে যাচ্ছি"। মা ছেলের উত্তরীয়ের খুঁটে অশুভনাশক মন্ত্রপূত সরিষা বেঁধে দেন। আমলঅ খাওয়ার গোপন উদ্দেশ্য, গোষ্ঠীবদ্ধ রাখা, বিবাদনাশক, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, কোমল প্রবৃত্তির জাগরণ, অহংকার নাশ, গোপনীয়তা রোধ এবং দুরারোগ্য ব্যাধিহীন তার প্রশংসা পত্র প্রদান ইত্যাদি ইত্যাদি। বরযাত্রী সহযোগে বাজ-বাজনা নিয়ে যখন বর পালকিতে বা গাড়ীতে চড়তে যাবে সেই সময় এক দিকে হৈ-হুল্লোড় ও স্ফূর্তি চলে, তেমনি অপর দিকে চলে এক অনির্বচনীয় ভাবাবেগের আবেগ। তাতে যে সুর ফুটে ওঠে তাতে কেবল মাত্র একটি সমাজেরই নয় মানব মনের শাশ্বত ভাব পরিস্ফুট হয়। বাৎসল্য রসের একে আবেগঘন প্রস্রবন প্রবাহিত হয়। জনক-জননীর গভীর স্নেহ, মান অভিমানের প্রকাশ ঘটে তাতে এর আবেদন বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে।

"লক-লস্কর নিয়ে পূতা কাঁহাকে চলিলি রে ?
পূতা দিয়েঁ যারে দুধে কেরি ধার রে।
কিআ যে দেবোঁ মাঞগো দুধেকেরি ধার গো ?
মাঞগো আনি দেবোঁ জনমেক কামিনী গো।।"

ছেলে পাল্কিতে বা গাড়িতে উঠে বসে। মায়ের মন এক অনিশ্চয়তার দীর্ঘশ্বাসে ভরে ওঠে। মা-বোনেরা গাইতে থাকে —

"এই পথে দেখেছ যাতে শিশুরাজাকে গো।
হাথে আছে সনার যাঁতি হলুদ বরণ গো।।
এই পথে দেখেছ যাতে বর বাবুকে গো ?
হাতে আছে কাঁকন বাঁধা চন্দনের ফঁটা গো।।"

অতঃপর বর বরযাত্রী পাত্রীপক্ষের গাঁয়ের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। কুলহিমুড়ায় বর গ্রামের দেব-দেবীর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ কামনায় তাঁদের উদ্দেশ্যে মাটির উপর তিনবার সিঁদুর ফেলে দেয়। এই অনুষ্ঠানটিকে "খুঁট-খাঁট" বলা হয়। বরযাত্রীরা যখন এই কাজ করে তখন কনেপক্ষ বাজনা সহযোগে গ্রামের প্রান্তে চলে আসে। দুই পক্ষের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়। কথার বাদানুবাদ ও যুদ্ধ নৃত্যের মহড়া চলে। অবশেষে বরপক্ষের জয় হয়। এই যুদ্ধ নৃত্য বর্তমানে লুপ্ত।

বর-বরযাত্রী আনন্দ উল্লাস করতে করতে কন্যাপক্ষের দুয়ারে এসে

পৌঁছায়। সেই সময় কনে ঘরের মেয়ে বউয়েরা বরযাত্রীর উদ্দেশ্যে রঙ্গ-বিদ্রুপের, হাসি মস্করার গীত গাইতে থাকে।

"পায়রার লাগ্যে ফ্যাঁস আড়্যেছিগো ; -
লাগ্যে গেলা বরের সোদর বাপ।
বরের বাপ বল্যে চিনতে লারি গো
মারে দিলি খাঁড়িয়া-ফাভড়।।"

গুয়া টিকা ঃ বর-বরযাত্রী দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। বর তখনও গাড়ী-পাল্কির উপরে। কনের আজা (ঠাকুরদা) মাথায় একটি চন্দন গোলা বাটি (যা নূতন কাপড়ে ঢাকা দেওয়া থাকবে) এনে, ঐ চন্দনে গোটা সুপারী ডুবিয়ে তিনবার বরের কপালে টিপ দিয়ে দিবেন। মা-বোনেরা শাঁখ বাজাবে। উলু দিবে এবং পুরুষেরা তিনবার, — "হরি হরি বলঅ-। বল হরি।।" ধ্বনি দিবেন। অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় "গুয়া টিকা"। উদ্দেশ্য আশীর্ব্বাদ দান ও অনুমতি প্রদান।

ছামানি লাড়া ঃ আমপাতা ডোবানো দুইটি জল পূর্ণ মাটির ভাঁড় কনের দাদা বা ভাই সম্পর্কের দুই জন লোক মাথায় করে, নূতন ধুতি ঢাকা নিয়ে এসে দাঁড়াবে। বর পালকি থেকে নেমে এসে মাথায় রাখা ভাঁড় দুটিতে তিনটি করে সিঁদুরের দাগ এঁকে দিবে। যে দুই জন মাথায় ভাঁড় নিয়ে আসবে তাদের মধ্যে একজন কনের বাবার বংশের হতে হবে অন্যজন মামাতুতো, মাসতুতো কিম্বা পিসতুতো দাদা/ভাই সম্পর্কের হতে হবে। বর ভাঁড়ের আমপাতা ডুবিয়ে প্রতি জনকে তিন তিনবার করে জল ছিঁটোবে। অনুরূপভাবে কনের ভাইরাও বরের গায়ে মাথায় তিনবার জল ছিঁটোবে। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় "ছামনি লাড়া"। উদ্দেশ্য বরের শ্বশুরকুল ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের কুলকে আমি বরণ করলাম ও মেনে নিলাম তারই ইঙ্গিত। অপর দিকে আত্মীয়-স্বজন ও শ্বশুর কুলও বরকে বরণ করে নিল। ইতিপূর্বে বাড়ীর মূল গৃহকর্তা আজার অনুমতিও পাওয়া গেছে। কারো মনে দুই গোষ্ঠীর মিলনে আর এতটুকু বাধা-বিপত্তি নাই। মনোমালিন্য নাই, কোন দ্বন্ধ নাই। অতএব এরপর বরকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া যেতেই পারে।

চোখ-পুরা ঃ আদিবাসী সমাজে নারী জাতির স্থান অত্যন্ত মর্যাদার। কোথাও পুরুষের সমান সমান আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গৌরবের। সামাজিক ভাবে কোথায় হীন বা ছোট করে দেখে না। কুড়মি সমাজেও ব্যতিক্রম নয়। বাঁদনায় জাওয়া-করম, ডালপূজা, টুসু ও রহিনে নারী সমাজের স্থান ঊর্ধে।

পুরুষের চাইতে বেশী, কম তো নয়েই। যাই হোক, আসা যাক বিহাঘরে। কুটুম-জন, বরযাত্রী ছামড়া তলকে ঘিরে সকলেই আসন পেতে বসে পড়েছেন। এরপর বিহার মূলপর্বে আসবে। প্রথমেই চোখপুরার নেগ বা কাজ। কনের পিসীমা বর ঘরের পাঠানো গুঁড়ি জামবাটিতে গুলেনিয়ে আসবেন চোখ পুরতে। তিনি ছামড়াতলে তুলসী পিঁড়হার সামনে চোখ পুরবেন। চোখ পুরা না হলে বিহার কাজ আরম্ভ হবে না। যে স্থানে তিনি চোখ পুরবেন সেই টুকু স্থানেই সমস্ত কাজ হবে। চোখপুরা কাজে পাত্র পক্ষের কাছ থেকে মূল্য অর্থাৎ টাকা পাবেন। যদি ঐ বাড়ীর আর কোন ভাইঝি অবিবাহিত না থাকে তাহলে পাত্রপক্ষের দেয় সব টাকা তিনি নিবেন। আর যদি কন্যা থেকে থাকে তাহলে অর্দ্ধেক মূল্য ফেরৎ দিয়ে দেবেন। কারণ এই জায়গা তাঁর শ্বশুর তার পিসিমার কাছ থেকে কিনে দিয়েছিলেন। এখন তিনি তার ভাইঝিকে দিলেন (পূর্ণ বা আংশিক) ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য অনুষ্ঠান করার (ঐ স্থানে) অনুমতি প্রদান।

লগন উভড়া বা বাটি বদল ঃ ছামড়াতলে পিঁড়ি বিছিয়ে বরকর্তা ও কন্যাকর্তা পাগড়ি বেঁধে পরস্পর মুখো-মুখি বসবেন। কনেকর্তা বরঘর থেকে পাঠানো লগন চাল একটি কাঁসার জামবাটিতে নিয়ে আসেন। ঐ বাটিটি তিনবার অদল-বদল করবেন। শেষে কনেকর্তা দুই হাতে ধরা বাটি অতি সাবধানে বরকর্তার গামছায় উপুড় করে ঢালার সময় যেন কোন শব্দ না হয়। বিশ্বাস, শব্দ হলে নব-দম্পতির ঝগড়া -ঝাঁটি হবে। কন্যাকর্তা বরকর্তাকে লগন চাউল পরখ করে দেখে নিতে বলবেন। তিনি তা দেখে নেবেন। দেখবেন লগনের গাঁইট খোলা হয়েছে কিনা। রূপার টাকা, গোটা সুপারী ঠিক আছে কিনা। গাঁইট খোলা হলে বুঝবেন লগনের কাজ ঠিক ঠিক করা হয়েছে। বাটি বদল হয়ে গেলে দুই বিহাই বা কর্তা বেহাই বজড় করবেন অর্থাৎ পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবেন। কোন অনুষ্ঠানই মন্ত্রহীন হবে না। প্রতি নেগে নেগে আচার প্রতিপালন করার সময় উপস্থিত সকলে একই সুরে একই তালে জোর কণ্ঠে বলবেন — "হরি-হরি -বলঅ। বল-হরি।।" তিন তিন বার ঐ ধ্বনি দিবেন। 'হরি' অর্থাৎ সবুজ। হে সবুজ নবদম্পতিকে তুমি সবুজ করে রাখ।" এই কামনা করা হয়। বাটি বদল অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত ;- বরকর্তা-কনেকর্তা পাঁচ কুটুমের সাক্ষাতে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন এখন থেকে তাঁরা দুই পরিবারের সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ সবই ভাগা-ভাগি করে নিবেন। পারস্পরিক সহায়ক হবেন। এমনকি মাড়-জলের অভাব বা সংকট দেখা দিলেও ভাগাভাগি করে খাবেন।

"আনগো গিলাসের জল চিনব বরের কাকাকে।
কি কি সাজন সাজ্যেছে বেটার বিহাতে।"

সনা-পিতল ঃ কনের সাজ আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। ঘর ভিতরে কনে, কনে শাড়ি-সেমিজ পরে তৈরী হয়েছে। "বাহিরভিতরি" কনেকে কোলে তুলে ছামড়াতলে নিয়ে আসবে। ঘড়ির কাঁটা ঘোরার বিপরীতে হালপুহ্নার মতো আড়হাই পাক ঘুরিয়ে কনেকে কোল থেকে নামাবে। "নিতবউ" কাঁখে চুখান কুলা (কুলায় ধূপ-দীপ, ধানদূর্বা, আতপ চাল, গুঁড়ি-গোবর নাড়ু থাকবে) হাতে জলপূর্ণ ঘটি তাতে আমপল্লব দেওয়া থাকবে। সে জল ঢাল দিতে দিতে আগে আগে ঘুরবে।

কনেকে পূবমুখে পিঁড়ির উপর বসানো হবে। পিঁড়িটি অবশ্যই গুঁড়ি দিয়ে গাবানো থাকবে এবং মহুল কাঠের হবে। বরকর্তা কনের সামনা সামনি বসবেন। প্রথমে পাতখাড়ু বার করে প্রদীপের শীষে ছুইয়ে মাটিতে ঠেকিয়ে কনের কপালে ছোঁয়াবেন। তিনবার এইরূপ করবেন। প্রতিবারেই উপস্থিত সকলে ধ্বনি দিবেন ;

"হরি হরি বলঅ-। বল হরি।"

অনুরূপভাবে সোনা ও রূপার গয়না থাকলে একই রকম করবেন।

"ইপিঁড়হাই উ পিঁড়হাই খেলি বাবা;
না-নঅ আমকে বিকঅ গো।
আমি যে ছিলি বাবা
মাঝ্যাঘরের শোভা গো।।"

"একই মাঝ্যায় জনম বাবা
ভাইঅ-বহিনঅ গো।
ভাইয়ের জন্যে ঘর-বাড়ী বাবা
আমার লাগ্যে পরের ঘর গো।"

দৈ-চুকা-মাছের ভাঁড় ঃ হৈ-হুল্লোড় কমে আসতে থাকে। একটি সকরুণ বাতাবরণ তৈরী হতে থাকে। কনেকে গয়না পরানো হলে পর বরঘর থেকে আনা "দৈ-চুকা" ও "চেং মাছের ভাঁড়" বরকর্তা কনের কপালে ঠেকাবেন। প্রতিটি তিনবার করে ঠেকাবেন। প্রতিবারই হরিধ্বনি দেওয়া হবে। চেং মাছ বীজের ও দৈ ধারণ ক্ষমতার প্রতীক। ইঙ্গিত প্রজনন ও সন্তান প্রাপ্তির আচার বা প্রার্থনা।

মহুলবিহা ঃ বরের ক্ষেত্রে যেমন আমবিহা হয়ে গেছে। কনের ক্ষেত্রে "মহুলবিহা"। আম বিহার মতোই অনুরূপ অনুষ্ঠান। মহুল গাছের সঙ্গে কনের বিবাহ। কাঁকন বাঁধা, আমলত্র খাওয়া সবই প্রায় একই অনুষ্ঠান। দীর্ঘজীবন, শুভকামনা, সন্তানপ্রাপ্তি অনুষ্ঠানটির কামনা বা ইঙ্গিত। মা-মাসী-পিসীর চোখ জলে ভরে যায়।চিত্ত বৈকল্য দেখা দেয়। অধিকার হারানোর ব্যাথায় প্রাণ-মন ব্যাথাতুর হয়ে ওঠে।

কনের মন অজানা আশংকায় অভিমানে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

"জাতি জাতি জাতি মাঞগো;
গুচাঞ দেলে হামর জাতি।
মাঞ শাড়হির লভে মাঞ গো
গুচাঞ দেলে হামর জাতি।"

"মহুল তলে মহুল খঁচে ঝবরলি
ছিলি ধনি মাঞয়ের ভারি।
ছিলি ধনি বাপের ভারি গো।।"

শালাধুতি লুটা ঃ মা-মাসীরা কনেকে তুলে মহুলতল থেকে ঘরে নিয়ে আসবেন। ছামড়াতলে আবার অনুষ্ঠান শুরু হবে। বর মাথায় মৌড় পরে, কনের ভাই পাগড়ি বেঁধে নিজ নিজ বহনই (ভগ্নপতির) এর কাঁধে চড়ে মুখো-মুখি দাঁড়াবে। এ যেন বোনের শেষ প্রহরীর সঙ্গে বরের শেষ বোঝাপড়া। প্রথমে তিনবার আমপল্লব পরস্পর আদান-প্রদান করবে, শেষে বরের ভাই হবু ভগ্নিপতির হাতে আমপল্লব তুলে দিবে। পরে একে অন্যের সাথে মিষ্টি ও পানখিলি মুখে গুঁজে দিবে। বর শ্যালকের কাঁধে নূতন ধুতি জড়িয়ে দিবে এবং পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে।

সিঁদুরদান ঃ 'বাহিরভিতরি' এবার কনেকে ছামড়াতলে নিয়ে আসবে না। বরযাত্রীদের পক্ষ থেকেই তিন/পাঁচজন লোক ঘরের ভিতর থেকে কনেকে খুঁজে "দৌড়াডালায়" বসিয়ে ছামড়াতলায় নিয়ে আসবে। বরের ভাই সম্পর্কীয় লোকেই ঐ সময় কনে বার করতে যায়।

"শাড়ি দিলি সায়া দিলি বাবা ; -
সকলেই সাধ পুরালি।
এক খড়িকা সিঁদুরের লাগ্যে বাবা
পরের ঘরকে পাঠালি।।"

ছমড়াতলে কনের কাকা/জেঠা মেয়েকে কোলে নিয়ে বসায়। কাকা/জেঠার কোলে বসে। উভয়পক্ষেরই জেঠা কিম্বা কাকা যিনি কন্যাদান/পুত্রদান করবেন তিনি নিরম্বু উপবাস করে থাকবেন। কনেকে হলুদ গাবা "সিঁদরাদানের" শাড়ি পরানো হয়েছে।

বর-কনে মুখোমুখি কোলের উপর বসে প্রথমে আম পল্লব, পানের খিলি তিনবার করে অদল-বদল করবে। পান খিলি একে অপরকে খাইয়ে দিবে। আকন ফুলের মালাও তিনবার বদল করে এ-ওর গলায় পরিয়ে দিবে। তারপর হাতের যাঁতি দিয়ে তিনবার সিঁদুর কপালে ঠেকিয়ে পরে কাচা শনের উপর গোটা থানের সমূহ সিঁদুর ঢেলে নিয়ে বর কনের সারা সিঁথিতে লেপে (ঘসে) দিবে। সঙ্গে সঙ্গে জোর ধ্বনিদেওয়া হবে — "হরি-হরি বলঅ! বল হরি।" এটা মূল আচার এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় — "সিঁদুর ঘঁসা বা সিঁদুর দান"। এই সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, কোনক্রমেই একটু সিঁদুরও যেন মাটিতে না পড়ে যায়। মাটিতে সিঁদুর পড়লে বিশ্বাস বর-কনের অকল্যাণ হবে। আবার কনের কোথাও যেন সিঁদুর না পড়ে যায়। এই অনুষ্ঠানটিকে দেখার আগ্রহ সব চাইতে বেশী। অনেকেরই চোখ এই দৃশ্য দেখে সজল হয়ে ওঠে। অনেকে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে দৌড়ে পালায়। আমপাতা বদল, পান বদলের সময় প্রত্যেক আচারে পঞ্চ কুটুমের সামনে বরের অঙ্গীকার থাকে শনের মত পাকা চুল না হওয়া পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে। কনের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব প্রতিপালন করবে। স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর রক্ষা করবে। কেউ কেড়ে নিতে চেষ্টা করলে অস্ত্র দিয়ে তার মোকাবিলা করবে। বর যে কনের সিঁথিতে সিঁদুর দেয় তা ধর্মরাজ সূর্যের চিহ্ন। এই চিহ্ন তার মৃত্যু কাল পর্যন্ত সিঁথিতে আঁকা থাকবে। গীত কিন্তু থামে না। বাজনা ও গীত চলতেই থাকে।

"তেঁতুল পাতে ধান ঘাঁটিলাম, হেলকি হেলকি পড়ে ডাল।
ছামড়া তলে রাজকুমার জামাইগো, ছামড়াতলে রাজকুমারী কন্যা গো।।
হেরে হেরে প্রাণ গো জুড়ায়
হেরে হেরেমন গো জুড়ায়"

সিনৈ বদল ঃ নাপিত (উভয় পক্ষের) কনে/বরকে যে নেকড়ার পুটলি দিয়ে রং পরিয়েছিল সেই আলতা গাবা নেকড়ার পুটলি পরস্পর হাতে নিয়ে বর কনের ও কনে বরের বক্ষ স্পর্শ করবে। তারপর তিনবার অদল-বদল করে শেষবার বর কনের হাত থেকে ঐ পুটলিগুলি নিয়ে নিবে। আলতা গাবা নেকড়ার পুটলি হৃদপিণ্ডের প্রতীক। আচারটিতে সকলের সামনে হৃদয় বদলের

অঙ্গীকার। এরপর বর বাম হাতে কনেকে ধরে বাম পাশে টেনে এনে বসাবে এবং কনের মাথায় ঘোমটা তুলে দিবে। দুই পক্ষের মিলে ৩/৫ জন বর-কনেকে চুমাবে। এর পর বাবা-মা-বিটি-জামাইকে কোলে করে ঘরের ভিতর নিয়ে যাবেন। পরে সিঁদুর দানের ভোজ। পরের দিন বরযাত্রীদের বিশ্রাম "মজাৎ"।

বাঁদানী চুমান ঃ মজ্যাতের দিন সকালবেলা দৈ-গুড়-চিঁড়ের জলখাবার। দুপুরে খাসির মাংস ভাতের ভোজ। সন্ধ্যায় বাঁদানী। ছামড়া তলে নূতন করে আলপনা দেওয়া হবে। তার উপর খেজুর পাতার চাটাই বিছানো হবে। ঐ চাটাই-এর উপর বর-কনেকে বসানো হবে। বরের সঙ্গে সঙ্গী হিসাবে বসবে বরের বাগাল (ভগ্নিপতি) এবং কনের সঙ্গে সঙ্গী হিসাবে বসবে "নিতবউ"। কনের বাবা বর-কনেকে চাদর জড়িয়ে দিয়ে চুমা খাবেন। তারপর একে একে আত্মীয়-স্বজন হাঁড়ি, গরয়া, থালাবাটি ইত্যাদি যৌতুক দিয়ে চুমাবেন। চুমানের পর নিতবউ বর-কনের পা ধোয়াবে। বরের পা ধোয়ার সময় বরের পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে রাখবে। মনোমত পাওনা না পেলে ছাড়বে না। এটাকে বলা হয় "খাঁখড়ি ধরা"। বাঁদানীর পর বর-কনেকে কোলে নিয়ে বাঁদানী নাচ। বাঁদানী উঠে গেলে বিটি জামাইকে গুড়-চিঁড়ে খেতে দেওয়া হবে। জামাই অভিমান করে না খেয়ে হাত গুটিয়ে "রুসানী" করে বসে থাকবে। কিছু পাওনা দিয়ে শ্বশুর-শ্বাশুরী জামাইয়ের অভিমান ভাঙাবেন। ঐ দিন নব দম্পতির "বড়ি বাগ্যন" তরকারী খেতে দেওয়ার চল আছে।

ঘরভরা ঃ পরদিন সকালবেলা বিদায়ের পালা। কনেকে ভালভাবে সাজিয়ে দেওয়া হবে। মায়ের মন; রাস্তায় মেয়ের খিদে পেতে পারে সেইজন্য ঘটি ভর্তি দুধ দেওয়া হয়। বিদায়ের বাজনা বাজতে থাকে। বর-কনেকে কোঠা ঘরে বসানো হবে। মেয়ে বসতে চায় না। ঘর-ভরা হয়ে গেলেই তো বিদায় দিয়ে দিবে। অভিমান করে বসে থাকে।

"ঝিরি-ঝিরি, ঝিরি-ঝিরি বহে গো শেঁওয়াল।
সেহ জলে মুনু আমদে করে গো সিনান।।
খাঁয়ে লে গো ঘিয়ের মিঠাই, খাঁয়ে লে গো দুধ।
চাপ্যে লে গো মাঞের কলে যাবে বহুৎ দুর্।।
নাই যে খাব, ঘিয়ের মিটাই, নাই যে খাব দুধ।
নাই যে চা'পব মাঞের কলে, নাই ত যাব ধুর।।"

সাধ্য সাধনা করে বর-কনেকে বসান হয়েছে। বাহিরভিতরি পিছন থেকে

মেয়ের চোখ হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তারপর আঁজলা ভরে ধান দেওয়া হয়েছে। মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে;- "কুথা যাবি বিটি? কি দিয়েঁ যাছিস?" মেয়ে তিন তিনবার আঁজলা ভরে ধান ফেলে দিতে দিতে বলবে "শ্বশুর ঘর যাছি। যাবার আগুই বাপ-ভাইয়ের ঘর ভ'রে দিঁয়ে যাছি।"

এ এক মর্মস্পর্শী অত্যন্ত করুণ আচার। উপস্থিত সকলের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। কেউ কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে পালায়। এমনও দেখেছি মাটিতে লুটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে নূতন বরও চোখের জল ধরে রাখতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। দর্ দর করে তারও চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। এতো আবেগঘন পরিবেশ তৈরী হয়।

মেয়ে বাবা-মা, দাদা-ঠাকুরদা, ঠাকুরমা একে একে সকল গুরুজনদের প্রণাম করে। এখন তাদের প্রবোধ দিয়ে সে অজানা পরিবেশে যাত্রা করবে। মেয়ে প্রবোধ দিতে যায় কিন্তু মুখে কথা সরে না। মনে মনে মা-বাবা-দাদার প্রতি কিঞ্চিত অভিমানও হয়।

"চার কুনে চার খড়অ ভারি; -
ছিলি এদ্দিন বাবার ভারি গো।
আমি যাচ্ছি শ্বশুরালি; -
আমি যাচ্ছি শ্বশুরালি গো।।"

সঙছাড়ানি ঃ বর-কনেকে কোলে করে কু'লি মুড়ায় (গ্রামের প্রান্তে) নিয়ে যাওয়া হয়। পিছনে যত সঙ্গী-সাথী ও অন্যান্য মাসী-পিসীরা গীত গাইতে চলে। কু'লি মুড়ায় বর-কনেকে মা-মাসীরা গুড় খাওয়ায়।

"কাকে মনে পড়ে ধনি মাকে না বাবাকে ?
আরও মনে পড়ে ধনি খেলিবার সঙ্গতিকে।।"

খেলার সাথীরা তাদের সঙ্গিনীকে বিদায় জানায়। সঙ্গিনীদের মন সন্তুষ্টির জন্য বরযাত্রীরা পয়সা উড়ায়। এই পয়সা উড়াকে "সঙ-ছাড়ানি" পয়সা বলে। বর-কনেকে উত্তরীয়ে যে গাঁট দেওয়া ছিল এখানে তা খুলে দেওয়া হয়। বর-কনে পালকি/গাড়ীতে উঠতে যায়। সঙ্গীনিরা বর-বরযাত্রীদের বারে বারে সাবধান করে দেয়। তাদের বড় আদরের খেলার সাথীকে তারা নিয়ে যাচ্ছে। তার আদর যত্নের যেন কমতি না হয়।

"সঙি ল্যেগছ ভালই ক'রছ, সঙি রা'খবে যতনে।
আসছে বছর করম পরবে, সঙি লিব অজনে।।"

বর-কনে গাড়ী/পালকির উপর উঠে পড়ে। এই সময়ের একটি সাঁওতালি গীত উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। গীতটি এই রকম —

"আম মাতম বুন্দি কিদিঞ।
জাম জনম আদম ইদিঞ কানা।।
বাবা দেনা পাওনা ইঞ দুঞ হালা কেদা।
আয়ু তোওয়া দেনা বাং হালা লেৎ।।"

বঙ্গানুবাদ ঃ

"তুমি যে আমায় বন্দি করলে।
যাবজ্জীবন আমায় নিয়ে যাচ্ছ।।
বাবার দেনা-পাওনা শোধ করলাম।
মায়ের দুধের ঋণ শোধ করলাম না।।"

বউ বরণ ঃ বরযাত্রীরা নূতন বর-কনেকে নিয়ে গ্রামের প্রতিটি দেব-দেবীর থানে প্রণাম করিয়ে আশীর্ব্বাদ নিয়ে ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। নব-বধূকেবরণ করতে মাথায় জলের ঘটি ও আমপল্লব নিয়ে ননদরা তৈরী হয়ে থাকে। ঘটির জলে আমপাতা ডুবিয়ে তিন তিনবার নববধূ ননদীদের মাথায় জল ছিটিয়ে দিবে। ননদরাও তাই করবে। বাজনার সঙ্গে উলু ও শঙ্খ ধ্বনি চলতে থাকে। এই জল ছিটানোর কাজ একটি বংশের ননদ ও একটি আত্মীয় ননদ করবে। অন্যান্য ননদরা নূতন বউকে গীতে গীতে রাগাতে থাকবে।

"জামবাদের কু'লিয়ে সরু-মটা বালি।
বুট বল্যে কুড়হাঞ খালি লো বহু ছাগল লাদাড়ি।।"
"কু'লহি কু'লহি আলি বহু কুলহু ঘর সামহালি।
কুলহু ঘরের খৈল খায়েঁ লো বহু হুকুড়কুমা হলি।"

নূতন বউয়ের সঙ্গে ঠাকুরমা সম্পর্কীয় "লগদিন" ও ভাই সম্পর্কীয় "কাপাস-গুটি" কেউ রাগাবার জন্য গীত গাওয়া হয়।

মু-দেখা ও গুড় খাওয়া ঃ বর কনেকে কোলে তুলে ছামড়াতলে আনা হবে। সেখানে দাঁড় করানো হবে। বর-কনে এতদূর পথ পার হয়ে এসেছে। কারো কু-নজর , কু-প্রভাব পড়তে পারে। সেইজন্য মা ধুনোপড়া, সরিষা পড়ার (মন্ত্রপুতঃ) ধুনার ধুঁয়ো দিয়ে বর-বধূকে শুদ্ধ করে নিবেন। ছেলের হাতে কামার ঘরের তৈরী "লৌহার খাড়ু" দিয়ে বউ-এর হাতে পরিয়ে দিতে বলবেন। ছেলে তাই করবে। মা-মাসী, পিসী-মামী নূতন বউয়ের মুখ দর্শন করছেন। একে একে এগিয়ে এসে প্রথমে দুটি পানপাতা হাতে নিয়ে প্রদীপের শিষে

ছুঁইয়ে বউয়ের গালে সেঁক দিয়ে সোহাগ দেখাবেন। গুড় খাওয়াবেন এবং মুখচুম্বন করে টাকা-গয়না উপহার দিবেন। এই টাকা-গয়না দেওয়াকে "মু-দেখানি" বলা হয়ে থাকে।

দূয়ার ছেঁকা ঃ সকলের গুড় খাওয়া হয়ে গেলে ছেলের বাবা-মা ছেলে-বউকে ছামড়াতল থেকে মূল ঘরের ভিতর নিয়ে যাবেন। মা-বাবার যদি সামর্থ থাকে তা হলে কোলে তুলে নিয়ে যাবেন। যদি না পারেন তাহলে দু'জন, কনেকে মা আর বরকে বাবা হাত ধরে আদর করে ঘরে নিয়ে যবেন। মা-বাবা না থাকলে কাকা-কাকীমা অথবা জেঠা-জেঠীমা ঐ কাজ করবেন।

মূল ঘরের দুয়ারে যখন তাঁরা যাবেন দেখবেন দুয়ার বন্ধ করা আছে। পরখ করে দেখা হবে কপাট ভিতর থেকে কে বা কারা বন্ধ করে রেখেছে। ভিতরে নীচু স্বরে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনুনয়-বিনয়, ধমক-ধামক কিছুতেই কোন কাজ হয় না, দুয়ার খোলে না এতক্ষণে বর মুখ খুলবে। সে জেনে যায় এ বোনেদের কাজ। ওরা দাদা-বৌদির কাছে বাঞ্ছিত প্রতিশ্রুতি আদায় না করলে দুয়ার খুলবে না। একে বলা হয় "দূয়ার ছেঁকা"। দাবি আদায় হলে পর দুয়ার খুলে যায়। ছেলে-বউকে নিয়ে বাবা-মা চরম আনন্দে গৃহে প্রবেশ করেন।

আঁচল ঝাড়া ঃ বউ-বর মাঝ্যাঘরে বসে। বাবা-মা ঘর থেকে বার হয়ে যাবেন। ননদ আঁচলে লগন চাউল নিয়ে নূতন বউয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। ননদ আঁচলের চাউল ভাতৃবধুর আঁচলে দিয়ে দেয়। দাদার বউ আবার চাউল ননদের আঁচলে দিয়ে দেয়। তিনবার এমনি হয়ে যাবার পর, চতুর্থবার আর বউ চাল ফেরৎ দেয় না। এই অনুষ্ঠানটিকে "আঁচল ঝাড়া" বলা হয়।

বাঁদানি সিনান ঃ পরের দিন কনে পক্ষের আত্মীয়-স্বজন পাত্র পক্ষের বাড়ী আসবেন। অবশ্যই দলবলে আসবেন মেয়েকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য। এটাকে "বঁহরতা ঘুরা" বলা হয়। পাত্রপক্ষ ভোজের ব্যবস্থা করেন। খায়ন-দায়নের পর ছামড়া তলের আলপনা এঁকে, খেঁজুরের চাটাই বিছিয়ে বর-কনেকে বসানো হয়। আত্মীয়-স্বজন বর-কনেকে বাঁদানি চুমায়। ধান-দুর্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে নবদম্পতির সুখের জীবন কামনা করেন। চুমান শেষ হলে পর বাঁদানি নাচ অর্থাৎ কনে-বরকে কোলে তুলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে চটুল নাচ। সব অনুষ্ঠানেই কিন্তু বাজনা অবশ্যই বাজতে থাকবে। তারপর বউ-বরকে ঘর ভিতর করা হবে। এই সব নেগ যোগের কাজ সমাধা করতে করতে সন্ধ্যা নেমে আসে। মা-মাসীরা, বেটা-বউকে পুকুরে নিয়ে যান স্নান করানোর জন্য

সঙ্গে অবশ্যই গাগরা-ঘটি নিয়ে যাওয়া হয়। বাঁধের ঘাটে মা নিজের আঁচল পেড়ে আঁচলের উপর ছেলে-বউকে বসাবেন। বর বউয়ের ও বউ বরের হাতের কাঁকন ও গলার মালা খুলে দিবে। অতি যত্ন করে খুলতে হয় যাতে করে সূতা ছিঁড়ে না যায়। মালা খোলা হলেপর পরস্পর পরস্পরকে তেল-হলুদ মাখিয়ে দেবে। তারপর জলে স্নান করতে নামবে। একে অপরকে ঘটি ডুবিয়ে জল ঢেলে স্নান করিয়ে দেবে। শেষে বউ কৌতুক করে ঘটি জলে লুকিয়ে ফেলে দিবে আর বর খুঁজে পেতে বউয়ের হাতে তুলে দিবে। একে 'ঘটি লুকা' বলে।

স্নান হয়ে গেলে পর বউ এক গাগরা জল নিয়ে পথ চিনে, ঘর খুঁজে ছামড়াতলে এসে ভিজে কাপড়ে দাঁড়াবে। ঐ সময় কেউ তাকে পথ ও ঘর চিনিয়ে দেবে না। সেইজন্য স্নান করতে যাওয়ার সময় সাবধান হয়েই তাকে যেতে হয়। ছামড়াতলে পিঁড়ি বিছিয়ে দেওয়া হবে। একে একে শ্বশুর, ভাসুর, মামাশ্বশুর এসে পিঁড়িতে পা রাখবেন। বউ গাগরার জল ঘটিতে নিয়ে পা ধুইয়ে দিবে ও হাঁটুগেড়ে প্রণাম করবে। সকলের শেষে পা ধোবে স্বামী। বউ এই নেগের পর থেকে শ্বশুর, ভাসুর ও মামাশ্বশুরকে মান্য করবে। ভাসুর ও মামা শ্বশুরের ছায়া মাড়াবে না এইভাবে বাঁদানি সিনান সাঙ্গ হয়।

ঘুর্ ফের্ ঃ কুড়মালি বিহার শেষ নেগাচার। এ এক নাটকের মত। কু'লি মুড়ায় স্ত্রী-স্বামীকে গুড়-চিঁড়ে খেতে দিবে। স্বামী যখন খাবারে মনযোগী হবে তখন বউ এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে ঠিক বতর বুঝে পালিয়ে যাবে। খাবার থেকে চোখ তুলে স্বামী দেখবে বউ নাই। এখন ছিল। কোথায় গেল? বউ নিশ্চয় বাপের বাড়ীর পথ ধরেছে। বর দৌড়ে যায়। বউকে খুঁজে পায়। অবশেষে হাত ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ইঙ্গিত, যদি বউ কখনো কোন কারণে অনুরূপ কোন ভুল বা অপরাধ করেই থাকে, স্বামী তা সুধরে নেবে।

বর্তমান অবস্থা ঃ দীর্ঘদিন একসঙ্গে পাশা-পাশি বসবাস করলে কিছু কিছু আচার-আচরণের আদান-প্রদান হতে বাধ্য। অপর দিকে ক্ষমতাবান শাসক গোষ্ঠীর করুণা লাভের জন্য দুর্বল গোষ্ঠী অনুকরণও করে থাকেন। কুড়মালি জাতি গোষ্ঠী যদিও রক্ষণশীল তথাপি দীর্ঘদিন আর্যগোষ্ঠীর শাসনাধীনে থাকার ফলে সে রক্ষণশীলতায় ঘা লেগেছে। নিজেদের কুলাচার ধারা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী বেদাচার ধারায় পুত্র-কন্যাদের বিবাহ সম্পন্ন করছেন। তবে পুরোপুরি বেদাচারীও হতে পারেন নি। আদিবাসী নেগাচারও ছাড়তে পারেন নি। একটা "আধা-খেঁচড়া" অবস্থা হয়েছে। যদিও সংখ্যায় তাঁরা অতি নগন্যই। প্রবনতা ও ঝোঁক তবুও বাড়ছে।

দেশ-জাতি ও সমাজের পক্ষে যে রীতি-নীতি নেগ-যোগ কল্যাণকর হবে, মানুষ সেইটিই গ্রহণ করবেন। এ কথা একশত ভাগ খাঁটি। তবে গ্রহণ বর্জনের সময় অতি অবশেই দেখে নিতে হবে কোনটি আমার/আমাদের পক্ষে শ্রেয়তর। চোখ কান খোলা রাখলে সহজেই বোঝা যায় যতদিন পর্যন্ত না যাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদী বরপণ প্রথা গ্রহণ করেন নাই ততদিন পর্যন্ত তাদের কন্যা সন্তানের জন্য তেমন মাথা ব্যথা ছিল না। ঐ ধারা যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর থেকে সবসময় একটা দুঃশ্চিন্তা মাথায় এসে চেপে বসেছে। কন্যার বয়স যত বাড়তে থাকে পিতা-মাতার চোখে ঘুম, পেটের খিদে উড়ে যায়। বিয়ে দিয়েও কি নিস্তার আছে? নিত্য নূতন দুর্ভাবনা বাড়ে বই কমে না। বিষ খেয়ে, আগুনে পুড়ে, জলে ঝাঁপ দিয়ে, ট্রেনে মাথাদিয়ে কত মেয়ে বউ আত্মহননের পথ বেছ নিতে বাধ্য হচ্ছে। কত সুখের সংসার অশান্তির আগুনে পুড়ে ছারখার হচ্ছে, কে তার হিসাব রাখে ?

আদিবাসী তথা কুড়মালি কুলাচার প্রথায় বিবাহের পর যদি পাত্রপক্ষ কিম্বা পাত্রীপক্ষ কোন অমার্জনীয় অপরাধ করে থাকে, সম্পর্কের চিড় ধরে, জীবনযাত্রা একান্তই অসহনীয় হয়ে পড়ে তা হলে সামাজিক প্রথায় তারও মীমাংসা আছে। একান্তই বিচ্ছেদ চাইলে তারও ব্যবস্থা আছে। অল্প বয়সে বিধবা বা অন্যান্য কারণে সামাজিক ভাবে বিচ্ছেদ চাইলে আদিবাসী কুড়মালি সমাজে দ্বিতীয় বিবাহ "সাঁঘা" প্রথা আমাদের পূর্ব পুরুষ চালু করে রেখেছেন। আজও এই সমাজের লোকদের মহাত্মা রামমোহন কিম্বা বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন নাই। সতীদাহ রোধ কিম্বা বিধবা বিবাহের জন্য আন্দোলন অথবা আইন প্রণয়ন করতে হয় নাই।

এখন না মানাকেই আধুনিকতা বলে অনেকেই মনে করেন। অন্যের নকল ও অনুকরণ করাকেই অগ্রগতি বলে মানছেন। ফল কি হচ্ছে, দেখেও দেখতে পাই না। ঘরে-ঘরে, স্বামী-স্ত্রীতে, বাপে-বেটায়, ভাইয়ে-ভাইয়ে মনোমালিন্য অশান্তি বাড়ছে। মেলবন্ধনের যে আন্তরিক সম্পর্কতার মধ্যে ফাটল দেখা দিচ্ছে। এমনকি বিচ্ছেদ ঘটছে, হলফ্ করে বলা যায় সামাজিক রীতি-নীতি না মেনে সামাজিক অনুশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের দাগ ও দোষ ঢাকাবার জন্যই বরপণ দেওয়া শুরু করেছিল। ঐভাবে সমাজকে মান্যতা না দিয়ে অতিলোভী মানুষ বরপণ নিতে আরম্ভ করেছিল। ছোঁয়াচে রোগ বাড়ে বই কমে না। ভুক্তভোগীরাই বুঝছেন।

আবেদন ঃ আমি যদি সত্যিকারের আধুনিক হতে চাই, "পিছনে আর

কতদিন পড়ে থাকবো", এই ভাবনা যদি বদ্ধমূল হয় তা হলে আমার কাজ হবে এমন, যাতে সমাজ সবল হয়, সমাজের হিতসাধন হয়। আমার ব্যক্তিগত আচরণে সমাজের ক্ষতি না হয়। সত্যিকারের কল্যাণ হয়। সমাজের দুর্বলতম ব্যক্তিটির কথা চিন্তা সকলের আগে করা দরকার। এই কথাগুলি অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। যেমন —

১) ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে।
২) ছেলে-মেয়ের বিবাহে পণ দেওয়া-নেওয়া বন্ধ করতে হবে।
৩) বিবাহ কার্য্যে অহেতুক লোক দেখানো বাহুল্য খরচ যতদুর সম্ভব কম করতে হবে।
৪) আত্মীয়-স্বজনদের যৌতুক দেওয়া বাদ দিতে হবে।
৫) দরকারী ভালো বই-পত্র দেওয়ার প্রথা চালু করতে হবে।
৬) অনুষ্ঠান আরম্ভ থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিহা গীত গাওয়া হবে। অন্য গান/গীত হবে না।
৭) ঠিক ঠিক সামাজিক কাজ যিনি করবেন, সামাজিক ও পারিবারিকভাবে তাঁকে সম্মান জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
৮) অনুষ্ঠান শেষে আলোচনায় বসতে হবে।
৯) দুর্বল ব্যক্তি উপযুক্ত মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না তার জন্য যথোপোযুক্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

আমার সমাজের কাজ অন্যে কেউ করে দিবে না। আমাকেই করতে হবে। সমাজ থাকবে না। সমাজ শেষ হয়ে যাবে এমন কথা ভেবে লাভ নেই। সমাজ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সমাজেই থাকতে হবে। আবার, তালগাছে উঠতে গেলে গাছের গোড়ায় যেতেই হবে।

তথ্য সাহায্যকারী গ্রন্থ ঃ

১। ঝাড়খণ্ডের লোক-সাহিত্য — ডঃ বঙ্কিম মাহাত
২। বর্তিকা (পুরুলিয়া সংখ্যা - ১৯৮৫) — মহাশ্বেতা দেবী
৩। ছত্রাক (৩০ বর্ষ - ৩য় সংখ্যা) — সুবোধ বসু রায়।
৪। সাঁওতাল সমাজের বিবাহ ও বিবাহের গান — ডঃ মোহন পাল

গীত ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন ঃ

নগেন পুনুড়িআর, চারিআন মাহাত, তরনীতারন বানুআর, জামবাদ মিলন আখড়ার শিল্পীগণ।

করমশাড়ী বা করমডালা

কুড়মি পরিবারের বিহা বা বিবাহ হওয়ার পরেও সেই বৎসর প্রায় সারা বৎসর ধরেই কিছু করণ-কারণ বা নেগ-নেগাচার অতি অবশ্যই পালন করে চলতে হয়। বর্তমানে কোন কোন অঞ্চল বা এলাকায় আগেকার মত করে যে সব নেগ-নেগাচার অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ধূম-ধামের সঙ্গে প্রতিপালন করা হত তার ঘাটতি দেখা যায়। অনেকে আবার নেগসারা বাহুল্য বলে বাদই দিয়ে থাকেন।

ভাল-মন্দ যাই হোক, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন যাই থাক, তথাকথিত আধুনিকতা, অপরাপর সমাজের করণ কারণের অনুকরণ, সব কিছু মেনে নিয়েই আমার ব্যক্তি জীবন, সামাজিক পারিবারিক জীবন বোধ, পাড়া পড়শিদের যে সকল ঘটনা দেখেছি, শুনেছি, তারই কিছু কিছু কথা লেখার চেষ্টা করেছি। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আমাদের কিছু কিছু মানসিক পরিবর্তন হয়েছে বৈকি। কালে কালে আরও পরিবর্তন হবে এবং হতে বাধ্য। আলোচনায় আসছি। কোন নূতন কথা নয়। সবই পুরাতন কথা। প্রায় সকলেরই জানার কথা।

পরবর্তী নেগাচারের জন্য বরপক্ষ ও কনেপক্ষ দুই পরিবারের প্রস্তুতি চলে। মনে মনে দুই পরিবারেরই চলে পরিকল্পনা, তোড়-জোড়। চলে আসা-যাওয়া, চলে কথা-বার্তা, চলে মুহা-জহা, দিয়া-থুয়ার আদান-প্রদান, বাড়ে আত্মীয়তা, বাড়ে আন্তরিকতা একাত্মতা।

দেখতে দেখতে গুনতে গুনতে এসে পড়ে ভাদর মাস। ভাদর মাসে করম পূজা। কুড়মি তথা অন্যান্য জন-জাতি গোষ্ঠীর কাছে এই পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। ছেলের বউ করবে করম। শাশুড়ির আধা রাতে ঘুম ভাঙ্গে। ভাবতে থাকে, কবে সাধের বেটার বউকে পাঠাবে করম শাড়ী। করম ডালা। কাকে কাকে পাঠাতে হবে ? কি কি দিতে হবে ? কোন কিছু ভুল হলে, কোন কিছুর কমতি হলে বেহাই ঘরের লোকে তারই বদনাম করবে। বলবে, কেমন শাশুড়িরে বাবা! নেগ-নীতি জানে না। ভাদ্রমাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে করম। তার অন্ততঃ সাত কিম্বা পাঁচ দিন আগেই করম শাড়ী বেহাই ঘর পৌঁছানো চাই। পরে দিলে কোন কাজে আসবে না। সেই জন্যে শাশুড়ির মনে চঞ্চলতা, ব্যস্ততা, সাবধানতা।

করম শাড়ী/ডালা দেওয়ার উপকরণ হল ঃ একটি ডালা, একটি ছোট ঝুড়ি, নয় রকমের শস্য দানা (জাওয়া পাতানোর জন্য) যেমন — কুত্থি, মুগ, সরিষা, ভুট্টা, ছোলা, মটর, ধান, বাটলা ও অড়হর প্রভৃতি। পূজা সামগ্রী যেমন

— ঘি, গুড়, ধূনা, সিঁদুর, কাজল, হলুদ, প্রদীপ, কাঁকুড় ইত্যাদি। বউয়ের পরার জন্য শাড়ী, সায়া, ব্লাউজ ইত্যাদি। বউয়ের খাবার জন্য — দই, চিড়া, পিঠা, মন্ডা-মিঠাই ইত্যাদি ইত্যাদি। বিহাই ঘরের জন্য এক ঝুড়ি এবং ঘর-বাখ্যলের জন্য প্রতি ঘরে ঘরে দিতে এক একটি ছোট আকারের টুঁকি বা শালপাতার তৈরী ডঁড়রা ভর্তি গুড় পিঠা দেওয়ার চল আছে।

অবস্থা গুণে ব্যবস্থা। যার যেমন সামর্থ তেমনি ভাবে করম শাড়ী দেওয়া ও নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠানো হয়। তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হয়, যেন করম শাড়ী পৌঁছানোর জন্য বিজোড় সংখ্যার লোক যান।

আগাম কথাবার্তা করে দিনক্ষণ বুঝে করম শাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়। করম শাড়ী নিয়ে বউয়ের বাপের ঘর পৌঁছালে পর নূতন বউ প্রত্যেক আত্মীয়ের পা ধুইয়ে দিবে। তারপর প্রণাম করবে। প্রত্যেক আত্মীয় বউকে নিজ নিজ বাড়ী থেকে আনা শাড়ী-মিষ্টি তুলে দেন।

গৃহকর্তা আত্মীয়-কুটুম্বদের যথোচিত আপ্যায়ন ও খাওয়ান-দাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। বিশ্রামের পর বাড়ী ফেরার সময় কর্তা প্রত্যেক আত্মীয়কে নূতন ধুতি দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

❖ ২০০৩ সালে কোটশীলা থানার মুড়ুলহর গ্রাম থেকে পুরুলিয়া থানার রানীডি গ্রামে সাড়ম্বরে করমশাড়ি দিতে গেছলাম। অনুরূপ অনুষ্ঠানে এটিই আমার সর্বশেষ যোগদান।



ছাতা গামছা

বরঘরের যেমন করমশাড়ি দেওয়ার নেগ; তেমনি কনের ঘরেও বরঘরকে ছাতা-গামছা পৌঁছে দেওয়ার রীতির চল আছে। ৩৫-৪০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত দেখেছি আমাদের এলাকায় প্রায় প্রতিটি পরিবার নুতন জামাইকে "ছাতা-গামছা" পৌঁছে দিতেন। বর্তমানে ঐ চল প্রায় উঠে যাওয়ার সামিল হয়েছে। করমডালা, ছাতা-গামছা দেওয়ার পরিপুরক হিসাবে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর অনুকরণে - "আষাঢ়ি" (আম-কাঁঠাল) দেওয়া নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

"ছাতা-গামছা" দেওয়ার উপকরণ হল ঃ একটি ছাতা, ধুতি, গামছা, গেঞ্জি, আণ্ডারওয়ার প্রভৃতি। সঙ্গে পিঠে, মণ্ডা-মিঠাই সামর্থ অনুযায়ী। ঝালদা থানার চাতমবাড়ি গ্রামের শক্তিপদ মাহাত আমাকে জানালেন তিনি ২৫ (পঁচিশ) জায়গায় ছাতা-গামছা দিতে গেছেন। তিনি আরও জানালেন প্রতিটি কাজে ছাতা-গামছার সাথে সন্দেশ হিসাবে বেহাই ঘরের জন্য এক ঝুড়ি, ঘর বাখল্যের জন্য প্রতি ঘরে ঘরে এক-এক টুঁকি (ছোট আকারের) করে পিঠা কিম্বা মিঠাই নিয়ে গেছেন।

যাঁরা বরঘরে 'ছাতা-গামছা' নিয়ে যাবেন জামাই নিজে-কুটুম্ব-আত্মীয়দের পা ধুইয়ে দিবে। প্রণাম করবে। কুটুম্বগণ জামাইয়ের হাতে যে যেমন পারেন টাকা কেউ ধুতি কেউ আবার ছাতা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন। বাড়ীর কর্তা অর্থাৎ বরের বাপ আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়ান-দাওয়ানোর ব্যবস্থা করবেন। আত্মীয়-স্বজনেরা নিজেদের আত্মীয়তা ঝালিয়ে নেন। ভাবের আদান প্রদান চলে। বিশ্রামের পর বিদায় নিয়ে কনে পক্ষের লোক ফিরে আসেন।

(ক) জামাইবাঁদা ঃ কুড়মি পরিবারের নুতন জামাইকে বাঁদনা পরবে নিয়ে আসবে। ঐ পরবে "বুঢ়ি বাঁদনার দিন জামাই-বিটিকে কোঠাঘরের ভিতর পাশা-পাশি এক সঙ্গে বসিয়ে শাশুড়ি মেয়ে-জামাইকে নুতন কূলায় ধূপ-দীপ ধান-দূর্বা দিয়ে চুমাবেন এবং আশীর্ব্বাদ করবেন। বিটি-জামাই শাশুড়ি ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করবে। তাদের আশীর্ব্বাদ নিবে। আর শাশুড়ি/শ্বশুর নাত জামাইকে ধূতি-জামা-চাদর দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন।

আমাদের মানভূম এলাকায় নূতন জামাইকে শ্বশুরঘর নিয়ে যাবার চল ষোলআনাই বজায় আছে। তবে মেয়ে-জামাইকে এক সঙ্গে বসিয়ে চুমানো প্রায় উঠেই গেছে। জিজ্ঞাসা করে দেখেছি একশত জনের মধ্যে ২/৩ টি জামাইয়ের ক্ষেত্রে এই চুমানোর নেগাচার ঘটেছে। জামাইকে যেমন আদর আপ্যায়ন করে আনা হয়েছিল তেমনি বাঁদনা পরব শেষে স্ব-সম্মানে নিকট আত্মীয়কে দিয়ে জামাইকে পৌঁছে দিতে হয়।

বাঁদনা বাসি

অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মতই কুড়মি সমাজের প্রতিটি পরিবার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বাঁদনা পরব পালন করে থাকেন। বলতে গেলে কোন পরিবারেই বাদ থাকে না। কার্ত্তিক মাসের অমবস্যা তিথি ধরে এই পরব। বাঁধনা পরব পার হয়ে গেলেই বরঘরের লোক বাঁধনা বাসি পাঠানোর জন্য সচেষ্ট হয়ে পড়েন। নুতন বেহাই ঘরে লোক পাঠান। কথাবার্তা বলে দিন ঠিক করা হয়। জেনে নেওয়া হয় কত ঘরকে হাঁড়ি দিতে হবে। নির্ধারিত দিনে বরঘর থেকে কনেঘরে প্রতিটি নিকট আত্মীয়ের পরিবারের জন্য যেমন মামাঘর, মাসী-পিসী ঘরে এক একটি হাঁড়ি/হাঁড়িকা ভর্তি পিঠা, একটি করে শাড়ী কাপড় সাজিয়ে গুনতি করে পাঠাতে হবে। পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপুষ-বন্ধুদের ডাকতে হবে।

কেউ গরুর গাড়ী করে কিম্বা হেঁটে অথবা অন্য কোন যানবাহনে কনের বাপের বাড়ি সকাল সকাল পৌঁছে যাবেন। সেখানে পৌঁছালে পর বরঘরের লোকেদেরকেই প্রতিটি আত্মীয়ের বাড়ীতে বাঁদনা হাঁড়ি পৌঁছে দিতে হবে। আত্মীয়বাড়ী দুরে হলে পৌঁছানোর দায়িত্ব কনেপক্ষের বাড়ীর লোকদেরকেই দিতে হয়। পারতপক্ষে নিজেরাই পৌঁছে দিবেন। কোন গ্রাম ? কার ঘর ? কিভাবে যেতে হবে ? সব কিছু নিঁখুত ভাবে জেনে নিতে হবে। তারপর এক-দুই করে ভাগ হয়ে ঐ কাজে সকলকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

বেশ মনে আছে, আমার মামাতো দাদার শ্বশুরবাড়ী হুড়া থানার হরিট্যাঁড় গ্রামে বাঁদনাবাসি নিয়ে গেছিলাম। সেখান থেকে ঐ থানারই আমলাতোড়া গ্রামে কাপড়-পিঠা হাঁড়ি পৌঁছে দিতে গেছিলাম। সেখানে আমাদের আদরের সঙ্গে আপ্যায়ন ও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। বিকালে লিহিচিহি বেলায় হরিট্যাঁড় ফিরেছিলাম।

এমনি করে সকলে ফিরে এলে আবার রাত্রিতে সেখানে ভালভাবে থাকা খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। পরের দিন দই-চিঁড়ে গুড় খেয়ে জামবাদ ফিরে এসেছিলাম।

জিরাগমন

বিবাহ হওয়ার পর কোন কারণবশতঃ বউ যদি বাপের বাড়ীতে থেকে যায় তাহলে সুযোগ-সুবিধা মত কয়েক বছর বাদে পুনরায় বউকে অনুষ্ঠান করে দ্বিতীয়বার শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে আসাকে জিরাগমন বা দ্বিরাগমন বলা হয়ে থাকে। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য উভয় পক্ষের অর্থাৎ কনেঘর ও বরঘরের দুই পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা শুভদিন স্থির করা হয়।

বরঘরের পক্ষের নিকট আত্মীয়দের আমন্ত্রণ করে ডাকা হয়। পিঠে/মিষ্টান্ন মাটির হাঁড়িতে ভর্তি করে হাঁড়ির মুখ শালপাতার পতরি দিয়ে ঢেকে বেঁধে দেওয়া হয়। এমনি কয়েক হাঁড়ি পিঠে/মিষ্টি ও শাড়ী কাপড় নিয়ে কয়েক জন সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে নুতন বেহাই ঘরকে যাওয়া হয়।

বেহাই বাড়ীর লোক আত্মীয় স্বজনদের জলঘটি দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তাঁরা আগে থেকেই তৈরী হয়ে থাকেন। নিজেদের নিমন্ত্রিত আত্মীয় এবং নূতন বেহাই ঘরের কুটুম্বদের ভালভাবে খাওন-দাওনের ব্যবস্থা করেন। বেহাই ঘরের পিঠে/মিষ্টি পাড়া-প্রতিবেশী, গোষ্ঠী-ভায়াত ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী-বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

নূতন বেহাই ঘরের আত্মীয়-কুটুম্বদের সেই দিনের মত বিশ্রাম ভাল মতো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখে দেন। সময় সুযোগ পেলে গাঁয়ের অন্যান্য পুরাতন আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ীতে গিয়ে পুরাতন আত্মীয়তা ভাল করে ঝালিয়ে নেন। পুরাতন কুটুম্ব বাড়ী যাওয়ার সময় পিঠা/মিষ্টি সঙ্গে করে নিয়ে যান। বেহাইঘর আসার সময় হিসাব করে সেই মত পিঠা-মিষ্টি বাড়ীতেই আলাদা ভাবে সাজিয়ে নিয়ে আসেন। আলাপ-আলোচনা করেই সেই মত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ছা'ড়-বা'ড়

অনেক রকম দেখা-শোনা, কথা-বার্তা, দেওয়া-নেওয়া, মানা-বুঝা, নানান মহাসমারোহের মধ্যে একটা বিহাঘর বা বিবাহ সম্পন্ন করে। বহু নূতন পরিবার পরিজনের সাথে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে তো বটেই, একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর একটি গোষ্ঠীর। একটি গ্রামের সঙ্গে অপর একটি গ্রামের আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কত অজানা দূরের লোক আপনজন হয়ে যায়। বিবাহ সম্পর্ক মানুষ্যজীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বা ঘটনা।

কুড়মালি নেগাচারে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কোন পুরুষ বিবাহের পরেই তিনি একটি গোষ্ঠীর পিড়হি পুরুষ হিসাবে মান্যতা পায়। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তাকে নাবালক হিসাবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। বিবাহের পর মেয়েরা মা হওয়ার অধিকার অর্জন করে। যা তার নারী জনমের একান্ত কামনার বিষয়। বিবাহের পর মেয়ে নারীর পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা তো পায়ই সঙ্গে সঙ্গে তার বংশ বা গোষ্ঠীর পরিচয়ের চিহ্নও পরিবর্তন হয়ে যায়।

বিবাহ সুখ ও আনন্দের অনুষ্ঠান ঠিকই; জীবনকে উপভোগ ও প্রকাশ করার পরিপূর্ণ যোগাযোগ কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন সময় সব বিবাহ সুখের হয় না। বিপরীত ফল ফলে। বিবাহের সম্পর্ক অসহনীয় হয়ে যায়। পরিবারে পরিবারে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানান কারণে মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদ হতে হতে সম্পর্কে চিড় ধরে যায়। শত্রুতার ভাব দেখা দেয়। বিষ নজরে একে অপরকে দেখতে থাকে। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক এত তিক্ততার পর্যায়ে এসে পড়ে যা উভয় পরিবারের বড় ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় জীবনহানীর আশঙ্কা করা হয়। বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অপেক্ষা করার পরও যদি সম্পর্কের কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ বা উন্নতি না হয়ে থাকলে বরঘর বা কনে ঘরের পক্ষ থেকে সমাজের কাছে অভিযোগ জানিয়ে নালিশ করা হয়। ছা'ড়-বা'ড় বা বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন জানায়।

সমাজের মালিক পক্ষের মালিক-মুখিয়াগণ নিজের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, সলহা-পরামর্শ মত একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য্য করে বরপক্ষ ও কনে পক্ষের লোকেদের এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়কে এক নির্দিষ্ট স্থলে যথাসময়ে হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সামাজিক সভা বসে। সভায়

মালিক পক্ষ স্বামী-স্ত্রী এবং উভয় পক্ষের লোকেদের অভিযোগ শোনেন। দুই পক্ষকেই তাঁদের অভিযোগের কারণ সমেত সমস্ত মতামত ব্যক্ত করার সমান সুযোগ দিয়ে থাকেন। কেন অভিযোগ জানানো হয়েছে, কি কি অভিযোগ আনা হয়েছে তার সত্য/মিথ্যা যাচাই করে উভয়পক্ষের খোল-মেলা কথা-বার্তা শোনা হয়। সভায় অপর কোন সমাজের লোককে থাকতে নিষেধ করা হয়। যদি সে রকম অপর কোন সমাজের লোক সভায় এসে থাকেন। তিনি যতই প্রভাবশালী কিম্বা গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে থাকেন তবুও তাঁকে সভাস্থল থেকে চলে যেতে অনুরোধ করা হয়। সভায় কোন আলোচনা তিনি না শোনেন সে কথাও বলা হয়। এটা তাদের নিজেদের সামাজিক সভা অন্য সমাজের লোক সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

উভয়পক্ষের কথা শোনার পর মালিক পক্ষ স্বামী-স্ত্রী এবং দুই পক্ষকেই ছা'ড়-বা'ড় বা বিবাহ বিচ্ছেদ না করার জন্য বোঝানো হয়। যাতে করে সম্পর্ক ভালো হয় তার যুক্তি ও পরামর্শ দেওয়া হয়। অনেক উদাহরণ শোনানো হয়। দেখা যায়, অনেক সময় দুই পক্ষের অভিযোগ-অনুযোগ মিটে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী পরবর্তীকালে সুখে-আনন্দে ঘর-সংসার করে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। আবার দেখা যায়, সমস্যার সমাধান না হলে আর একবার মালিক পক্ষ শেষ বারের মত স্বামী-স্ত্রীর মতামত নিয়ে বিচার স্থলের প্রধান বা সভাপতি একটি শালপাতা মাঝ বরাবর চিরে দুই ভাগ করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন। স্ত্রী হাতের লৌহার খাড়ু খুলে সভাপতির হাতে দিয়ে দেয়। সভাপতি লৌহার খুড়ু বরপক্ষের হাতে তুলে দেন। ঐ সময় যদি জিনিসপত্রের দাবি-দাওয়া থাকে পঞ্চভদ্রানের বিচার স্থলে তারও যথোচিত মিটমাট সমাজের পক্ষ থেকেই করে দেওয় হয়। যথাসময়ে উভয়পক্ষের দেওয়া-নেওয়া সমাজের নিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে আদান-প্রদান সমাধা করে নেন।

ছা'ড়-বা'ড় বা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে পর কনেপক্ষ ও বরপক্ষ যার যেমন ইচ্ছা দ্বিতীয় বার বিবাহ বা সাংঘা করে নিতে পারে। ছা'ড়-বা'ড় হয়ে যাওয়ার পর সমাজের পক্ষে আর কোন অভিযোগ-অনুযোগ শোনা হয় না।

ছা'ড়-বা'ড় বা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সময় সেই দম্পতির এক বা একাধিক পুত্র/কন্যা থাকলে সেই ছেলে বা মেয়ে — কে পাবে তার সমাধানও করে দেওয়া হয়। পুত্র-কন্যা বড় হলে তাদের মতামতকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ছেলে/মেয়ে নাবালক হলে উভয় পক্ষের সুবিধা অসুবিধা জেনে রায় দেওয়া হয়। ছেলে-মেয়ে শিশু হলে, মায়ের দুধ খেলে মায়ের হেপাজতেই শিশুকে রেখে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়।

সাংঘা বা দ্বিতীয় বিবাহ

অনেকেই অনেক সময় সাংঘাকে দ্বিতীয় বিবাহ বলে থাকেন। কিন্তু সাংঘা ও দ্বিতীয় বিবাহ আলাদা বিষয়। দুটির অনুষ্ঠান পুরোপুরি পৃথক। একজন পুরুষ মানুষ তার বউ না থাকলে কিম্বা কোন পুত্র-কন্যা না থাকলে ইচ্ছা করলে সাংঘা করতে পারে। বউয়ের অনুমতি সাপেক্ষে কিম্বা মতামত না নিয়েও অনেকে সাংঘা করতে পারে। বউয়ের অনুমতি নিয়ে করলে অনেক সময় সাংঘা করা সুখের হয়ে থাকে।

পাত্র-পাত্রীর উভয়ের মতামত নিয়ে সাংঘা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উভয়পক্ষের বাড়ীর অনুমতিও নেওয়া হয়। তবে পাত্র/পাত্রীর মত না থাকলে সাংঘা হয় না। সমাজে একটা কথা চালু আছে; — "ধ'রে বাঁধ্যে বিহা আর মন সয়দায় সাংঘা।"

কোন বিবাহিত নারীর ছা'ড়-বা'ড় না হলে সে সাংঘা করতে পারে না। অবিবাহিত পুরুষ যদি সাংঘা করতে চায় তাহলে সাংঘার পূর্বে তাকে কলা গাছকে বিবাহ করতে হয়। কমপক্ষে কলাগাছের সঙ্গে কলআঁকড় (কোলাকুলি) করে নিতে হয়।

সাংঘার কনে দেখা; — সাংঘা করার মত উপযুক্ত পাত্রী থাকলে লোক মারফৎ আগাম তার মতামত জেনে নেওয়া হয়। তার মতামত থাকলে পাত্রপক্ষের দুই-চার জন লোক কনের বাড়িতে সরাসরি হাজির হয়। পাত্রকে অতি অবশ্যই যেতে হয়। পাত্রীপক্ষের বাড়ীতে গিয়ে তাদের আগমনের কথা পরিষ্কার ভাবে জানানো হয়। তাদের মতামত নেওয়া হয়। পাত্রীর সঙ্গে পাত্র নিজে কথা বলে তার মতামত জেনে নেয়। যদি সব ঠিক হয় তাহলে উভয় পক্ষের পাকা কথা হয়। লেনা-দেনা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারেও কথা-বার্তা করে নেওয়া হয়। তারপর সাংঘার অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ধার্য করা হয়। পাত্রর সঙ্গে কত লোকজন আসবে সে কথাও বলে নেওয়া হয়।

সাংঘার অনুষ্ঠান; — সাংঘার নির্দিষ্ট দিনে, যথা সময়ে সাংঘার পাত্র আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে পাত্রীর বাপের বাড়ীতে হাজির হয়। সঙ্গে করে কনের শাড়ী-সায়া, সিঁদুর ও লৌহার খাড়ু নিয়ে যায়।

কনেপক্ষের বাড়ীর লোক পাত্রপক্ষের লোকেদের আপ্যায়ন করেন। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ভাই-ভায়াদদের কিছু নিকট আত্মীয়দের ডেকে খাওয়ান। একে সাংঘার ভোজ বলা হয়ে থাকে।

খাওন-দাওনের পর পাত্র তার বাম হাতের কলি আঙ্গুল দিয়ে সিঁদুর ছুঁয়ে সাংঘার কনেকে পরতে দেয়। ঐ সিঁদুর পাত্রের নামে কনে সিঁথিতে পরে নেয়। বরঘরের থেকে আনা নূতন শাড়ী-সায়া পরে নেয়। এতেই সাংঘা অনুষ্ঠান হয়ে যায়। কুড়মালি নেগাচারে অপর পুরুষের ছোঁয়া সিঁদুর পরলেই সে সাংঘার বউ হয়ে যায়।

পরদিন ভোরে পাত্র বিদায় নিয়ে লোকজনের সঙ্গে বউ নিয়ে নিজের বাড়ী যাওয়ার জন্য রওনা দেয়। সঙ্গে হেঁটে, গরুর গাড়ীতে কিম্বা অন্য কোনভাবে গাঁয়ে পৌঁছায়।

বর-কনের স্নান; — গাঁয়ে পৌঁছে বর-কনে সোজাসুজি বাড়ীতে যায় না। যায় পুকুরঘাটে। সেখানে গিয়ে বর-কনে উভয়েই স্নান করে। স্নান করার পর বর-কনের হাতে লৌহার খাড়ু পরিয়ে দেয়। তারপর বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করে।

বাড়ীতে পাড়া-পড়শি, ভাই-ভায়াদদের ডেকে সাংঘার ভোজ খাওয়াতে হয়। ভোজের পর সাংঘার কনে পুরোপুরি বিবাহিত বউয়ের মতই বউ হয়ে যায়। অন্যান্য বউয়ের মত শাঁখা-সিঁদুর-আলতা পরে স্বামী-স্ত্রী সুখে সংসার করে। কারো কোন বুঝার উপায় থাকে না সে বিবাহিত বউ না সাংঘাল্যা বউ।

কাঠ বাপ; — সাংঘার সময় সাংঘার বউ যদি আগলি পক্ষের বা তার বিবাহের পরে যে পুত্র-কন্যা হয়ে থাকে সেই পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে করে নিয়ে শ্বশুর ঘর আসে তাকে সমাজ মেনে নেয়। তারাও পরবর্তী কালের পুত্র-কন্যাদের মত সমান হয়ে যায়। এমনকি পরবর্তী কালের বাবার বিষয় সম্পত্তির উপর তাদের হক সমাজ মেনে নেয়। অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায়। ছেলে-মেয়ে নূতন বাবাকে 'বাবা' বলে ডাকে। তবে বাবা হয় কাঠ বাপ, আর ছেলে-মেয়ে হয় কাঠ বেটা, কাঠ বিটি।

দেঅরের সঙ্গে সাংঘা; — স্বামীর ভাই-দেঅর। কুড়মালি নেগাচারে দেঅরকে দ্বিতীয় বর বলা হয়। দাদার মৃত্যু হলে কিম্বা কোথাও চলে গেলে কিছু সময়কাল অপেক্ষা করার পর, আবার ছা'ড়-বা'ড় হওয়ার পর দেঅআর লৌহা সিঁদুর দিয়ে ভৌজীকে নিজের বউ করে নিতে পারে। সে রকম সুযোগ ও সুবিধা থাকলে সমাজের লোক ভৌজীকে (বৌদিকে) সাংঘা করে দেঅর বাড়ীতে রেখে নিবে এমনই অনুরোধ জানানো হয়। অনেক সময় নিজেরাই বুঝা-পড়া করে সাংঘার অনুষ্ঠান করে নেয়। সাংঘা সমাজস্বীকৃত বৈধ সামাজিক অনুষ্ঠান।

কুড়মালি সাংঘা প্রথা আছে বলেই বেশীর ভাগ মহিলাই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ না করে সুখে সংসার করেন। তার জন্য কারো নিন্দা, গাল-মন্দ শুনতে হয় না। মহিলা ইচ্ছা করলে সাংঘা করতে পারেন। তার জন্য তাঁকে অবশ্য জোর-জবরদস্তি করা চলে না।

কুড়মালি সমাজে সাংঘা প্রথা আছে বলেই সমাজে সতীদাহ প্রথা চালু নেই। ফলে বিধবা নারীকে আগুনে পুড়ে মরতে হয় না। সতী হতে কেউ জোরদারী করে না কিম্বা পরামর্শও দেয় না।

দাদা বর্তমান থাকাকালীন কোন ছেলে-মেয়ে থাকলে তাদের ইচ্ছা অনুসারে সম্পর্ক স্থাপন (সম্বন্ধ) করে চলতে পারে। কেউ কোন জোরা-জুরি করে না।

বিষয় সম্পত্তি মায়ের পূর্ববর্তী সন্তান ও সাংঘার পরবর্তী সময়ের সন্তানদের আলাদা আলাদা একক গণ্য করা হয়।

❖ ১৯৬৫ সালে আমাদের গাঁ পুঞ্চা থানার জামবাদ থেকে প্রায় ১৯ মাইল পথ হেঁটে পানুলাল মাহাতর সাংঘা দিতে কাশীপুর থানার ভেলাগোড়া গাঁয়ে গেছলাম। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা।



কুড়মালি মৃত্যু সংস্কার ও নেগ-নেগাচার

"কিছু কথা;"

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে কখনো একা থাকতে পারে না। যেহেতু একা থাকতে পারে না; সেই কারণে সমাজের কিছু কিছু সংস্কার তাকে মেনে চলতেই হয়। না মানলে সামাজিক নিন্দা এমনকি সামাজিক শাস্তি ভোগও করতে হয়। ঐ সংস্কার না মানলে পরবর্তী কালে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে, সংস্কার না মানারই ফল বলে মনে হয়। মনে মনে ভয় ও বিশ্বাস দুটোই কাজ করে। অল্প বয়স থেকে দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে মনের গভীরে সংস্কার বাসা বেঁধে থাকে। ভয় ভাবনার চাইতে আবার পাঁচ লোকের পাঁচ কথা সহ্য করা বড় দায় হয়ে পড়ে।

প্রত্যেকটি জাতির বা সমাজের তার নিজস্ব নিজস্ব নানান সংস্কার আছে। যেমন আছে জন্ম, বিবাহ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, স্বাস্থ্য সংস্কার, আর্থিক সংস্কার তেমনি আছে মৃত্যু সংস্কার। মনে হয় প্রতিটি সমাজেরই নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি গভীর ও নিবিড় যোগ সূত্র আছে। সম্পর্ক তো আছেই, দুটোই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। আলাদা করা বেশ কঠিন কাজ।

অনেক গবেষক ও পণ্ডিত সমাজের অনেক সংস্কারকে অপসংস্কার বলে মনে করেন এবং এগুলি সমাজ থেকে দূর করা দরকার বলে মনে করেন। মনে হয়, যে সমাজের সংস্কার সেই সমাজের নিরিখে তাঁদের আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্যের অবস্থান কোথায়? তার জন্য নিবিড় বিশ্লেষণ, গভীর অনুধাবন ও বিশদ পর্যালোচনার প্রয়োজন। অতি অবশ্যই ভিতরে ঢুকতে হবে। উপর উপর দেখলে কখনই সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না। কাজটি সহজ নহে, বলা চলে কঠিন। সেই সমাজের লোকের সঙ্গে মিলে মিশে একাত্ম না হলে বোঝার গলদ থাকতে বাধ্য। সঠিক তথ্য উঠে আসবে না।

একটা কথা বলে রাখা ভালো, কুড়মালি সমাজ একা কুড়মি (মাহাত) জাতির নহে। হিত মিতান সম ভাবে-আদর্শে গঠিত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মিলিত "সংগঠন বা কুড়"। 'কুড়' থেকেই হয়েছে কুড়মালি। এই বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনার দরকার। আজও ঠিক ঠিক কাজ হয়ে ওঠে নি।

কুড়মি সমাজ মনে প্রাণে — আচরণে, করণ-কারণে আজও আদিবাসী। অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে এঁদের সংস্কার-সংস্কৃতির মিল ষোলআনাই বলা যায়। শরীরের আকৃতি ও গঠনেও গরমিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বর্তমানে ভারত সরকারের আদিবাসী তালিকায় এঁদের নাম নথিভুক্ত

নেই। দেখা যায়; — ভারত সরকারের ৫৫০ নং নোটিফিকেশন তাং ২রা মে ১৯১৩ অনুসারে টোটেমিক কুড়মি আদিবাসী ভুক্ত ছিল এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। কিন্তু কি অজ্ঞাত কারণে আদিবাসী তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তা আজও অজানা। সরকারের খাতায় নাম তোলা আর কাটা যাওয়া এক কথা; সবই মর্জির কাজ বলা যায়। কেন এমন হল ? ইতিহাসটা জানা দরকার। "যে ব্যক্তি তার ইতিহাস জানে না, সে তার সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না।... যদি আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করি, তা হলে ইতিহাস আমাদের অবশ্যই শিক্ষা দেবে।" (ডাঃ বি. আর আম্বেদকর)।

প্রশ্ন জাগতে পারে, ধান ভানতে শিবের গীতের কি দরকার ? দরকার বলেই, এত কথা। না বললে ঠিক ঠিক বলা হবে না। বোঝার ক্ষেত্রেও ভুল ধারণা তৈরী হতে বাধ্য।

তখন ভারতবর্ষে বৃটিশ-এর রাজত্ব। ১৯২৮ খ্রীঃ কাকা কালেলকর-এর নেতৃত্বে সাইমন কমিশন এল ভারতবর্ষে। উদ্দেশ্য ১৯১৯-এর ভারত আইন দ্বারা যা কিছু কমতি অধিকার দেওয়া হয়েছে ভারতবাসীকে তার পুণর্মূল্যায়ণ করা। ডাঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে এস.টি, এস.সি, ও.বি.সি ও অন্যান্য অস্পৃশ্য দলিতদের মিলিত অধিকার অর্জনের চাপ। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা দেখল ঘোর বিপদ। সংখ্যায় তারা সংখ্যা লঘু; দশ থেকে পনেরো ভাগ মাত্র। ইংলণ্ডে ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২ সালে বসল গোলটেবিল বৈঠক। ভীষণ কঠিন সময়। আদিবাসী, হরিজন, পিছড়েবর্গকে হিন্দু বানাও; না হলে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদ মুছে যাবে। চলল মগজ ধোলাই। যেখানে যা দরকার চাপ, লোভ, মোহ সব রকম বাছা বাছা অস্ত্র ব্যবহার করা হল। ধোকাবাজীর গোলক ধাঁধার ফাঁদে পড়ে কুড়মি সমাজেও আদিবাসী ধর্ম সারি/সারনা ভুলে অজান্তে, হিন্দু হয়ে গেল। হিন্দু বললে ভুল হবে, বর্ণ হিন্দু।

বর্ণ হিন্দু হওয়ার ফলে সমাজের সংস্কারে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারা প্রবেশ করল। আবার হাজার হাজার বছরের বাপ-বুঢ়াবাপের সংস্কার সংস্কৃতিও পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারল না। নেশার ঘোর আর কত দিন থাকে ? বেশীর ভাগ লোকেরই ঝোঁক বেড়েছে জাল কেটে মুক্ত হতে। শিক্ষা আনে চেতনা। কিছুটা শিক্ষা বেড়েছে। তাই চেতনা বেড়েছে। এখন বুঝতে পারছেন, ব্রাহ্মাণ্যবাদই বিভেদ ও অনুন্নয়নের মূল। এর মূলচ্ছেদ আশু প্রয়োজন।

আর একটা কথা, "কল কুড়মি, কড়া বেদ-বিধি ছাড়া"। ভারতবর্ষের সমস্ত মূলবাসী এই তিনটি কবিলার মানুষ।

এঁদের সংস্কার সংস্কৃতি সবই বেদ বিধি মুক্ত। এঁরা এই সংস্কৃতির বাইরের

মানুষ। অন্যান্য আদিবাসী সমাজের মত কুড়মি সমাজেরও মৃত্যু সংস্কার আছে। আছে নেগ-নেগাচার। এই নিবন্ধে সংক্ষেপে কুড়মালি মৃত্যু সংস্কার ও নেগ-নেগাচার বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়াস করছি। যেটুকু জেনেছি, বুঝেছি সেই টুকু বলার চেষ্টা করছি। এর বাইরে আরও অনেক তথ্য-তত্ত্ব থাকতেই পারে। স্থানান্তরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অমূলক নয়। দয়া করে সংযোজন বিয়োজন করে নেবেন।

হাড়ে হল্যাদ; — "হাড়ে হল্যাদ" নেগাচার কুড়মি সমাজের মৃত্যু সংস্কারের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আচার। কোন পরিবারের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, বুঝতে পারলে প্রথমে গোষ্ঠীর লোকজন পাড়া-পড়শিদের, নিকট আত্মীয় এবং অতি অবশ্যই গাঁয়ের মোড়ল বা মাহাতকে ডাকা হবে। সবাই এসে পৌঁছালে পর মৃতদেহটি ভালভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে খাটিয়ায় তুলে তুলসী পিঁড়ার সামনে এনে শোয়ানো হবে। দেহের মাথা থাকবে উত্তর দিক বরাবর।

মৃতের স্ত্রী মৃতদেহে তেল ও হলুদ মিশিয়ে বেশ ভালভাবে মাখাবেন। নিজের হাতের "লৌহার খাড়ু" খুলে মৃত দেহের মাথায় পাশে রেখে দিবেন। স্ত্রী না থাকলে অন্য কোন নিকট আত্মীয়া তেল হলুদ মাখাবেন।

মৃত ব্যক্তি স্ত্রী জাতির হলে ছেলের বউ তেল হলুদ মাখাবেন। সধবা হলে পায়ে আলতা ও সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হবে। সব কাজই গাঁয়ের মাহাত কিম্বা তিনি না থাকলে অন্য কোন বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যাঁর এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আছে তাঁর অনুমতি ক্রমে কাজটি হবে। মৃতদেহে তেল হলুদ মাখানোকেই "হাড়ে হল্যাদ" বলা হয়।

গোবর জল ছিটা; — মৃতদেহ দাহ কিম্বা মাটিতে পুঁতে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়ার আগে দেহটি সাদা নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। কেবলমাত্র মাথা ও মুখ দেখা যাবে। খাটিয়ার চার পায়ার মাথায় অল্প অল্প কার্পাস তুলা গুঁজে দিতে হবে। দেখে নিতে হবে "বড় বুঁদি" নেওয়া হয়েছে কি না। দাহ করলে কাঠ, কয়লা জোগাড় করা হয়েছে কি না। মাটি দিলে গাঁট-কোদাল, কুড়ুল নিতে হবে। ধান খৈ ভাজা হয়েছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্ত কিছু নেওয়া হয়েছে। ধূপ-ধুনা জ্বালানো হয়েছে। পুত্র, পুত্রস্থানীয়েরা খাটিয়ার চার পায়া ধরে মৃতদেহ তুলসী পিঁড়ার চারপাশে আড়াই পাক ঘুরাবেন। "বল হরি, হরি বল" এই ধ্বনি দেওয়া হবে। যে কোন মৃত্যুই শোকের বিষয়। হরি ধ্বনি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোর কান্নার রোল ওঠে। যখন মৃতদেহ বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে সেই সময় মৃতের স্ত্রী একটি মাটির খাপরির (কড়াই)

ভিতর গোবর জল করে ঐ গোবর গোলা জল পিছনে পিছনে ছিটাতে ছিটাতে রাস্তা পর্যন্ত যাবেন। পাত্রটি দুয়ারের এক পাশে উবুড় করে রেখে দেবেন। দুয়ারে "খাপরি উবড়া" দেখলেই যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন এই পরিবারের কোন লোক মারা গেছেন এবং তার কাজ ভজ এখনও শেষ হয় নাই।

ধান খৈ ছড়ান; — আগের শলহা পরামর্শ মত শ্মশান কিম্বা পূর্ব নির্ধারিত স্থানের দিকে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে। পারতপক্ষে পুত্র ও পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিগণ মৃতদেহ বহন করবেন। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গোষ্ঠী-ভায়াদ, ফুল-পরান, হিত-মিতান সকলেই শ্মশান যাত্রী হবেন। সবাই হরি ধ্বনি দিতে দিতে চলবেন। পথে চলতে চলতে কোন এক ব্যক্তি ধান খৈ ছড়াতে ছড়াতে চলবেন, ধান খৈ-এর চিহ্ন দেখে পরবর্তী শ্মশান যাত্রী পথ চিনে সঠিক স্থানে পৌঁছাতে পারবেন। ধান খৈ-এর আর একটি ইঙ্গিত আছে, যে ব্যক্তি মারা গেলেন তিনি খৈ হয়ে গেলেন। অর্থাৎ ভাজা ধানে যেমন আর কোন দিন আঁকুড় বার হবে না; এই মৃত ব্যক্তি আর কখনো জন্ম নেবেন না।

গাঁয়ের কু'লহি মুড়ায়; — গাঁয়ের কু'লহি মুড়ায় (প্রান্তে) একবারের জন্য মৃতদেহের খাটিয়া নামাতে হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হবে। আরও কোন শ্মশানযাত্রী আসছেন কি না তা দেখা হবে। খাটিয়ার চার পায়ায় যে কার্পাস তুলা দেওয়া ছিল সেই তুলা ফেলে দেওয়া হবে। তারপর আবার হরি ধ্বনি দিয়ে খাটিয়া কাঁধে তুলে নেওয়া হবে। ধান খৈ রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যাওয়া হবে।

শ্মশান ঘাটে; — শ্মশান ঘাটে কিম্বা অপর যে কোন স্থানে মৃতদেহ দাহ অথবা মাটি দেওয়া যাই করা হোক না কেন, নির্দিষ্ট স্থানে মৃতদেহ নামানো হবে। মৃতদেহের সমস্ত কাপড় এমনকি কোমরের দড়ি কিম্বা অন্য যাহা কিছু থাকে সমস্ত কিছু খুলে ফেলে দেওয়া হবে। নতুন কাপড়ের ডোর কৌপিন পরানো হবে।

মুখাগ্নি; — ডোর কৌপিন পরানোর পর অর্থাৎ মৃতদেহ দাহ করার পূর্বে জ্যেষ্ঠপুত্র মুখাগ্নি করেন। মুখাগ্নি অর্থাৎ মুখে আগুন দেওয়া। বেল কাঠের ডালের ডগায় নেকড়া জড়িয়ে এবং ঐ নেকড়া ঘিয়ে ভিজিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করে মুখে ছুঁইয়ে দেওয়া হয়। পরপর অনুরূপ তিনবার এইভাবে আগুন দেওয়া হয়।

বর্তমানে মনে করা হয় জ্যেষ্ঠপুত্র মুখ্য অগ্নিদাতা। অর্থাৎ মৃতদেহ দাহ

করার সময় জ্যৈষ্ঠপুত্রই চিতায় প্রথম আগুন দেওয়ার অধিকারী। এই মুখ্য অগ্নিদাতা থেকে বিকৃত হয়ে মুখাগ্নি প্রথাটি এসেছে। সেই কারণে অনেকেই আর মুখাগ্নি বা মুখে আগুন দেওয়ার কাজটি করেন না।

চিতা সাজানো; — উত্তর-দক্ষিণ লম্বা প্রায় ৫ হাত এবং পূর্ব-পশ্চিম চওড়া ৩ হাত চিতা সাজানো হবে। প্রথমে মোটা কাঠ তারপর অপেক্ষাকৃত পাতলা কাঠ দিতে হবে। যাতে করে ঠিক তক্তার মত দেখতে আকৃতি হবে। চিতা সাজানো হলে মৃতদেহ উবুড় করে শোয়ানো হবে এবং দেহের মাঝ বরাবর আড়া-আড়ি ভাবে মোটা কাঠ ফেলে দিতে হবে, উত্তর দিকে মাথা থাকবে। তারপর আবার কাঠ দিয়ে দেহ ঢেকে দিতে হবে। জ্যৈষ্ঠপুত্র ঐ চিতার চারকোণে অগ্নি সংযোগ করবেন। উপস্থিত যত শবযাত্রী থাকবেন প্রত্যেকে চিতায় একখণ্ড করে কাঠ ফেলে দেবেন। দেহখানি পুড়ে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত একটি লম্বা কাঠ (খেচন ডাঁড়ি) দিয়ে খুঁচিয়ে তাড়াতাড়ি পোড়ার উপযুক্ত অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে।

অস্থি সংগ্রহ; — মৃতদেহ দাহ হয়ে গেলে পর চিতাভস্ম থেকে এক খণ্ড অস্থি (হাড়) সংগ্রহ করে রাখা হবে। ঐ হাড় একখণ্ড নতুন কাপড়ে যত্ন সহকারে বাঁধা হবে। জ্যৈষ্ঠপুত্র ঐ হাড় গলায় ঝুলিয়ে বেঁধে নেবেন।

মৃতের প্রতিকৃতিতে খৈ জল;—

চিতার কিছুটা আগুন ও ছাইয়ের উপর ধান ফেলে খৈ ভাজা হবে। তারপর মাটির উপর বালি দিয়ে মৃতব্যক্তির প্রতিকৃতি আঁকা হবে। ঐ প্রতিকৃতির সামনে খৈ রেখে জল ঢাল দিয়ে প্রণাম করবেন। প্রথমে জ্যৈষ্ঠপুত্র, তারপর অন্যান্য পুত্র স্থানীয়দের এবং আপন গোষ্ঠীর লোকেরা খৈ জল দেবেন।

চিতা নেভানো; — পুকুর কিম্বা নদী থেকে জল এনে চিতার আগুন নিভিয়ে ফেলা হবে। বার বার পরখ করে দেখে নেওয়া হবে, আগুন সম্পূর্ণ ভাবে নেভানো হয়েছে কি না। আগুন নেভানো হয়ে গেছে জানার পর অল্পক্ষণ সমস্ত শ্মশান যাত্রী নেভানো চিতাভস্মের কাছাকাছি নীরবে দাঁড়াবেন তারপর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। যে খাটিয়ায় করে মৃতদেহ বহন করে আনা হয়েছিল, সেই খাটিয়াটি উল্টে দেওয়া হবে।

মাটি দেওয়া; — যদি মৃতদেহ দাহ না করে মাটি দেওয়া হয় তাহলে প্রথমে গর্ত খোঁড়া হবে। গর্ত বেশ একটু গভীর হবে এবং লম্বা ও চওড়ায় এমন মাপ হবে যাতে করে দেহটি সহজেই শুইয়ে দেওয়া যায়। গর্ত খোঁড়া হয়ে গেলে দেহটি শুইয়ে দিয়ে তার উপর নতুন কাপড় ঢাকা দিয়ে দিতে হবে।

পারলে ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর মাটি ফেলে গর্ত বুজিয়ে দেওয়া হয়। গর্তে প্রথমে জ্যৈষ্ঠপুত্র তারপর অন্যান্য শ্মশানযাত্রীরা প্রত্যেকে মাটি দেন। গর্ত বুজে এলে বাড়তি আরও কিছু মাটি দিয়ে খানিকটা উঁচু ঢিপির মত করে দেওয়া হয়। ঢিপির মাঝ বরাবর কোন গাছের চারা অথবা কোন গাছের ডাল লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সকলে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে, বাড়ির দিকে রওনা দেওয়া হয়।

মৃত্যু স্বাভাবিক না হলে; — মৃত্যু যদি অস্বাভাবিক হয় অর্থাৎ সাধারণ না হয় তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম আচার পালন করা হয়।

ক) মৃতব্যক্তি যদি অন্তঃসত্ত্বা মহিলা হয়;— অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যদি কোন মহিলার মৃত্যু হয় তাহলে মৃতদেহ শ্মশান ঘাটে নিয়ে গিয়ে প্রথমে পেট কেটে ভ্রূণটি বার করে আলাদা করে নিতে হয়। ঐ কাজটি অভাগা স্বামীকেই করতে হবে। তারপর আলাদা আলাদা করে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিতে হয়। বিশ্বাস ঐ কাজটি না করলে মৃতব্যক্তি "চুড়কিন" হবে। সমাজের ক্ষতিসাধন করবে।

খ) কলেরা বসন্ত রোগে মারা গেলে;— কলেরা বসন্ত কিম্বা অনুরূপ কোন ছোঁয়াচে রোগে মারা যায় তা হলে মৃতদেহ দাহ কিম্বা মাটি দেওয়া হয় না। লোকালয় থেকে দূরে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর দেহটি ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

গ) সাপের কামড়ে মৃত্যু হলে;— সাপের কামড়ে যদি কারো মৃত্যু হয় তাহলে মৃতদেহ দাহ, মাটি দেওয়া অথবা ফেলেও দেওয়া হয় না। মৃতদেহটি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস জলস্রোতের বা জলের বিষ নাশ করার ক্ষমতা থাকে সেই জন্য জলকে অনেক সময় বলা হয় বিষহরি। বিশ্বাস, জল বিষহরি হওয়ার ফলে মৃতদেহ বিষ মুক্ত হয়ে আবার প্রাণ ফিরে পেতে পারে।

ঘ) বাউল-পঞ্চনামির মৃত্যু হলে; — কোন বাউল বা পঞ্চনামি ব্যক্তির মৃত্যু হলে দেহ দাহ করা হয় না। সাধারণ ভাবে মাটি চাপা দেওয়া হয় না, ফেলে বা ভাসিয়ে দেওয়াও হয় না। এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। দু'টি বাহনি (মাটির তৈরি বড় জালা) আনা হয়। একটি বড় গর্ত খোঁড়া হয়। গর্তের ভিতর প্রথমে একটি বাহনি বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মৃতদেহ ওর ভিতরে বসিয়ে দেওয়া হয়। দেহের উপর কিছুটা লবন বা নুন ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর অপর বাহনিটি উবুড় করে দেহটি ঢাকা দেওয়া হয়। তারপর মাটি দিয়ে গর্তটি বুজিয়ে দেওয়া হয়।

কাঁটাদুয়ারি; — দাহ কিম্বা মাটি দিয়ে শ্মশান থেকে শ্মশান যাত্রীরা বাড়ি ফিরে আসার সময় রাস্তার উপর কু'ল কিম্বা বাবলা কাঁটার ডাল কেটে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে। শবযাত্রীগণ একে একে ঐ কাঁটা ডাল ডিঙিয়ে পার হবেন। পার হওয়ার সময় প্রত্যেকে বলবেন — "তোমার ঐ পথ, আমার এই পথ।"

শবযাত্রীদের ঘাট সিনান; — শবযাত্রীরা এমনি এমনি কেউ বাড়ি ফিরে যাবেন না। সকলেই কোন পুকুর বা জলাশয়ে জমা হবেন। ইতিমধ্যেই গ্রামের নাপিতকে খবর দেওয়া হয়। যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা মৃতের গোত্রের লোক নয় অথবা পরবর্তীকালে দশ দিনের দিন ঘাট সিনান করবেন না তাঁরা দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে তেল মেখে স্নান করে নেবেন। বাকি সকলেই তেল না মেখেই স্নান সেরে নেবেন। স্নান সকলের হয়ে গেলে বাড়ি ফিরবেন।

জ'ড় গাছ তলে;— স্নান সেরে কেহই সোজাসুজি ঘর ফিরে যাবেন না। ভিজে কাপড়ে কোন জ'ড়/অশ্বত্থ গাছের তলায় এসে সকলে দাঁড়াবেন। একে একে ঐ গাছের বাকল একটু একটু মুখে পুরে চিবোবেন এবং গাছটিকে কোল আঁকড় (আলিঙ্গন) করবেন। আবার গাছটিকে প্রণাম করবেন।

কুলহির মুড়ায়;— শবযাত্রীগণ সকলে এসে "কুলহির মুড়ায়" (গ্রামের প্রান্তে) এসে দাঁড়াবেন। দেখে নেওয়া হবে শবযাত্রী হওয়ার সময় হাতে হাতে যে কুড়াল, কোদাল, গাঁট সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল সেইগুলি খুলে উল্টো মুখে পরিয়ে নেওয়া হয়েছে কি না ? স্নান করে সকলেই এসেছে কি না ? এরপর 'বল হরি হরি বল' এই ধ্বনি পর পর তিনবার সমবেত ভাবে দেবেন। হরিধ্বনি শুনে গ্রামের সকলেই বুঝতে পারবেন শ্মশানযাত্রীরা বাড়ি ফিরছেন।

ঘরের দুয়ারে;— কু'লির মুড়ায় শবযাত্রীদের হরিধ্বনির আওয়াজ শুনে প্রতিটি পরিবারের লোক বুঝতে পারেন এইবার সকলে বাড়ি ফিরে আসছেন। প্রতিটি যাত্রীর পরিবারের বউ জলভর্তি ঘটি, মাটির খোলায় তুষের উপর আগুন নিয়ে দুয়ারে অপেক্ষা করবেন। যাত্রী ঐ ঘটির জলে পা ধুয়ে, বুকে মাথায় তিনবার আগুনের সেঁক নিয়ে ঘরে ঢুকবেন। ঘরে ঢোকার আগে মাটির খোলাটি আগুন সমেত দুয়ারের একপাশে উবুড় করে রেখে বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করেন।

শোক পালন;— আপনজনের মৃত্যু হলে কার না শোক হয় ? শোক হওয়ারই কথা। পরিবারের ও গোষ্ঠীর লোক দশ দিন আনুষ্ঠানিক শোক পালন করেন। যে পরিবারের লোক মারা যায় সেই পরিবারের তো তিন দিন অরন্ধন অবস্থায় চলে। শ্রদ্ধা পূজা শেষ না হলে সব জিনিস সেদ্ধ খাওয়া হবে। অর্থাৎ

সবই তরি-তরকারি তেল-হলুদ ছাড়াই রান্না করা হবে। মাছ-মাংস কিম্বা অন্য কোন আমিষ খাওয়া নিষেধ। নখ-চুল-দাড়ি কাটা বারণ। কোন নাচ-গীত বাজনা করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেনা গাছ গাড়া;— মৃত্যুর তিনদিনের দিন পুকুর ঘাটের পাশে বাঁধ পাড়ে মৃত ব্যক্তির পুত্র, মৃতের স্মরণে তাঁর প্রতীক হিসাবে এক ঝাড় বেনা গাছ (ঘাস) এনে লাগাবেন। স্নান করে ভিজে কাপড়ে গাছটি পুঁততে হবে। পোঁতার পরে ঐ গাছের মূলে শাল দাঁতুন এবং শাল পাতার বঁহতায় (খোলায়) ভিজে ছোলা ও জল দিয়ে প্রণাম করবেন। বাবা/মাকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে জল-দাঁতুন দিতে হবে। অনুরূপ ভাবে অন্যান্য পুত্র-কন্যা ও পুত্রবধূগণ জল-দাঁতুন দিবেন। অতি অবশ্যই কোন কিছু খাদ্য গ্রহণ না করে ঐ কাজটি করতে হয়।

তেল খৈল;— তিন দিনের দিন "তেল-খৈল"। পুত্র, পুত্রবধূ, মেয়ে, জামাই ও স্ত্রী বাদ দিয়ে অর্থাৎ যাঁরা ঘাট সিনান করবেন তাঁরা বাদ দিয়ে ঐ দিন খৈল ছুঁয়ে তেল মেখে স্নান করবেন। পুকুর ঘাটে একটি মাটির পাত্রে তেল এবং অপর পাত্রে খৈল ভিজিয়ে রেখে দেওয়া হয়। স্নানের সময় গোষ্ঠীর লোকেরা তিন দিন শোক পালনের পর সকলেই খৈল ছুঁয়ে তেল মেখে স্নান করতে পারেন।

তিতা ভাত;— মৃত্যুর চার দিনে বাড়িতে প্রথম রান্না করা হয়। এই কয় দিন আত্মীয়-স্বজনদের দেওয়া চিড়ে মুড়ি খেয়েই পার করে দিতে হয়েছে। ভাত রান্না করার সময় ভাতের সঙ্গে কয়েকটি নিম পাতা ফেলে দেওয়া হয়। বাড়ির সকলে স্নান করে ঐ ভাত খায়।

কাঁধ কাঠ্যা;— সাত দিনের মাথায় অথবা নয় দিনে যাঁরা শবযাত্রী হয়েছিলেন তাঁদের ডেকে খাওয়াতে হয়। রান্না অবশ্যই নিরামিষ হয়। এই খাবার খাওয়া অনুষ্ঠানই কাঁধ-কাঠ্যা খাওয়া। যাঁরা কাঁধে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল এমন ভাবনা থেকেই এই ভোজ।

হবিষান্ন;— নয় দিনের দিন রাত্রিতে তুলসী মঞ্চের সামনে আতপ চালের ভাত রান্না করে পরের দিন যাঁরা ঘাট সিনানে অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা ঐ ভাত একসঙ্গে বসে খাবেন। খাবার সময় যেন কোন রূপ শব্দ না হয় এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। এমনকি কথা বলাও বারণ। ঐ দিন রাত্রিতে খাওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভাত তরকারি গ্রামের বাইরে দিয়ে আসা হয়। তবে

হবিষান্ন ও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভাত দেওয়া অনুষ্ঠান অনেকেই এখন আর পালন করেন না।

কাচা-খরা;— দশ দিনের দিন সকাল বেলা বাড়ির যত ময়লা জামা-কাপড় পরিষ্কার করে কাচা হয়। এই কয় দিন জামা-কাপড় কাচা নিষেধ ছিল। গোষ্ঠী-ভায়াদদের বাড়ি থেকেই এক দুইটি করে কাপড় কাচার জন্য সংগ্রহ করে আনা হয়। কাপড় কাচার জন্য ধোপা ডাকতে হয়। বর্তমানে ধোপা ডাকার কাজটি প্রায় উঠেই গেছে।

ঘাট সিনান;— প্রত্যেকটি আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, ফুল-পরান সকলকে ঘাট সিনান ও শ্রদ্ধা পূজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যও সহযোগিতা করার জন্য খবর দেওয়া হয়। মৃত্যুর দশ দিনের দিন ঘাট। ঐ দিন ভোর থেকে ঘর-দুয়ার উঠান আঙিনা গোবর দিয়ে লরা-লপ্ট্যা করতে হয়। আত্মীয়-স্বজন, ফুল-পরান যে যেমন পারেন চাল, চিড়ে, টাকা পয়সা, খাসি, ঘাটে উঠার কাপড় নিয়ে একের পর এক এসে বাড়িতে পৌঁছান।

দিনের বেলা পুকুর ঘাটে একটি পাত্রে সরিষার তেল রেখে দেওয়া হয়। নাপিত খুর, নরুন নিয়ে এসে বসেন। গোষ্ঠী ভায়াদ-নাপিতের কাছে নখ-চুল-দাড়ি কেটে তেল মেখে স্নান করেন। ঠিক সন্ধ্যের সময় পুত্র-কন্যা-জামাই পুকুর ঘাটে ঘাট সিনান করতে জমায়েত হন। আত্মীয় স্বজনও ঘাটে ওঠাবার জন্য পুকুর ঘাটে সমবেত হন। ছেলেরা মাথা মুণ্ডন করে। অন্যান্যরা নখ-দাড়ি কাটে। পুত্রবধূগণ ও কন্যাগণ নখ কাটে। সকলেই বেনা গাছে জল-দাঁতন দেয়। সকলের জল-দাঁতুন দেওয়া হয়ে গেলে বড় ছেলে বেনাগাছটিকে সবলে উপড়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেয়। এরপর সকলে এক সঙ্গে পুকুরে স্নান করে। স্নান করার সময় প্রত্যেকে নিজের নিজের কোমরের দড়ি, বাঁহিবাঁধা খুলে ফেলে দেয়। পুরাতন পরনের কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় পরে।

ভাগিনা প্রত্যেকের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দেয়। বড় ছেলে একটি ঘটি পুকুরের জল ভরে নিয়ে দু'হাতে আঁজরা করে ঘটি ধরে দাঁড়ায়। তারপর আত্মীয় স্বজন হরি ধ্বনি দেন। তিনবার হরিধ্বনি দেওয়ার পর সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ায়। সবাই জোড় হাত করে মৌন মিছিল করে বাড়ি ফেরার জন্য রওনা দেয়। মিছিলের পুরো ভাগে থাকবে জ্যৈষ্ঠ পুত্র। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী থাকলে তিনি পুরোভাগে থাকেন। ঢাক-ঢোল বাজনা থাকবে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, ভাই-ভায়াদ, ফুল-পরান সকলেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবেন।

মিছিল পৌঁছানোর আগেই দুয়ারে জল পাত্র ও কাঠের পিঁড়ি রাখা হয়। ঘাটাদের মধ্যে যার বয়স কম সেই মেয়ে কিম্বা বউ প্রত্যেক ঘাটার পা ধুইয়ে

দেয় এবং প্রত্যেককে প্রণাম করে। ঘাটারা আঙিনায় ঢোকার আগে চৌকাঠে কাপড় জড়িয়ে দিতে হয়।

আঙিনায় তুলসী মঞ্চের সামনে ধূপ-ধুনা জ্বেলে দেওয়া হয়। ঘাটারা তুলসী থানটিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে আড়াই পাক ঘোরে যে ঘরে যে স্থানে মৃত্যু ঘটেছিল, পুকুর থেকে আনা ঘটির জল সামান্য পরিমাণ হাতে নিয়ে ঘাটা ছিটিয়ে দেয় এবং হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে।

নীরবতা পালন;— জল দেওয়া হয়ে গেলে ঘাটাগণ সকলে এসে তুলসী থানের কাছে দাঁড়ায়। মৃত ব্যক্তির শান্তি কামনায় এবং শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উপস্থিত সকলের সঙ্গে কিছুকাল নীরবতা পালন করে। তারপর আশীর্বাদ কামনায় তুলসী থানে এবং গুরুজনদের প্রণাম করে।

জাগর জ্বালা;— ঘাট সিনানের পর মহারাই সূর্য্যদেবের নামে জাগর জ্বালা হয়। তুলসী থানের সামনে আলপনা এঁকে একটি খড় তৈরী করা হয়। তাতে নয়টি ঘর কাটা হয়। ঐ ঘরগুলি এক একটি দেবতার জন্য নির্দিষ্ট। অপর একটি আলপনার উপর ছিদ্র যুক্ত মাটির হাঁড়ি বসানো হয়। যাতে করে হাঁড়িটি ঠিকঠাক বসে তার জন্য আলপনার উপর কিছু ধান রেখে দেওয়া হয়। তারপর সূর্য্যদেবের নামে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে হাঁড়ির ভিতর বসিয়ে দেওয়া হয়।

দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষের নিমন্ত্রণ;— মৃত ব্যক্তির বড় ছেলে হাতে পান সুপারি নিয়ে প্রথমে ধরম ঠাকুর-সূর্য্যদেবকে নিমন্ত্রণ জানায় তিনি যেন আগামী কাল অর্থাৎ পিতা/মাতার শ্রদ্ধা পূজায় উপস্থিত থেকে সহায়তা করেন। পান সুপারী, তুলসী মঞ্চের সামনে রেখে হাঁটু গেড়ে প্রণাম জানায়। তারপর আলপনা দিয়ে যে খড় তৈরী করা হয়েছে সেই খড়ের প্রত্যেকটি ঘরে সমাজ গুরু বুঢ়াবাবা, মহামাঞ, জাহির মাঞ, গরয়া, গুঁসাঞরাই, গ্রামের অন্যান্য দেব-দেবী ও প্রয়াত পূর্ব পুরুষদের পান সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে প্রত্যেক ঘরে প্রণাম করে আহ্বান করা হয়। প্রত্যেকে বলা হয় যেন সহায়তা করতে আসেন।

ধরম গীতি;— মৃত্যু শোকের কিন্তু শোক করে থাকলে তো সংসার চলে না। দশ দিন শোক পালন করা হয়েছে। ঘাট সিনানের পর থেকে শোক পালনের অনুষ্ঠান শেষ হয়। ঘাটা ও অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্বগণের জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। জলযোগ শেষ করে তুলসী থানের সামনে জাগরকে ঘিরে রাত ভর মহারাই গীত ও অন্যান্য গীত গাওয়া হয়। গীত-বাদ্যের ফাঁকে ফাঁকে সমাজের রীতি-নীতি, আচার বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়। কারো কোন প্রশ্ন

জাগলে তা উত্থাপন করেন। ধরম-গীতি অনুষ্ঠানে সমাজের অনেক গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন; তাঁরা প্রশ্নের সমাধান করেন অর্থাৎ উত্তর বলে দেন। দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটে।

তেল-আলতা ছোঁয়া;— সূর্য্য ওঠার আগেই পিড়িলায়া অর্থাৎ ভাগিনা তুলসী মঞ্চে রাখা তেল ও আলতা ছুঁয়ে দেয়। এতদিন শোকপালনের সময় ঐ গুলি ব্যবহারের নিষেধ ছিল। এরপর থেকে ঐ গুলি ব্যবহার করতে পারবেন। পরের দিন স্নান শেষে বউ বিটিরা তেল মেখে স্নান করতে পারবে এবং পায়ে আলতা পরতে পারবে।

জাগর হাঁড়ি ঘর ভিতর করা;— সূর্য ওঠার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ছেলে ও ছেলের বউ এসে তুলসী থানে প্রণাম করে ছেলে জাগর হাঁড়ি মাথায় তুলে নেয়। বউ জল ঘটি নিয়ে জল ঢাল দেয়। জাগর হাঁড়ি মাথায় নিয়ে তুলসী মঞ্চকে আড়াই পাক ঘুরে। ঐ হাঁড়ি কোঠাঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পিঁড়ির উপর বসিয়ে রাখা হয়।

শ্রদ্ধা-পূজা;— মৃত্যুর এগারো দিনের দিন সকালে ঘর-আঙিনা গোবর জল দিয়ে নিকানো হয়। সকলে স্নান করে তুলসী মঞ্চের সামনে এসে বসে। ধূপ-দীপ, ফুল, ফুলের মালা, শান্তি কামনায় শ্রদ্ধা-পূজার আয়োজন করা হয়। আলপনা দিয়ে খড় পাতা হয়। আগের দিনের নিমন্ত্রিত দেব-দেবীদের ও প্রয়াত পূর্ব-পুরুষদের শ্রদ্ধা-পূজায় আসার জন্য আবার আহ্বাহন জানানো হয়।

ভাগিনা বরণ;— ধুতি, টাকা, গোটা পান সুপারী দিয়ে প্রথমে ভাগিনাকে পিড়িলায়ার কাজ করার জন্য বরণ করে নেওয়া হয়। ভাগিনা শ্রদ্ধা-পূজার কাজ পরিচালনা করে। তার নির্দেশ মত সমস্ত কাজ হয়। মৃত ব্যক্তির বড় ছেলে তার ভাগিনাকে বরণের কাজ করে। ভাগিনা প্রত্যেক ঘাটার কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দেয়। একে একে ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে, জামাই, নাতি-নাতনি সকলে হাতে ফুল নিয়ে মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করে, তার উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করে হাঁটুগেড়ে প্রণাম করে।

পিড়ি পাড়া;— প্রয়াত পূর্ব-পুরুষদের নামে আলপনা দিয়ে ঘর কেটে প্রত্যেক ঘরে বিরি কলায়, তিল ও চাল বেঁটে মণ্ড তৈরী করে এক একটি বসিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটির মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। দূর্বা ঘাস দেওয়া হয়। একটি ঘরে সদ্য প্রয়াত ব্যক্তির নামে মণ্ড তৈরী করে রাখা হয়। তারপর মধু ছিটিয়ে জল ঢাল, দুধ ঢাল দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করা হয়।

সমবেত প্রার্থনা;— উপস্থিত সকলে হাতে হাতে ফুল নিয়ে জাহির মাঞ ও সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা জানানো হয়, জীবদ্দশায় প্রয়াত ব্যক্তি যদি কোন অপরাধ মূলক কাজ করে থাকেন তা যেন মাফ করে দেন। তাঁর আত্মা শক্তিকে যেন সূর্যদেব অঙ্গীভূত করে নেন।

পরিবারের মঙ্গল কামনা;— প্রয়াত ব্যক্তির পরিবারের যেন মঙ্গল হয়। সুখে শান্তিতে থাকে। কোন রোগ-শোক-মড়ক স্পর্শ না করতে পারে। ধনে-বংশে বৃদ্ধি হয় এই কামনা সমবেত ভাবে করা হয়। আবার সকলে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করে প্রয়াত ব্যক্তির শান্তি কামনা করা হয়। সর্ব শেষে বুঢ়াবাবার নাম ডেকে হরি ধ্বনি দিয়ে শ্রদ্ধা পূজার কাজ শেষ করা হয়।

স্মৃতি-চারণ সভা;— শ্রদ্ধা-পূজার শেষে একটি স্মরণ সভা করা হয়। প্রয়াত ব্যক্তি কেমন ছিলেন ? তাঁর কি কি গুণ ও কি কি বদগুণ ছিল ? স্মরণসভায় সেই সকল আলোচনা করা হয়। তাঁর কি কি কাজ করার বাসনা ছিল। জীবদ্দশায় যা তিনি পূরণ করে যেতে পারেন নি উত্তর সুরীগণ তা যেন পূরণ করে দেয়। তাঁর গুণাবলী সমাজ গ্রহণ করুক। পরিবারের লোক একা হয়ে যায় নি ভেঙে পড়ার কারণ নেই। দুঃখে-বিপদে সকলেই দাঁড়াবেন এই সকল অভয়বানী শুনিয়ে স্মৃতিচারণ সভা শেষ করা হয়।

ধরম গাছ রপা;— তুলসীথানে রাখা বড়, জোড়, আম, জাম যে কোন গাছের চারা বাজ বাজনা করে মাথায় তুলে নিয়ে গিয়ে কোন পুকুরের আইলে, কিম্বা রাস্তার ধারে লাগানো হয়। চারা গাছের গোড়ায় উপস্থিত সকলে জল-মাটি দেন। মা-মেয়েরা উলুধ্বনি দেন। চালগুঁড়ি, হলুদবাঁটা, কাজল-সিঁদুর দেওয়া হয়। প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতি ও প্রতীক হিসাবে ঐ চারাগাছ রোপণ করা হয়।

১৯২৮ সালের আগে প্রতিটি কুড়মি পরিবারের সারি/সারনা ধর্ম্মমতে এইরূপ শ্রদ্ধা-পূজার কাজ হত। পুরোপুরি তখন পর্যন্ত এই সমাজ আদিবাসী ছিল। তারপর অজান্তে বর্ণ হিন্দু হয়ে ব্রাক্ষণ্যবাদী যাঁতা কলে পড়ে শ্রদ্ধা পূজার পরিবর্তে শ্রাদ্ধক্রিয়া, পিঢ়ি পাড়ার বদলে পিণ্ডদান এবং স্মৃতিচারণ ছেড়ে দধিকাদর করতে বাধ্য হয়। ব্রাক্ষণ্যবাদী অনুষ্ঠান করতে গেলে বাড়ীতে অবশ্যই ব্রাক্ষণ-বৈষ্ণব ডাকতে হয়। গোদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান, অন্নদান, অর্থদান দিতেই হয়। পায়ে পড়ে গড়াগড়িও খেতেই হয়।

আদিবাসী ধারা সারি/সারনা মতে শ্রদ্ধা পূজার কাজ করলে অপর সমাজের কাউকে দরকার পড়ে না। অন্য সমাজের কাছে তেল-সিঁদুর ছোঁয়া মা-বোনেদের

পরতেও হয় না। সমাজের প্রত্যেকটি লোক অতি অবশ্যই কারো না কারো ভাগিনা। শ্রদ্ধা-পূজার কাজ পরিচালনার দায়-দায়িত্ব ভাগিনাকে নিতেই হয়। খুঁটি নাটি বিষয় জানতে হয়, শিখতে হয়। কোন কিছু শিখলে তার জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। সম্পর্ক মধুর ও দৃঢ় হয়। অপচয়, হীনমন্যতা দূর হয়। বিশ্বাস, সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি আত্ম সচেতন বলে বলিয়ান হয় সে সমাজের উন্নতি কেউই ঠেকাতে পারবে না। মনে রাখা ভালো, স্বর্গ-নরক কল্পনা মাত্র। মানুষ মরলে আর কখনো ফিরে আসবে না। পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিলে যায়। অনুষ্ঠান, আত্মতৃপ্তি ও সামাজিক মেলবন্ধনেরই কারণে।



তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সহায়তা করেছেন –

১। চারিয়ান মাহাত – ফুসড়াবাদ, পাড়া, পুরুলিয়া।

২। নগেন পুনুড়িআর – টিমাংদা ঝালদা, পুরুলিয়া।

৩। কর্মবীর মাহাত – জামবাদ, কেন্দা, পুরুলিয়া।

শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্রের নমুনা

জোহার জাহির মাঞ — জোহার করম গোসাঞ
হুমান/হুমানিয়া,

বেড়ি দুখেক সঁগে বানারিহন যে, গেলেইক ১৪ই সহরই (কার্তিক) ভাঁগাবার (শনিবার) হামরাক জ্যেঠা ভীমচন্দ্র মাহাত (ছঁচ মূতরুয়ার) ৮৩ বছর উমেরে মরদেহি ছাড়ি গেলাহাত। হামরাক বাপ বুড়া বাপেক আদিবাসী সারি ধরম মতে ১০ দিন শগ দুখেক নেগাচার মানিকে আওয়েহেক ২৩শে সহরই (কার্তিক) ইঁদবার (সোমবার) ঘাটসিনান ২৪শে সহরই (কার্তিক) হবার (মঙ্গলবার) মরল জ্যেঠাক সেঁওরন (শ্রদ্ধাজ্ঞাপন) আর ভাই ভায়াদ, কুটুম বাটুম, সমাজ সুসারাদের আঁইঠ উঠায়েক ঠানমান করলাহে।

হামরাক আসরা, উদিন তহরা হামর ঢিঢ়াই জহড়িকে নেগ সিরানেক সহায় দেওয়ে আওবেহে।

নেহরে

গাঁও ও ডাক-পাকবিড়রা	টুঅর-ফলারী মাহাত (ছঁচ মূতরুয়ার)
থানা-পুঞ্চা, জেলা-পুরুলিয়া	লক্ষ্মীকান্ত মাহাত (ছঁচ মূতরুয়ার)

সেঁওরন সুসারেঃ মানভূম দলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংঘ ও আদিবাসী কুড়মী সমাজ
বাচিক সভে নেগাচার আম্বেদকরেক আদর্শে আদিবাসী সারি (সত্য) ধরম মতে হেতেইক।

চ তু র্থ অ ধ্যা য়

আখানলে মকর

আখান/হালপুহ্না ঃ

সূর্যদেব এই দিনে মকরক্রান্তি ত্যাগ করে কর্কটক্রান্তিতে প্রবেশ করে। কুড়মালি নেগ-নেগাচারী মানুষের কাছে সূর্য সবচাইতে প্রধান দেবতা। অন্যান্য পুরুষ দেবতাকে 'রাই' স্ত্রী দেবতা বা দেবীকে বলা হয় 'রইয়া' বা 'সিনি'। সূর্য যেহেতু প্রধান দেবতা সেইজন্য তাঁকে বলা হয় — "মহারাই"। তিনি বিশ্বপিতা। ধরিত্রী মাঞ বিশ্বমাতা। তাঁদের মিলনের ফলে সমূহ জীবকুল উদ্ভিদ কুলের জন্ম। সূর্যদেব না থাকলে কোন ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। সেই কারণেই তাঁর এই কর্কটক্রান্তিতে গমনকে আখান বা সূচনা বলা হয়েছে। যাত্রা কথার অর্থ যাওয়া বা শুভ।

কুড়মালি নেগাচারী মানুষ এই দিনটিকে কৃষির সূচনার দিন বা কৃষিবর্ষের প্রথম দিন বলে গণ্য করেন। এই আখান বা ১লা মাঘ দিনটি তাঁদের কাছে অত্যন্ত শুভ ও পবিত্রদিন। বড় ব্যস্ততার দিন। এই দিন থেকেই অনেক শুভ কাজের সূচনা করা হয়। এই নেগাচারের মানুষ কোন বিশেষ দিন পালন করলে তাঁদের ঘর-দুয়ার, উঠান-আঙ্গিনা পবিত্র করে নেন।

আখান দিনে যে যে কাজগুলি সূচনা করা হয়, যেমন —

(১) হাল পুহ্না;

(২) খামার উঠা বা মুনই চাপানো;

(৩) ঘর করলে — গুঁড়ি চটানো;

(৪) গরুবাগাল, নাপিত, কুমার, কামার, মুচি, ধোপা, নূতন করে ঐ বৎসরের কাজ করার জন্য নিয়োগ করা;

(৫) গ্রামের গ্রাম্য দেব-দেবীদের পূজা দেওয়া।

পালনীয় নেগ-নেগাচার;

(১) উঠান, আঙ্গিনা, খামার লরা-লেপটা করে নিকানো;

(২) নূতন হাল, ফাল, জৎ, বেউনি তৈরী;

(৩) হাল পুহ্না করা;
- (ক) পূর্ব দিক মুখ রেখে আড়াই পাক হাল চালানো;
- (খ) বলদকে কুলায় করে ধান খাওয়ানো;
- (গ) বলদের সিং-এ তেল দেওয়া;
- (ঘ) বলদকে পা ধুইয়ে দেওয়া;
- (ঙ) বলদকে চুমানো (ধান-দূর্বা-ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে); (বলদের পা ধোয়ানো ও চুমানোর কাজ স্ত্রী করবেন)
- (চ) স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে বলদকে প্রণাম করা।

(৪) আড়াই কোপ গোবর কুড় কোপানো;

(৫) খামার উঠা বা মুনয় দেওয়া; (স্নান করার পর ভিজে কাপড়ে)
- (ক) খামারের মাঝ বরাবর তিনটি শাল কাঠের ছোট আকারের খুঁটি গেড়ে উনোন তৈরী করা;
- (খ) নূতন সরায় দুধ, গুড় দিয়ে আতপ চাল ফুটানো; (দুধ, গুড় উপচে যেন সরার চারধার খামারে পড়ে)
- (গ) ফুটানো মুনই খামার বুড়ি ও সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ভোগ আকারে নিবেদন করা;
- (ঘ) সন্ন্যাসী ঠাকুরকে গাঁজার কলকে ও গাঁজা নিবেদন করা;
- (ঙ) দুধ ঢাল ও জল ঢাল দিয়ে প্রণাম করা;
- (চ) দই-চিঁড়ে-গুড় খাওয়া অনুষ্ঠান শেষে (বিশ্বাস, খামার ভরা ফসল হবে)।

(৬) গ্রামের গ্রাম্য দেব-দেবীদের পূজা দেওয়া;

প্রতিটি গ্রামের চারপাশে বিভিন্ন শক্তি ও গুণসম্পন্ন পৃথক পৃথক একাধিক গ্রাম্য দেব-দেবী স্থাপন করা থান থাকে। তাঁদের পূজার জন্য থাকে পৃথক পৃথক লায়ার উপর ভার দেওয়া। গ্রামের প্রতিটি পরিবার থেকে মানত ও পূজাসামগ্রী যথা সময়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। গ্রামের ফসল, গৃহপালিত পশুপাখী, মানুষ জনকে মড়ক, মহামারি, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বহিশত্রুর আক্রমণ এই সকল দেব-দেবী রক্ষা করেন বলে লোকের বিশ্বাস।

পূজার জন্য যে সকল দ্রব্যাদি দিতে হয় এবং পৌঁছে দিয়ে সশরীরে হাজির থাকতে হয় ঃ—

(ক) পূজাসামগ্রী;— গুড়, ঘি, ধূপ-ধূনা, তুলসী পাতা, আতপ চাল, সিঁদুর ইত্যাদি।

(খ) ভোগের জন্য;— চিঁড়ে, গুড়, পাকা কলা, মিঠাই ইত্যাদি।

(গ) বলিদানের জন্য;— পায়রার বাচ্চা, মৌরগ, পাঁঠা, ভেড়া, শুকর, হাঁস প্রভৃতি।

(ঘ) বাহন হিসাবে;— মাটির হাতি ও ঘোড়া।

(লোক বিশ্বাস — দেবদেবী রাত্রিকালে ঐ হাতি-ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের সীমানা বরাবর ঘোরেন এবং সব কিছুর আক্রমণ থেকে গ্রামকে রক্ষা করেন।)

কোন কোন দেব বা দেবীর পূজা বলিদানের জন্য কোন পশু-পাখীর দরকার পড়ে না। যেমন;— কিয়াইসিনি দেবী। তাঁর পূজার মানত শাঁখা-শাড়ী, আয়না-চিরুনী ও সিঁদুর-কাজল-আলতা দিতে হয়।

ভানসিং পূজায় পূজাস্থলেই ঘিয়ের পিঠা ছেঁকে ভোগ দেওয়া হয়।

কোন কোন দেব বা দেবীর পূজায় নির্দিষ্ট এক রকমই পশু বা পাখী বলি দেওয়া যায়। যেমন; কু'ল ধুঁধ ঠাকুরকে পায়রার বাচ্চা বলি দিলেই হয়। আবার হাঁসাবেড়া ঠাকুরকে দেওয়া হয় ভেড়া বলি।

জাতরা বুঢ়ির পূজায় বলি না দিয়ে মৌরগ কিম্বা ভেড়াকে 'জাতরা উড়া' বলে উড়ায়। লোকে ঐ ভেড়া-মৌরগকে গায়ের জোরে হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে লুটপাট করে ভাগ করে নেয়। জাতরা উড়া দেখতে ভিড় জমে। মেলা বসে।



ভানসিং পূজা ও পরব

ভানসিং একটি লোক দেবতা। সূর্যের অপর নাম ভানু। ভানু কথা থেকেই ভানসিং হয়েছে। দেখা যায় গ্রামের সব উৎসব ও পূজা-পার্বণগুলি কৃষিভিত্তিক অর্থাৎ শষ্য উৎসব এবং সূর্যের সঙ্গে ফসল উৎপাদনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গ্রামের মানুষ কৃষি নির্ভর। ভানসিং পূজা সূর্য পুজারই আর এক রূপ। অনেকে আবার একে 'ভাও' পূজা বলে থাকেন। কেহ ভানসিং বুঢ়ি অর্থাৎ স্ত্রী দেবতা মনে করেন। গৃহপালিত গরু-মহিষ ও অন্যান্য পশু-পাখীর রোগ-ব্যাধি ও মড়ক মহামারীর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ভানসিং পূজা করা হয়। ভানসিং পূজায় দেবতার কোন মূর্তি থাকে না। মূর্তিহীন ভাবে পূজা হলেও পূজার জন্য একটি নির্দিষ্ট থান থাকে। ছাউনিহীন খোলা মাঠে কিম্বা কোন গাছের তলায় দেবতার পূজা দেওয়া হয়। কুড়মালি নেগাচারী মানুষ মনে বিশ্বাস করেন ভানসিং জীবন্ত দেবতা। প্রাচীন কাল থেকে এই দেবতার পূজার চল আছে।

প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে গ্রামে ভানসিং পূজার অনুষ্ঠান হয়। প্রতিটি গ্রামে ভানসিং পূজা হয়। এক দিনে একাধিক গ্রামেও পূজা-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ১লা মাঘ অর্থাৎ আখানের দিন আরম্ভ হয়ে চলে গোটা মাঘ মাস ধরে। এক দিনের জন্যেও বাদ পড়ে না। ফাল্গুন মাসেও এক-এক গ্রামে পূজা-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

পূজার দু-চার দিন আগে গাঁয়ের ষোল আনার বৈঠক বসে। মেলায় কি কি করা হবে, তার জন্য খরচ কি হবে ? গাঁয়ের প্রতি ঘরে চাঁদা নেওয়া হয়। সকলের চাঁদার হার সমান। এখানে কোন বাছ-বিচার নেই। সকলে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন। কেননা সকলেরই স্বার্থ জড়িয়ে আছে। পূজায় কোন অনিয়ম ঘটলে গাঁয়ের অমঙ্গল হবে। অমঙ্গল সুনিশ্চিত। আবার দেবতা সন্তুষ্ট থাকলে গাঁয়ের ফসল ভাল হবে। মড়ক-মহামারী, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি হবে না। মানুষের বিশ্বাস, সুখ-দুঃখ, শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা সব কিছু নির্ভর করে গাঁয়ের দেবতার সুনজর ও কোপ দৃষ্টির উপর। সেই কারণে সকল গ্রামবাসী ভানসিং পূজা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উদযাপন করেন।

পুরুষানুক্রমে গাঁয়ের 'লায়া' ভানসিং পূজার অধিকার পান। ভানসিং পূজার দিন সকাল থেকে লায়াকে শুদ্ধচিত্তে উপবাস করে থাকতে হয়। ভাড়া করা ডোম পূজার আগের দিন বিকালবেলা ও পূজার দিন ভোর থেকে ঢাক বাজিয়ে

দেবতাকে জাগানো এবং গ্রামের ও গ্রামের আশেপাশের লোক তা জানতে পারেন।

একটু বেলা হলে ভানসিং থানে পূজার সামগ্রী নিয়ে লায়া হাজির হন। তাঁর সহকারী হিসেবে দেওরী ও চাটদার হাজির হন। আগে থেকেই থানের চারপাশ নিকিয়ে গোবর দিতে হয়।

পূজার উপকরণ বলতে — বেলপাতা, তুলসীপাতা, আতপ চাল, সিঁদুর, কাজল, ধান ও দূর্বাঘাস। ঘিয়ের পিঠা তৈরী করার জন্য চালগুঁড়ি, ঘি, গুড়, দুধ আনতে হয়। লায়া ঠাকুর থানের পাশে নূতন উনান তৈরী করে আগুন জ্বেলে ঘিয়ের পিঠা তৈরী করেন। ঐ সময় 'ভাও' বা ঝুঁপার নাচ করেন। ঝুঁপার দলের কোন ঝুঁপার বাবুই ঘাসের কড়রা নিয়ে অপর ঝুঁপারের বাঁহি ও বাজুতে মারতে থাকে। কেউ কেউ আগামী বছর কেমন ফসল হবে, অতিবৃষ্টি না অনাবৃষ্টি হবে, মড়ক বা মহামারী গ্রামে দেখা দেবে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি জেনে নেন। ঝুঁপার মোটামুটি প্রশ্নের জবাব দেয়। লোকের বিশ্বাস ঐ সময় ঝুঁপার নিজে কথা বলে না। দেবতা ঝুঁপারের উপর ভর করে তার মুখে নিজের কথা বলেন। "আমি ভানসিং ঠাকুর" বলে কোন ঝুঁপার কড়াইয়ের গরম পিঠা হাত দিয়ে তুলে খেয়ে নেয়। লায়া পূজা করেন। পূজা শেষে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

ঐ সময় মেলা বসে। প্রতিটি পরিবার থেকে মাটির হাতি-ঘোড়া ও পূজাসামগ্রী নিয়ে আসেন। বিকালে সাঁওতালি নাচ, বুলবুলি নাচ, দাঁড় নাচ, কাঠি নাচ হয়। কোথাও আবার নাটুয়া, নাচানি নাচ হয়। মৌরগ লড়াই, ভেড়া লড়াইও চলে। কোন কোন গাঁয়ে তীর-ধনুক নিয়ে 'বেঝাবিঁধা' হয়। তীর নিক্ষেপের প্রতিযাগিতায় যে লক্ষ্য বস্তুকে ভেদ করতে পারে, তাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। তাকে মেলা কমিটি পুরস্কার দান করেন। তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে ঢাক বাজিয়ে মেলায় ঘোরানো হয়।

নেগাচার পালনের মধ্যে;—

(১) ঘর-দুয়ার, আঙিনায় গোবর দিতে হয়।

(২) পূজার থানে দেওয়ার জন্য হাতি-ঘোড়া (মাটির) পৌঁছে দিতে হয়।

(৩) থালায় পূজাসামগ্রী — দুধ, গুড়, মধু, আতপচাল, সিঁদুর, কাজল, চিঁড়ে, মণ্ডা-মিঠাই, পাকা কলা দিতে হয়।

"সিঝানঅ / পঁথি পূজা"

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথির দিন পঁথি পূজা বা সিঝানঅ। ঘরের পঁথি (বই-খাতা), কলম ইত্যাদিকে পূজা করতে হয়। অধিত বিদ্যা গুরুর কাছে বলতে হয়। কিম্বা নিজে নিজেই পঁথি না দেখে মনে মনে পঠিত বিদ্যাকে স্মরণ-মনন করে নিতে হয়। নিজে কতখানি বিদ্যায় পারঙ্গম হয়েছে কি না হয়েছে তা যাচাই করে দেখে নেওয়ার দিন।

পালনীয় নেগাচার;

(১) ঘর, উঠান, আঙ্গিনা লরা-লাপ্টা করে নিতে হয়।

(২) একটি কাঠের পিঁড়ি-গুঁড়ি দিয়ে গাবাতে হয়।

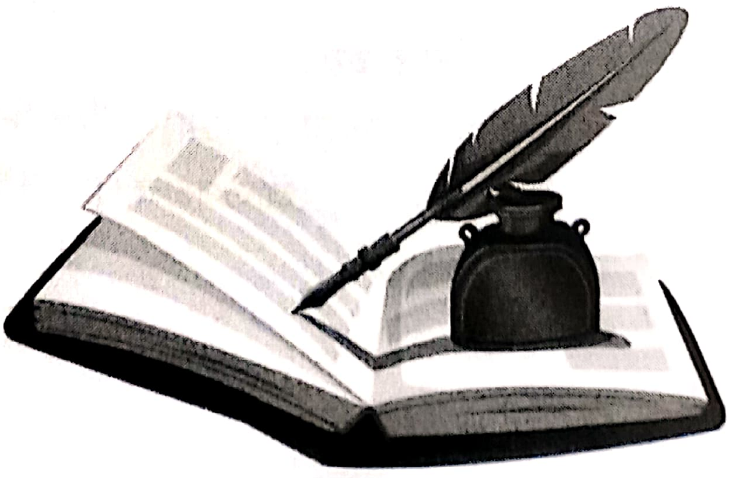
(৩) পূজা স্থলে, তুলসী থানে, আঁক দুয়ারে গুঁড়ির আলপনা দিতে হয়।

(৪) আলপনার উপর পিঁড়ি পেড়ে পঁথি-কলম গুছিয়ে রাখতে হয়।

(৫) স্নান সেরে, নূতন কিম্বা কাচা কাপড় পরে, ধূপ-দীপ জ্বেলে ঐ পুঁথিগুলিকে পূজা করা হয়।

(৬) পরিবার বা গোষ্ঠীর কোন লোক মারা না গেলে তিলের নাড়ু, উঁধি, গড়গড়া পিঠা তৈরী করা হয়। ঐ পিঠা তৈরী করার এই শেষ দিন।

(৭) আত্মীয়-স্বজনদের ঐ পিঠা পৌঁছে দেওয়া হয়।



"সারহুল / বাহা পরব"

ফুলকে বলা হয় বাহা। ফুলের উৎসব। মধুমাস (ফাগুন) সারহুল উৎসব পালন করার সময়। এই সময় যে কোন শুভদিন নির্বাচন করে সারহুল পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। ঐ সময় প্রকৃতি অপরূপ সাজে সেজে ওঠে। বনে বনে এমনকি গাঁয়ের আশ-পাশে গাছে গাছে নূতন পাতা গজায়। কত রকম রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে গাছ ভরে যায়। দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করে। ঠাণ্ডা কিম্বা গরম আবহাওয়া থাকে না। এমন কি বর্ষা-বাদলও কম দেখা যায়। সূর্যের আলোকে চারপাশ ঝলঅ-মল করতে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও ফুরফুরে বাতাসে আনন্দে-আমোদে নেচে ওঠে। মন ভরে অপরকে ভালবাসতে ইচ্ছা জাগে।

বনে বনে এই সময় শাল গাছেও ফুল ধরে। শাল গাছ কুড়মালি নেগাচারী মানুষের অতি পবিত্র ও গুরুত্বের গাছ। ঐ শাল গাছের তল থেকেই তাঁদের আদিবাসী সারি/সত্য ধরম প্রথম সূচনা ও প্রচার হয়েছিল।

গাঁয়ের নির্বাচিত লায়া বন থেকে শালফুল সংগ্রহ করে প্রথমে জাহির মাঞের থানে নিবেদন করেন। তারপর প্রতি পরিবারের বাড়ীতে গিয়ে ঘরের চালায় শালফুল গুঁজে দিয়ে আসেন। আড়বেলায় ঐ লায়া বন থেকে শাল ডাল কেটে এনে গাঁয়ের আখড়ায় গেড়ে পূজা করেন। গাঁয়ের লোক পূজায় সামিল হয়। এই শাল ডালকে পূজা করাকে সারহুল পূজা বলা হয়। পূজা শেষে পূজার আখড়ায় এবং গাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায় যুবক-যুবতীরা নাচ-গীত করে। পলাশ ও অন্যান্য ফুলের রঙ তৈরী করে একে অপরকে দেয়।

নেগাচার ঃ —

(১) লায়া বাড়ীতে এলে তাঁকে আপ্যায়ন ও তাঁর পা ধুইয়ে দেওয়া;
(২) বাড়ীতে সংগৃহীত ফুলের রেণু ও ফুল দিয়ে তৈরী করা রঙ লায়াকে এনে দেওয়া;
(৩) লায়া ঐ রঙ নিয়ে ছেলেমেয়েদের ছিটিয়ে দিবেন;
(৪) ছেলে-মেয়েরা লায়াকে প্রণাম করার পর নিজেদের মধ্যে রঙ খেলা আরম্ভ করবে।
(৫) সারহুল পূজা স্থলে যাওয়া ও নৃত্য-গীতে অংশ নেওয়া।

ফল — বসন্ত, মিলমিলা, হাম ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া। পরস্পারিক আনন্দ, সখ্যতা ও মেলবন্ধন তৈরী।

"কুড়হা ফেলা বা ছাতু পরব"

চৈত্র সংক্রান্তির দিন কুড়মালি নেগাচারী মানুষের কুঁড়া ফেলা বা ছাতু পরবের দিন। চাল, গম, ছোলা, যব, ভুট্টা ইত্যাদি ভেজে ঢেঁকিতে কুটে ছাতু তৈরী করা হয়।ঐ ছাতু প্রয়াত পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ করে তাঁদের উদ্দ্যেশে ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয়। ফুল-পরান, পাড়া-প্রতিবেশীকে ডেকে কুঁড়হা বা ছাতু খেতে দেওয়া হয়।

নেগাচার পালন;

(১) শুদ্ধ মনে শুদ্ধ উনানে, নূতন মাটির খোলা ও নূতন বাঁশের খুঁচি দিয়ে চাল, গম, যব, ছোলা, ভুট্টা ইত্যাদিকে ভাজা;

(২) খুশি মনে ভাজা চাল-গমকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ঢেঁকিতে কুঁড়হা/ছাতু তৈরী;

(৩) গৃহকর্তা স্নান করে ভিজে কাপড়ে নূতন শাল পাতা তিনটি কিম্বা পাঁচটি নিকানো তুলসী থানের সামনে পেতে ঐ কুঁড়হা/ছাতুকে গুড় ও আম সহযোগে পূর্বপুরুষদের উদ্দ্যেশে নিবেদন;

(৪) দুধ ঢাল, জল ঢাল দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম (বাড়ীর অন্যান্য সদস্যগণও প্রণাম করবেন);

(৫) প্রতিবেশী ও অন্যান্য আপন জনেদের কুঁড়হা/ছাতু খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো।

ফল — কৃতজ্ঞতা গুণ বৃদ্ধি পায়। সম্মান বাড়ে। প্রতিবেশীর সঙ্গে পুরাতন ঝগড়া-বিবাদ, মান-অভিমান মিটে যায়।



"শিবের গাজন/গাঁয়ের পরব"

কুড়মালি নেগাচারের মানুষ মহাদেব শিবকে বলেন বুঢ়াবাবা। শিবের স্ত্রীকে বলেন মহামাঞ। এই নেগাচারের মানুষ বিশ্বাস করেন বুঢ়াবাবা তাঁদের ধরমগুরু ও কৃষি কর্মের আদি দেবতা। বুঢ়াবাবার স্মরণে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে রহিন (১৩ই জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত কোন কোন গ্রামে গাজন/গাঁয়ের পরব পালন করা হয়। প্রতিটি গ্রামেই প্রায় শিব মড়প (মন্দির) তৈরী করা হয়। চার দিনের উৎসব। যথা; — (ক) ফলাহার, (খ) জাগরণ, (গ) ভগতাঘুরা, (ঘ) তেলহলদা।

গ্রামের প্রতিটি পরিবার থেকে পুরুষ বা নারী শিব গাজনে বুঢ়াবাবার স্মরণে ব্রত উপবাস পালন করেন। পুরুষ হলে বলা হয় ভগতা এবং স্ত্রী হলে পরবতি। এই উৎসবে আত্মীয়-কুটুম্ব বিশেষ করে মেয়ে-জামাইকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়ে থাকে। অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই পরব পালিত হয়।

নেগ নেগাচার পালন;

(ক) ফলারের দিন;

(১) নাপিতের কাছে নখ-চুল কেটে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ছোলা-গুড় ও আম সহযোগে ভক্ষণ করা;

(২) দিনে একবার মাত্র অন্ন খাওয়া কিম্বা ফল খেয়ে থাকা।

(৩) শিবের নামে হাতে সুতলি বাঁধা;

(৪) হাতে বেতের লাঠি ও লৌহা ধারণ করা;

(৫) মাটির উপরে শয়ন।

(খ) জাগরণের দিন;

(১) নিরম্বু উপবাস করে থাকা;

(২) গলায় টগর ফুলের মালা ধারণ;

(৩) সন্ধ্যায় পুকুরঘাটে যৌথ ভগতা স্নান;

(৪) দন্ডি দিয়ে পুকুর ঘাট থেকে মড়প পর্যন্ত আসা;

(৫) বুঢ়াবাবার উদ্দেশে জাগর জ্বালা ও প্রণাম করা;

(৬) ফুলঘরা/মশাল নিয়ে মড়প প্রদক্ষিণ করা;

(৭) ফুলখেলা/ আগুন খেলা;

(৮) ছো নাচ, নাটুয়া নাচ প্রভৃতি আচার নৃত্য সহযোগে রাত্রি জাগরণ;

(৯) সকালের পূর্ব মুহূর্তে প্রণাম করে জাগর নিয়ে আপন আপন ঘর আসা, কোঠাঘরে জাগর রাখা।

- যাঁরা দণ্ডি দিতে পারেন না, তাঁরা হাত জোড় করে মৌন মিছিল করে মড়পে আসেন।
- ভগতাদের পিছনে গ্রামের লোক ঢাকের বাজনা সহযোগে ভগতা নাচ করতে করতে মিছিল করে মড়পে আসেন।
- অনেক ভগতা পরবর্তী শিবের কথা শুনে রাত্রি জাগরণ করেন।
- বুঢ়াবাবার প্রতীক বাড়ী বাড়ী 'পাট' ঘোরানো হয়।

(গ) ভগতা ঘুরার দিন;

(১) কোন বিশেষ নির্ধারিত পুকুরে স্নান করার পর ভগতা পিঠে, বাঁহিতে, জিভে বাণ ফুড়েন;

(২) ঢাক-সানাই বাদ্য সহযোগে ভগতানাচ করেন;

(৩) কাপ/সঙ সেজে লোক হাসাতে হাসাতে ভগতা নাচে সামিল হন;

(৪) চড়কগাছে চড়ে ভগতা ঘুরেন;

- ভগতা নাচ করতে করতে আড়বেলা নাগদ মড়পে পৌঁছান।
- জোর মেলা বসে।

(ঘ) তেলহলদ্যার দিন;

(১) ভগতার হাতের সুতলি খোলা;

(২) ভগতার তেল-হলুদ মেখে পুকুরে স্নান;

(৩) কাপ-ঝাপের প্রতিযোগিতা;

(৪) সন্ধ্যায় লোকনাটক মাছানী পালা;

(৫) রাত্রিতে নাটুয়া-নাচনী নাচ প্রভৃতি।

- **ফল** — সহ্য শক্তি বাড়ে, চাযের কঠোর পরিশ্রম কাবু করতে পারে না। কৃতজ্ঞ হওয়া। সামাজিক মেলবন্ধন বাড়ে ও দৃঢ় হয়।

বীজ পুহ্ন্যা;

নিরণ মাসের (বৈশাখ) শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি "অক্ষয় তৃতীয়ার" দিন অথবা ধরণ মাসের (জ্যৈষ্ঠ) ১৩ তারিখ "রোহিন" দিনে কুড়মালি নেগাচারী মানুষ প্রথম বীচপুহ্ন্যা অর্থাৎ অনুষ্ঠান করে ধানের বীজ বীজতলায় ফেলেন। লোক বিশ্বাস কপাল টলে যে রোহিন টলে না।

নেগাচার;

(১) ঘর-দুয়ার, উঠান-আঙ্গিনা গোবর জল দিয়ে নিকানো;

(২) তুলসী তলায় ও আঁক দুয়ারে আলপনা আঁকা;

(৩) স্নান করে একটি কাঁসার বাটি (ডুভা) তুলসী থানের সামনে ধান বীজ রেখে প্রণাম করে, বাটিটি কাপড় ঢাকা দিয়ে মাথায় তুলে ক্ষেতের বীজতলার কাছে যাওয়া;

(৪) আড়াই মুঠি ধানবীজ বীজ তলায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া;

(৫) বাড়তি ধানবীজ অনুরূপ ভাবে মাথায় তুলে নিয়ে এসে ঘরের কোঠা ঘরে রাখা।

- পিঠে-পায়েস তৈরী করে খাওয়া।
- উদ্দেশ্য বীজ ভাল আছে কি না পরীক্ষা করা এবং বীজ ফেলার সূচনা করা। সচেতন হওয়া।



রোহিন

কুড়মালি নেগাচারে রোহিন দিনটি অতীব পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। ধরণ (জ্যেষ্ঠ) মাসের ১৩ দিনে রোহিন। ১২ দিনে বারনি অর্থাৎ প্রস্তুতির দিন। রোহিন দিনের মূল কাজ বীজ পূহ্যা করা, রোহিন মাটি সংগ্রহ করা এবং গুরুর কাছে চিকিৎসা বিদ্যা গ্রহণের জন্য দীক্ষা গ্রহণ।

নেগাচার পালন;

(১) ভোরে বাসি মুখে বাড়ীর চারিপাশে গোবর লাতা দিয়ে পাঁচিলে বেড় আঁকা;

(২) গোবর জল দিয়ে আঙ্গিনা-উঠান নিকানো;

(৩) তুলসী তলায় আঁক দুয়ারে আলপনা দেওয়া;

(৪) জীব পুহ্যা করা;

(৫) রোহিন মাটি ক্ষেত থেকে এনে ঘরের বিভিন্ন স্থানে এবং তুলসী মঞ্চে দেওয়া;

(৬) রোহিন ফল ভক্ষণ করা;

(৭) পিঠে তৈরী করে খাওয়া।

- লোক বিশ্বাস রোহিন দিনের মাটি অতীব পবিত্র ও বিষনাশক শক্তিসম্পন্ন। রোহিন দিনেই বিষাক্ত সর্পকূল ঘুম থেকে উঠে গর্ত থেকে বাইরে বার হয়ে আসে।
- রোহিন ফল খেলে বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।
- বীজপুহ্যার সময় এবং রোহিন মাটি আনার সময় কোন লৌহার টুকরো সাথে রাখতে হয়। যাতে কোন কু-নজর না পড়ে।
- পুরুষ মানুষ বীজপুহ্যা এবং নারী রোহিন মাটি সংগ্রহের কাজ করেন।
- স্নান করে শুদ্ধ চিত্তে পবিত্র মনে বীজপুহ্যা এবং রোহিন মাটি আনার কাজ করতে হয়।
- কথা বলা কিম্বা হাসা কোন প্রকারেই চলবে না। মাটি আনার সময় এইরূপ ঘটনা ঘটলে মাথার মাটি ফেলে দিয়ে আবার স্নান করে মাটি নিতে হয়।
- আঁক দুয়ারের চৌকাঠে, তুলসী থানের মাথায়, ঘরের কোণায় কোণায় রোহিন মাটি রেখে দিতে হয়।

- ছেলের দল বানর-ভালুক সেজে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে রোহিন মাটি সংগ্রহকারিনী মহিলাদের হাসানোর চেষ্টা করে। সাবধান থাকতে হয়।
- বীজ পুহ্যার জন্য কাঁসার বড় আকারের বাটী/ডুভা এবং রোহিন মাটি আনার জন্য নূতন বাঁশের ঝুড়ি কিম্বা টুঁকি নিতে হয়।
- বাটি/ডুভায় এবং টুঁকি/ঝুড়িতে তিনটি সিঁদুরের আঁক এঁকে নিতে হয়।
- রোহিনের স্থায়িত্ব সাত দিন। রোহিন রতরে বীজ ফেললে সেই বীজতলার ধানে কোন রোগ বা রোগ পোকা ধরে না। চারা সতেজ ও বেশী উৎপাদনশীল হয়ে থাকে।
- ঘরের পাঁচিলে আঁকা গোবরের বেড় পার হয়ে কোন বিষধর সাপ কিম্বা কীট-পতঙ্গ প্রবেশ করবে না।
- রোহিন দিনে গুরুর কাছে বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করলে ভাল মত বিদ্যা শিক্ষা হবে এবং ভাল ফল পাওয়া যাবে।
- ২০ জ্যৈষ্ঠর দিন প্রকৃতি মাঞের কাছে এক বেলা রোহিন বতর মাঁগন দিন। ঐ সময় পর্যন্ত ধান বীজ বীজতলায় ফেলা যায় (আফরগাড়াই)।
- রাত্রিতে জাঁত মঙ্গল ও মনসা মঙ্গল গাওয়া হয়।



"ডা"

ধরন (জ্যৈষ্ঠ) মাসের ১৩ তারিখ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত রোহিন এবং তারপর সাত দিন অর্থাৎ ২৬ তারিখ পর্যন্ত 'ডা'। কুড়মালি নেগাচার অনুসারে এই সময় চাষীর বীজতলায় বীজ ফেলা বন্ধ। এই সময় বীজ ফেললে সেই চারা হবে রুগ্ন ও রোগগ্রস্থ।

এই সময় খড়ের ঘর ছাওয়া নিষেধ। ডাহের সময় ঘর ছাওয়ার কাজ করলে 'সর্বনা' দোষ লাগে অর্থাৎ বিপদ আপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে। ঘরে উই পোকার উপদ্রব বাড়ে। ডাহের সময় সেই কারনেই চাষী গোবর চালা ও অন্যান্য চাষের প্রস্ততির কাজগুলি করে নেন।

"কেতকি"

ডাহের পর সাত দিন কেতকি। এই সময়কে বলা হয় কেতকি বতর বা কেতকালী বতর। যে কৃষক রোহিনের সময় বীজ ফেলা শেষ করতে পারেন নাই, এই সময় বীজতলায় বীজ ফেলা শেষ করে নেন। এই কেতকি বতরে চাষী জুনহার (ভুট্টা), রাহেড় (অড়হর), রমা, মুগ বোনার কাজ করতে পারেন। গুঁদলি, সাঁওয়ার বীজ এই সময় বুনলে ফসল ভাল হয়।

"আমাবতী বা অম্ববর্তী"

আমাবতী বা অম্বুবাচী বিহন (আষাঢ়) মাসের ৭ তারিখে আরম্ভ হয়ে চলে পাঁচ দিন ধরে। বিশেষ করে আমাবতী/অম্ববর্তী আষাঢ়ের ৭ তারিখে মানা হয়। আমাবতী/অম্ববর্তী চাষী পরিবারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। চাষীর বিশ্বাস এই দিন পৃথিবীর জন্মদিন। আবার বিশ্বাস করেন, এই দিন মা বসুন্ধরা ঋতুবতী হন। সেই কারণে চাষের সমূহ কাজ করা নিষেধ। মাটি কোপানো বারণ। ধান লাগার আগে ঐ দিন গ্রাম্য দেব-দেবীদের পূজা দিয়ে তাঁদের কৃপা প্রার্থনা ও চাষের কাজের আগে অনুমতি নেওয়া হয়। ৭ তারিখের পর আমাবতী/অম্ববর্তীর মধ্যে গ্রাম্য দেব-দেবীর পূজা দেওয়াকে বলা হয় জাঁতাল পূজা। ধান লাগার আগে অতি অবশ্যই জাঁতাল পূজার কাজ সেরে নিতে হয়। জাঁতাল কোন আলাদা দেব-দেবী নয়; এই পূজা পদ্ধতির নাম জাঁতাল। অনেকের কাছে অম্ববর্তী আম খাওয়ার পরব। আবার মাংস পিঠা খাওয়ার দিন বলে মনে করা হয়।

পালনীয় নেগ-নেগাচার;

(১) হাল, কোদাল, গাঁইট/গাঁইতিকে মাটির উপরে তুলে রাখা, যন্ত্রপাতি গুলির নীচে কাঠ কিম্বা পাথর রেখে দেওয়া;

(২) চাষের কাজ বন্ধ রাখা;

(৩) গ্রাম দেব/দেবীদের পূজা দেওয়া;

(৪) দুধ সহযোগে পাকা আম ভক্ষণ করা;

(৫) মাংস পোড়া বা মাংস পিটা খাওয়া;

(৬) নূতন বিহাই বাড়ীতে আম-কাঁঠাল পাঠানা।

- দুধ সহযোগে আম খেলে বিষাক্ত পোকা-মাকড় ও সাপের বিষ প্রতিরোধ করে। বর্ষাকালে পেটের রোগ নাশ করে।
- চামড়া ও চামড়া সমেত মাংস পোড়া খেলে বর্ষাকালীন আমাশয়ের মতো পেটের অন্যান্য রোগ হয় না।
- গ্রাম্য দেব-দেবীর পূজা দিলে মনে সাহস ও শরীরে বল বাড়ে। অসহায়তা দূর হয়। বিপদে-আপদে রক্ষক হিসাবে সব সময় কোন এক শক্তি পাশে আছে বলে মনে হবে। কেউ ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিতে কিম্বা না বলে গোপনে নিয়ে যেতে পারবে না।

"পাঁচ আঁটি"

কুড়মালি নেগাচারে প্রথম যে দিন কৃষক তাঁর জমিতে আমন ধান রোপন শুরু করেন সে দিন অনুষ্ঠান করে প্রথমে যে পাঁচটি আঁটির ধান লাগা হয় তাকে বলা হয় পাঁচ আঁটি করা। কৃষক গৃহিনী স্নান করে পবিত্র হয়ে ভিজে কাপড়ে পাঁচটি আঁটির ধানের চারাকে এক জায়গায় রেখে বাড়ী থেকে কাঁসার থালায় ধূপ-দীপ, সিঁদুর-কাজল, আমলা-মেথি বাঁটা, ধান-দূর্বা ঘাস নিয়ে পবিত্র মনে ঐ ধান আঁটিগুলির গোড়ায় সিঁদুর, কাজল, আমলা-মেথি বাঁটা দিয়ে ধান-দূর্বা দিয়ে চুমানোর পর প্রণাম করে প্রথম নিজের হাতে পাঁচটি আঁটির চারা কাদা ক্ষেতে রোপন করেন। কৃষক গৃহিনী বলদের কপালে এবং জোঁয়ালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপ এঁকে দেন। কৃষক বাকী সিঁদুর বলদের শিংয়ে দিয়ে দেন। তারপর স্বামী-স্ত্রী মিলে হাত জোড় করে নমস্কার জানান।

লোক বিশ্বাস — ধানের ফলন ভাল হয়।



"মনসা পূজা"

রপা (শ্রাবণ) মাসের সংক্রান্তির দিন মনসা পূজা। কুড়মালি নেগাচারে নিষ্ঠার সাথে এই দিনটি পালন করা হয়। লোক বিশ্বাস, মনসা সর্পের দেবী। নাগমাতা। মা মনসা সন্তুষ্ট থাকলে সর্প ভয় থাকে না। কুড়মালি নেগাচারে মা মনসার পূজা আসলে জলের পূজা। জল কৃষকের মনের আশা পূরণ করেন বলেই তিনি মনসা। মা মনসা। জল শীতলকারিনী, তৃষ্ণা নিবারণী, শুদ্ধকারিনী এবং বিষনাশিনী। জল বিষ হরণ করে বলেই তিনি বিষহরি।

পালনীয় নেগ-নেগাচার;

(১) গৃহকর্তাকে সারাদিন নিরম্বু উপবাস করা;

(২) নাপিতের কাছে দাড়ি-নখ কামানো;

(৩) গৃহিনীর নুতন খুঁচি-খোলায় ধান খৈ-শীতল ভেজে দেওয়া;

(৪) সন্ধ্যার সময় তুলসী থানে ধূপ-দীপ সহযোগে পূজা দেওয়া;

(৫) ঝিঙে, কুঁদরী, জুনহার (ভুট্টা) বলি দেওয়া;

(৬) ধান খৈ-শীতল গুড় সহযোগে ভোগ দেওয়া;

(৭) হাঁস বলি দেওয়া;

(৮) দুধ ঢাল, জল ঢাল দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করা;

(৯) রাত্রিতে হাঁসের মাংসের ঝোল খাওয়া;

(১০) সকালে ক্ষেতে, সজ্জি বাড়ীতে ডালি গাড়া।

লোক বিশ্বাস —

(ক) সর্প ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।

(খ) বর্ষাকালীন জলের সঙ্গে যদি পেটে জোঁক-কেঁচো প্রবেশ করে হাঁসের মাংসের ঝোল তার নাশ করে দেয়।

(গ) জলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

জাওয়া-করম উৎসব

ভাদর (ভাদ্র) মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে করম উৎসব অনুষ্ঠান। এই উৎসব কুড়মালি নেগাচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও গুরুত্ব সহকারে এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। জাওয়া-করম কৃষিসভ্যতা সূচনার স্মরণ, শষ্য ও সন্তান কামনা এবং ভাইয়ের মঙ্গল কামনার উৎসব। করম উৎসবের সাত নয় দিন পূর্বে জাওয়া পাতা হয়। সাত কিম্বা নয় রকমের শষ্যের দানা বাঁশের তৈরী টুপা, ডালা অথবা ছোট ঝুড়িতে ভিজে বালিতে বীজ ছড়িয়ে জাওয়া পাতা হয়। অবিবাহিত কুমারী কন্যারা জাওয়া পেতে থাকে। অত্যধিক যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে জাওয়া রক্ষণা-বেক্ষণ ও লালন-পালন করা হয়। প্রত্যেক দিন হলুদ গোলা জল জাওয়ার উপর ছিঁটিয়ে দেওয়া হয় এবং জাওয়া ডালিকে ঘিরে যৌথ ভাবে নাচ-গীত করতে হয়। একে বলা হয় জাওয়া নাচ। করমের দিন নিরম্বু উপবাসে থেকে করম-আখড়ায় দু'টি পাশাপাশি করম ডাল গেড়ে পূজা করা হয়। গোটা রাত ধরে করম কথা শুনে নাচগীত করে রাত্রি জাগরণ করা হয়। পর দিন সকালে নদী বা বড় জলাশয়ে করম ডালকে বির্সজন করা হয়। তারপর ধান গাছি ক্ষেত থেকে উপড়ে এনে পাঁচিলে গোবর দিয়ে সূর্যদেব এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিকৃতি এঁকে চিলঅ-শিয়ারীকে ভাত দিয়ে, আলতি পাতায় বাসি ভাতের ভোগ নিবেদন করে আলতি পাতায় বাসিভাত পারন বা পান্না করা হয়।

পালনীয় নেগ-নেগাচার;

(১) **জাওয়া পাতা;**

(ক) নদী, জোড়, বড় পুকুর ঘাটে যৌথভাবে যাওয়া;

(খ) স্নান করে ভিজে কাপড়ে ঝিঙে পাতায় তেল-হলুদ বাঁটা ও দাঁতনকাঠি রেখে দিয়ে আঁজলা জল দিয়ে প্রণাম করা;

(গ) টুপা, ডালা, ঝুড়িতে বালি ভর্তি করা;

(ঘ) বালির উপর সাত/নয় রকম (সরিষা, কুত্থি, রমা, জুনহার (ভুট্টা), যব, গম, ধান, অড়হর, মুগ) বীজ ছড়ানো;

(ঙ) হলুদ বাঁটা গোলা জল ছিঁটানো;

(চ) জাওয়ার সামনে ঝিঙে পাতায় হলুদ বাঁটা ও শাল দাঁতুন রেখে আঁজলা ভরে জল দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করা;

(ছ) দাঁড় ধরে যৌথভাবে জাওয়া ডালিকে ঘিরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরে ঘুরে জাওয়া গীত গেয়ে আড়াই পাক নাচ করা;

(জ) প্রণাম করে জাওয়া ডালিকে মাথায় করে নিয়ে ঘরের অভিমুখে যাত্রা করা;

(ঝ) পথে কোন তেমাথা চৌমাথা রাস্তা পড়লে সেখানে জাওয়া ডালি নামিয়ে জাওয়া নাচ-গীত করা;

(ঞ) করম আখড়ায় জাওয়া ডালি নামিয়ে জাওয়া নাচ-গীত করা;

(ট) বাড়ীতে এসে সুরক্ষিত স্থানে পিঁড়ি পেড়ে জাওয়া ডালিকে রাখা।

(২) কত রকমের জাওয়া পাতা হয় এবং কার জন্যে কিসের জন্যে জাওয়া;

(ক) বন জাওয়া; — বসমতী মায়ের বন, ডুংরী-পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, ক্ষেত-বাইদ, গোড়ায় শস্যের বেশী ফলনের জন্য একটি শালপাতার বঁহতায়;

(খ) বাগাল জাওয়া; — বাগাল, গাই-গরু ও গুসাঞ রায় ঠাকুরের জন্যে একটি শাল পাতার বহঁতায়;

(গ) গরাম জাওয়া; — গ্রাম রক্ষাকারী দেবতা গরাম ঠাকুরের স্মরণে একটি শালপাতার বঁহতায়;

(ঘ) সাঁচি জাওয়া; — করম (সুরজ) ঠাকুরের জন্য বাঁশের ডালি-টুপায় যে সত্যিকারের জাওআ পাতা হয়।

(৩) জাওয়া ডালির রক্ষণা-বেক্ষণ;

(ক) জাওয়া পাতা ঘাটের কাছে কোন পাথরের কোণে বন জাওয়া রেখে দেওয়া হয়। এমনভাবে পাথর ফেলে রাখা হয় য়াতে করে কোন পশুপাখী সহজে ঐ জাওয়া নষ্ট করে না দেয়।

(খ) বাগাল জাওয়া; — বাগাল জাওয়া রাখা হয় গরু চরানোর মাঠে কোন কিছুর আড়ালে। যাতে করে কেউ ঐ জাওয়া নষ্ট করে না দেয়।

(গ) গরাম জাওয়া; — গরাম জাওয়া রেখে দেওয়া হয় গরাম ঠাকুরের থানে।

(ঘ) সাঁচি জাওয়া; — সাঁচি জাওয়া রাখা হয় কোঠাঘরে কিম্বা কোন সুরক্ষিত কুলঙ্গিতে।

- জাওয়ার মা সবসময় জাওয়া ডালিকে নজরে নজরে রাখে।

- প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে হলুদ বাঁটা গোলা জল ছিঁটিয়ে দেওয়া হয়।
- আখড়ায়/আঙ্গিনায় পিঁড়ি বিছিয়ে তার উপর জাওয়া ডালিকে রেখে ঘিরে ঘিরে নাচ করা হয়। ভালভাবে জাওয়া পরীক্ষা করে দেখা হয়, জাওয়া কি অবস্থায় আছে।

(৪) জাওয়ার মায়েদের পালনীয় বিধি-নিষেধ;—

কোন প্রসূতি তার সন্তানকে সুস্থ রাখার জন্য যেমন কঠিন/কঠোর নীতি-নিয়ম পালন করে থাকেন। অনুরূপ ভাবে জাওয়ার মায়েরা তার বাড়তি নীতি-নিয়ম পালন করে থাকে।

(ক) টক, বাসি, ঝাল খাবার খায় না।
(খ) শাক খায় না।
(গ) গুড় খায় না।
(ঘ) বাড়তি নুন নিয়ে খায় না।
(ঙ) বেশী গরম খাবার খায় না।
(চ) মাটিতে পড়ে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে খায় না।
(ছ) হাবু দিয়ে স্নান করে না।
(জ) স্নান করার পর গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ে না।
(ঝ) ভিজে মাটিতে পায়খানা করে না।
(ঞ) কোন গাছের ডাল ভাঙে না।
(ট) রাগ করে থাকে না।
(ঠ) ঝগড়া-মারামারি করে না।
(ণ) চিৎ হয়ে ঘুমায় না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৫) করমের সঁজত/বার করা;—

ভাদর (ভাদ্র) মাসের শুক্ল পক্ষের পার্শ একাদশীর দিন করম। তার আগের দিন অর্থাৎ দশমী তিথির দিন সঁজত/বার। করম পরবের প্রস্তুতির দিন।

পালনীয় নেগাচার;

(ক) ঝিঙাপাতা, শালদাঁতন, হলুদবাঁটা, তেল সঙ্গে নিয়ে যারা করম করবে তারা এক সাথে পুকুরঘাটে স্নান করতে যাওয়া;
(খ) বাঁধের ঘাটে তিনটি ঝিঙাপাতা বিছিয়ে পাতার উপর দাঁতুন, হলুদ, তেল দিয়ে তিন আঁজলা জল দিয়ে প্রণাম করা;

(গ) স্নান করে ঘরে এসে তিনটি শালপাতার বঁতায় গুড়, চিঁড়ে, দই, দুধ, ঘি, মধু, আতপ চাল এক সঙ্গে মিশিয়ে ভোগ তৈরী করে তুলসী থানের কাছে ছাঁছা-কলে রেখে দেওয়া;

(ঘ) তিনটি শালপাতার বঁহতায় জল ভরে অনুরূপ ভাবে ছাঁছাকলে রেখে দেওয়া ও প্রণাম করা;

- বাঁধের ঘাটে তেল-হলুদ ও জল দেওয়ার সময় পরবর্তী মনে মনে বলবে আদিগুরু বুঢ়াবাবার পিড়হি পুরুষগণ, বাবার কুলের, মায়ের কুলের পূর্বপুরুষগণ তোমাদের মুখ ধোয়ার জন্য ও স্নান করার জন্য হলুদ-তেল-দাঁতুন দিলাম। তোমরা মুখ ধোও, সিনান কর।
- অনুরূপ ভাবে ছাঁছাঁকলে ভোগ ও জল দিয়ার সময় সূর্য্যদেব পৃথিবী মা ও পিড়হি পুরুষ ও পিড়হি জননীদের স্মরণ করে এবং এই ভোগ যাতে তাঁরা গ্রহণ করেন তার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

(৬) করম গাছকে আমন্ত্রণ;

যে গাছের ডাল নিয়ে করম ডাল আখড়ায় গাড়া হবে সঁজত/বারের দিন করম পূজারী লায়া ঐ গাছকে আমন্ত্রণ জানান। করম গাছকে লায়া নিবেদন করেন কাল অর্থাৎ করমের দিন তোমাকে সসম্মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথা সময়ে আসব। তোমাকে মাথায় তুলে আখড়ায় নিয়ে যাব।

পরবতীরা কাল উপবাস করবে। তোমাকে পূজা দিবে। নাচ-গীত করে জাগরণ করবে। তুমি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

নেগাচার পালন;

(ক) লায়া নূতন/কাচা ধুতি পরবেন;

(খ) করম গাছের গোড়ায় মাডুলি দিবেন;

(গ) মাডুলির উপরে পান-সুপারি রাখবেন;

(ঘ) ধূপ-ধূনা, প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করবেন।

(৭) করমের দিন;

কুমারী মেয়ে এবং সদ্য বিবাহিত মেয়ে যারা করমের ব্রত উপবাস করবে তারা পূজার জন্য ফুল-ফল আহরণ করার জন্য সকাল বেলা দল বেঁধে বনকে যাবে। সারা দিন বনে বনে ফুল-ফল যেমন আঁওলা, হরিতকি, শতমূলী, বন আদা, কেঁওয়া, দূর্বাঘাস, তুলসী সংগ্রহ করবে। শাল পাতার ডঁড়রা (বড় পাত্র) তৈরী করে হাতে হাতে নিয়ে আড়বেলির সময় ঘর ফিরবে ও দলের সবাই

নিজের ডঁড়রাগুলি এক জায়গায় রেখে করম নাচ করবে। ঘরে ফিরবার সময় বনজাওয়া, বাগাল জাওয়া ও গরাম জাওয়াকে যে যে জায়গায় রেখেছিল সেই সেই জায়গায় গিয়ে জাওয়াকে বার করে করম নাচ করবে।

সন্ধ্যার পূর্বে স্নান করে করম ডালা সাজিয়ে আখড়ায় করম পূজা করার জন্য আসবে। রাত ভর নাচ-গীত করবে।

পালনীয় নেগাচার;

(ক) ঘর-আঙ্গিনা গোবর জল দিয়ে লরা-লাপটা করা;

(খ) করম আখড়া লরা-লাপটা করা;

(গ) বন থেকে পূজার ফুল-ফল সংগ্রহ করা;

(ঘ) বাঁধ পুকুরঘাটে স্নান করতে গিয়ে কাঁকুড় পাতায় দাঁতুন, হলুদ বাঁটা ও তেল রেখে আঁজলা ভরে জল দেওয়া; প্রণাম করে তিন কূলের পূর্ব পুরুষদের স্মরণ করা;

(ঙ) নূতন ডালায় পূজার সারভার (বন থেকে সংগৃহীত ফুল-ফল, গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল, ধূপ-ধুনা, আতপ চাল, কাঁকুড়ের বেটা, দুধ, গুড়, ঘি, মধু, জাগর) সাজিয়ে আলতি পাতা ঢাকা দিয়ে নূতন/কাচা কাপড় পরে করম আখড়ায় পূজা দিতে যাওয়া।

(৮) করম ডাল আনা;

যে করম গাছকে লায়া আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন সেই গাছের কাছকে লায়া বাজ-বাজনা সহকারে যাবেন। গাছের তলায় গিয়ে করম গাছের গোড়ায় গুঁড়ি সিঁদুর-কাজল দিবেন। আতপ চাল, গুড়, ঘি, মধু সহযোগে ভোগ নিবেদন করবেন। শালপাতার বহঁতায় প্রদীপ জ্বেলে প্রণাম করে দু'টি ডাল কেটে সেই ডাল মাথায় চাপিয়ে জল ঢাল দিয়ে বাজনা বাজিয়ে করম আখড়ায় নিয়ে যাবেন।

(৯) করম ডাল গাড়া ও করম পূজা;

করম আখড়ায় মাঝ বরাবর প্রথমে দু'টি গর্ত খুঁড়া হবে। গর্তের ভিতর তামা-লৌহার টুকরা, হলুদ গাঁঠা, দূর্বাঘাস, হরিতকি দিয়ে ডাল গাড়া হবে। একটি ডাল করম রাজা (সূর্যদেব), অপরটি বসমতামার (পৃথিবী) প্রতীক। দু'টি ডালকে হলুদ কাপড়ের টুকরা বা হলুদ গাবা সূতা দিয়ে এক সঙ্গে জড়িয়ে বেড় দিতে হবে। দুইয়ের মিলন (পুরুষ শক্তি ও প্রকৃতি শক্তি) না হলে কোন সন্তান-ফসল উৎপাদন হয় না। দু'টি ডালের পাশে একটি শিকড় সমেত ধানগাছি রেখে দেওয়া হয়।

দু'টি ডালের পাশে দু'টি আলপনা, জাগর হাঁড়ির জন্য একটা আলপনা এঁকে তার উপর ধান রেখে ধানের উপর দু'টি ঘটভাঁড় ও একটি গায়ে ছিদ্রকরা নূতন বড় মাটির হাঁড়ি বসিয়ে দেওয়া হয়। ঘটভাঁড়ে ও জাগর হাঁড়িতে তিনটি করে সিঁদুরের উপর থেকে নীচে দাগ এঁকে দেওয়া হয়। জাগর হাঁড়ির ভিতরে একটি শালপাতার তৈরী খোলায় ভিজে বালি ভর্তি করে জাগর বসিয়ে রেখে দিতে হয়। জাগরের হাঁড়ির মুখে একটি শালপাতার পতরিকে মাঝখানে সামান্য ফাঁক তৈরী করে বসিয়ে দিতে হয়। ঘটভাঁড়ের ভিতরে জলভর্তি করে একটি হরিতকি কিম্বা গোটা সুপারী ফেলে পাঁচ/সাত পাতা যুক্ত আমের ডাল গুঁজে দিতে হয়। ঘটভাঁড়ের সামনে শুকনো আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে করম রাজার জন্যে একটি, ধরতি মায়ের জন্যে একটি এবং তার সামনে অন্যান্য দেবতাদের জন্যে আতপচালের গুঁড়ি দিয়ে নয়টি ঘর যুক্ত একটি খঁড় পাততে হয়। খঁড়টি নিম্নলিখিত আকারের হবে।

করম গুঁসাঞ		বসমতা মাঞ

জাহির মাঞ	বুঢ়াবাবা	মহামাঞ
গরৈইআ	গুঁসাঞরাই	গাঁগেরাম
বড় পাহাড়	পাঁচবহনি	অন্যান্য

খঁড়ের প্রতিটি ঘর এক এক জন দেব/দেবীর জন্য একটি ঘর।

লায়া একটি কাঁসার ঘটিতে জল নিয়ে ঘটির মুখে তিনটি আম পাতা চুবিয়ে নিজের মাথায়, পরবতীদের মাথায় এবং আখড়ার চারধার জল ছিটিয়ে দিবেন। নিজের অষ্টঅঙ্গে চন্দন/রহিন মাটির ফোঁটা নিবেন এবং অন্যান্য পরবতীদের কপালে ফোঁটা নিতে বলবেন। লায়া ঘটভাঁড়ে, ধান গাছিয়ে, করম ডাল, জাগর হাঁড়িয়ে, কাঁকুড়ে গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল দিবেন। অন্যান্য পরবতীদের করম ডালে ধান গাছিয়ে আপন আপন কাঁকুড় বেটাকে দিতে বলবেন। জাওয়া ডালিয়ে গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল দিয়ে ডালের পাশে এবং কাঁকুড়ের বেটাকে কাঁকুড় পাতার বিছানা করে তার উপর শুইয়ে দিতে বলবেন। আপন আপন বেটার গায়ে হলুদ গাবা নেকড়া দিয়ে দিতে বলবেন।

পরবতীরা আপন আপন ডালায় সারভার নিয়ে চারঅ ধার বসবে। লায়া প্রতিটি দেবতার ঘরে সিঁদুরের দাগ দিবেন। সিঁদুরের দাগের উপরে একটি

করে তুলসী পাতা এবং তুলসী পাতার উপরে আতপ চাল, দুধ, গুড়, ঘি, মধু এক সঙ্গে মিশিয়ে ভোগ তৈরী করে নিবেদন করবেন, তারপর ফুল, দূর্বাঘাস দিবেন। তারপর লায়া এক এক দেব/দেবীকে স্মরণ করে ফুল দিবেন। পরমা প্রকৃতি শক্তি জাহির মাঞ, আদি গুরু বুঢ়াবাপ, আদি গুরু মাতা মহামাঞ, গরইআ, গসাঞইরাই, গাঁগরাম, বড় পাহাড়, বাঘুৎ, চাঁদঅরাই ও অন্যান্য গ্রাম্য দেব-দেবীদের স্মরণ করে ফুল দিবেন। তাঁরা সবাই উপস্থিত থেকে করমপূজা সার্থকরূপে করার জন্য শক্তি ও সহায়তা দান করেন এই প্রার্থনা করবেন।

লায়া এক এক ঝাড়/গোষ্ঠীর মেয়ে/বউদের ডাল তলের কাছে আসতে বলবেন। লায়ার নির্দেশ মত বসে বাম হাতে জাগর ডান হাতে জল ভর্তি বঁহতা তাতে একটি হরিতকি, দূর্বাঘাস ও কিছু আতপ চাল দেওয়া থাকবে। ডান হাত বাম দিকে, বাম হাত ডান দিকে পেঁচিয়ে বসে করম রাজা ও অন্যান্য দেব/দেবীদের তাঁদের দেহ-মন পবিত্র হয় এই প্রার্থনা করবে। ডান হাতের বঁহতার জল দেব/দেবীর আর্শীবাদ মনে করে তিনবার আপন মাথায় ছিঁটিয়ে নিতে হবে।

কাঁকুড়ের বেটাকে হাতে নিয়ে তার জন্য করম গুঁসাঞইয়ের কাছে বর প্রার্থনা করবে। বেটা যেন উপযুক্ত ও আর্দশ চরিত্রের হয়। মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে সমাজের জন্য বেটাকে দান করে করম গাছের তলে কাঁকুড় পাতার বিছানা করে তার উপর দিয়ে দিবে। জাগর হাতে নিয়ে করম ঠাকুরের কাছে আপন আপন ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে তাঁকে স্মরণ করে প্রদীপ রেখে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করবে। এক ঝাড়ের মেয়েদের জাগর (প্রদীপ) দেওয়া হয়ে গেলে অপর গুষ্টির মেয়ে-বউরা আসবে অনুরূপ ভাবে তারাও জাগর দিয়ে প্রণাম করে যাবে।

লায়া খঁড়ের চারধারে দুধ ঢাল-জল দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করবেন এবং পরবর্তীকালে করম-ডালকে কল আঁকাড় (আলিঙ্গন) করতে নির্দেশ দিবেন। পরবতীরা করম ঠাকুরকে কলআঁকাড় করে জীবন্ত ফুলের মালা পরাবে।

কমর ডালকে দিয়ে পরবতীরা দাঁড় ধরবে। দাঁড়ে কোথাও যেন ফাঁক না থাকে। মনে করা হয় কুমারী মেয়েরা এক একটি জীবন্ত ফুল। ঐ অবস্থায় আড়াই পাক জাওয়া নাচ করতে হয়। গীত গাওয়া হয়;—

"দেহু করমরাজা দেহু আশীষ রে,
ভআ মরঅ বড়হত লাখঅ বরিষ।
দেবোঁ তো করমতি দেবোঁ আশীষ গো,
ভআ তরঅ বাড়হত লাখঅ বরিষ।।"

পরবতীরা লায়া, অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করে আর্শীবাদ নিবে। তারপর নিজেদের মধ্যে কল আঁকড় (আলিঙ্গন) করবে।

আর্শীবাদ নেওয়ার বাদে লায়া কিম্বা পারমগম কোন ব্যক্তি করম কথার উপাখ্যান শুনাবেন। পরবতীরা করম কথা শুনবে। কথক উপাখ্যান চলতে চলতে বলবেন — "পরবতীরা ফল দান করা।" পরবতীরা ঠাকুরকে ফল দান করবে। তাদের সার ভারের ডালায় আমলকি, হরিতকি ফল বন থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে।

— "পরবতীরা ফুল দান কর।"

পরবতীরা কেয়া, বেলদানদরি, ধানফুল করম ঠাকুরকে দান করবে।

— "তোমরা দুধ ঢাল দাও।"

পরবতীরা দুধ ঢাল দেয়।

— "জল ডাল দাও।"

— পরবতীরা জল ঢাল দেয়।

— করম কথা শেষ হলে পর অন্যান্য মা-বোনেরা দাঁড় ধরে করম ডালকে ঘিরে করম নাচ-গীত করে। এমনি নেগাচার করতে করতে রাত শেষ হয়ে যায়।

(১০) করম ডাল ভাসান ও জাওয়া ডালি ভাঙা;

দ্বাদশী তিথির দিন সকালে করম ডাল তলে মাডুলি দিয়ার বাদে পরবতীরা প্রণাম ও কলআঁকাড় করে। আড়াই পাক ঘুরে জাওয়া নাচ করা হয়। এই সময় যে জাওয়া গীত গাওয়া হয় তা হল;—

"আ'জরে করম ঠাকুর ঘরে দুয়ারে রে।
কা'ল রে করম ঠাকুর কাঁশ লদীর পারে।।"

লায়া করম গাছ উপড়ে দেয়। জাওয়া ডালির জাওয়া উপড়ে দেওয়া হয়। ঐ চারাগুলি তুলসী থানে, গোয়ালঘরে, কোঠা ঘরে, গোবর গাদায়, ধানক্ষেতে, সবজিক্ষেতে, ঘরের চালের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

করম ডাল মাথায় করে অন্যান্য ফুল পাতা একটি ঝুড়ি/ডালায় নিয়ে মাথায় করে কোন পুকুর ঘাটে কিম্বা নদীর ঘাটে দলবল সহকারে করমগীত গাইতে গাইতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঐ গুলি ভাসিয়ে দিয়ে স্নান করে সবাই ঘরে ফিরে আসে।

ঘরে ফিরে আসার সময় পরবতীরা ধানক্ষেত থেকে এক একটা ধানগাছি শিকড়সহ তুলে ঘর আসে। ঘরের পাঁচিলে গোবরগুলো জল দিয়ে তুলসী

থানের আকারে একটি আকৃতি তৈরী করে। তারপর চালগুঁড়ি, সিঁদুর, কাজলের ফোঁটা দিয়ে করম ঠাকুর, ধরতি মাঞ, চাঁদঅরাই, গরইআ গুঁসাঞই, অন্যান্য দেব-দেবী এবং গ্রহ-উপগ্রহকে স্মরণ করে ছবি আঁকে।

করমের পারনা/পান্না;— পরবতী তিনটি শালপাতায় বাসি ভাত, তিনটি শালপাতার বঁহতায় তরিতরকারী ও তিনটি বঁহতায় জল তুলসী থানের পাশে ছাঁছাঁকলে আদি গুরুকুল, বাবার কুল ও মায়ের বাবার কুলের পূর্ব পিড়হি পুরুষ-পিরহি জননীদের স্মরণ করে নিবেদন করে প্রণাম করে। মনে মনে ঐগুলি গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানায়। পরবতিরা পূর্ব পুরুষদের বাসিভাত দেওয়ার পর পাঁচিরে আঁকা প্রতিকৃতির সামনে একটি আলতি পাতায় বাসিভাত, তরকারী এবং একটি বঁহতায় জল দিয়ে প্রণাম করে। তারপর নিজের জন্য একটি আলতি পাতায় বাসিভাত, বাসি তরকারী নিয়ে পারন করে।

জাওয়া-করম অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য; — পরবতী কালে প্রকৃত মা হতে পাবার তপোভ্যাস করা; কামনা করা সমাজ ও দেশের জন্য আদর্শ সন্তান লাভ করা। কৃষি সভ্যতা আবিষ্কারের জন্য গর্ব বোধ করা। অধিক ফসল ও ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করা।



ডাল পরব / জিতা উৎসব

কুড়মালি নেগাচারে ডাল পরব বা জিতা উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠান। করম উৎসব যেমন কুমারী মেয়েদের উৎসব, জিতা তেমনি সন্তানবতী মায়েদের অনুষ্ঠান। একে জিতাষ্টমী বা জিতাষাট বলা হয়। ভাদর (ভাদ্র) মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর তিথিতে এই অনুষ্ঠান হয়।

মহামাঞ ষষ্টিকে বলা হয় জিতামাঞ। জিতামাঞ পূর্ণ মাতৃত্বের আধার। ছেলের মা হলেই প্রকৃত মা হওয়া যায় না। ষষ্ঠি — জিতিয়া মায়ের গুণে ও কৃপায় মা হওয়া যায়। জিতিয়া মাঞ ষোড়শবিধ গুণাবলীর পূর্ণ অধিকারিণী। কোন মা এই ষোড়শবিধ জ্ঞানের অধিকারিণী হলে পর প্রকৃত মা হতে পারেন। গুণাবলী হল — (১) নারীত্ব, (২) স্নেহ-মমতা, (৩) অহংকারহীন, (৪) বিনয়তা, (৫) উদারতা, (৬) নিয়মানুবর্তীতা,(৭) সুভাষিণতা, (৮) সহিষ্ণুতা, (৯) দৃঢ়তা, (১০) সংযম, (১১) সৎজ্ঞান, (১২) সৎচিন্তা, (১৩) সৎকর্ম, (১৪) স্বাস্থ্যজ্ঞান, (১৫) কৃতজ্ঞতা বোধ ও (১৬) লালন ক্ষমতা।

সন্তানবতী মায়েরা জিতাব্রত করে তাঁদের সন্তান সন্ততিদের আদর্শ চরিত্রবান, গুণবান রূপে গড়ে তুলতে পারেন তার জন্য জিতিয়া মাঞের কাছে ষোড়শবিধ গুণ প্রার্থনা করেন।

শাশুড়ি মায়ের কাছ থেকে এই ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকে শুনে অন্যদের দেখে ব্রতের নেগ-নীতি-নেগাচার শিখে নিতে হয়।সংসার ও সমাজ যাতে করে সুখের হয় তার জন্যে জিতিয়া উৎসব পালন। কেমন ভাবে পরিবারের সম্পদ নিজে ভোগ করবে, অন্যদেরকে ভাগ দিবে; কিভাবে গুরুজন ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় ও কাজে ব্যবহার করবে এই ব্রতের মাধ্যমে তা শিখে হৃদয়ঙ্গম করে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখা যায় তারই অনুশীলন করা। সন্তান তার নিজের একার জন্যে নহে। সন্তান সমাজ ও দেশের জন্য। জিতিয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই ধ্যান-ধারণাকে জাগরুক করে রাখা হয়।

করম অনুষ্ঠানের অনুরূপ জিতিয়া উৎসব ও নেগ-নেগার পালন করা হয়। সঁজত/বার, উপবাস, আঁকুরথাপা, বন থেকে ফুল-ফল, পাত-দাঁতুন সংগ্রহ, আখড়ায় ডাল গাড়া, ডাল পূজা, জাগরজ্বালা, পূর্বপুরুষদের ভোগ দেওয়া, জাগরণ করা, আঁকুর ভাঙ্গা, পারনা করা, আঁকুর পিঠা বিলানো ইত্যাদি বহু রকম নেগাচার পালন করতে হয়।

(১) সঁজত/বার করা ঃ

ভাদর মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমির দিন যাঁরা জিতিয়া ব্রত উদযাপন

করবেন তাঁরা প্রথমে নাপিতের কাছে নখ কেটে নিয়ে একটি নূতন বাঁশের ডালায় সারভার সাজিয়ে ছোলা, বাটলা, কুথি, মুগ, তেল, হলুদ বাঁটা, আতপচাল, ঝিঙা পাত, শাল দাঁতুন, কাঁকুড় এবং একটি ঘটি সঙ্গে করে বাঁধ, পুকুর কিম্বা নদীর ঘাটে সিনান করতে যাবেন। স্নান করতে যাওয়ার আগে ঘরদোর গোবর জল দিয়ে লরা-লাপটা করে নিবেন। পুকুর ঘাটে যেয়ে প্রথমে তিনটি ঝিঙা পাত এক সারিতে বিছিয়ে দেবেন। তিনটি পাতায় পূর্ব মুখ হয়ে দাঁতন, হলুদ বাঁটা, তেল দিয়ে তিন আঁজলা জল দিয়ে প্রণাম করবেন। প্রণাম করার সময় তিন কুলের পিড়হি জননীদের স্মরণ মনে মনে বলবেন, — "আমি তোমাদের জন্য জল দাঁতন ও হলুদ-তেল দিলাম। তোমরা মুখ ধোয়, সিনান কর এবং তোমরা বার/সঁজত করে আঁকুর থাপনা কর। আমাকেও আঁকুর থাপনার জন্য সহায়তা কর।"

(২) আঁকুর থাপা ঃ

পরবর্তী পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে সারভার ডালায় নিয়ে একটি ঘটিতে জল ভর্তি করে ঘরে আসবেন, ঘরে এসে তুলসী থানের সামনে বসে ধূপ জ্বেলে একটি কাঁসা/পিতল/তামার ঘটিতে তিনটি সিঁদুরের দাগ নিয়ে ঘটির ভিতরে এক হাত ভর্তি করে তিনবার তিন লট ছোলা দিয়ে পরিমাণ মত জল ঢেলে দিবেন। জল খুব বেশী পরিমাণে যেন না হয়ে যায়। এরপর একটি শাল পাতার উপরে পাঁচটি বাটলা, পাঁচটি মুগ, পাঁচটি আতপ চাল ও একটি ফুল সমেত কচি কাঁকুড় রেখে পাতার মুখ কাঠি (খড়িকা) দিয়ে টিপে (সেলাই করে) ঘটির ভিতর রেখে প্রণাম করবেন।প্রণাম করার সময় তিন কুলের পিড়হি জননী ও জিতিয়া মাঞকে স্মরণ করে মনে মনে বলবেন — "ওগো পিড়হি জননী। তোমরা আঁকুর পাতাঅ। আমি আঁকুর থাপলাম। তোমরা আশীর্ব্বাদ করঅ, আমার আঁকুর যেন নষ্ট হয়ে না যায়।" আঁকুর ভাঁড় ঘরের কোঠা ঘরের ভিতর কুলঙ্গীতে রেখে দেওয়া হয়। ঐ ভাঁড় ছোঁয়া নিষেধ।

(৩) পিড়হী জননীদের ভোগ দিয়া ঃ

আঁকুর থাপনার পর পরবতি দুধ, গুড়, দই, ঘি, মধু ও চিঁড়ে এক সঙ্গে মিলিয়ে ভোগ তৈরী করে তিনটি বঁহতায় ভোগ ভাগ করে, তিনটি বঁহতায় জলভর্তি করে তুলসী থানের পাশে খড়ের চালার উপরে পূর্ব মুখ হয়ে রেখে দিয়ে গলায় কাপড় নিয়ে তিন কুলের পিড়হি জননী ও জিতিয়া মাঞকে স্মরণ করে মনে মনে বলবেন, — "ওগো আমার পিড়হি জননীগণ, জিতিয়া মাঞ

তোমাদের জন্য ভোগ ও মুখ-হাত ধোয়ার জন্য জল দান করলাম। তোমরা দয়া করে তা গ্রহণ কর।”

সনঝার সময় আতপ চালের গুঁড়ি দুধ-গুড় মিশিয়ে নূতন মাটির খাপরিয়ে (কড়াই) ঘি ঢেলে পিঠে তৈরী করে আঁকুর থাপনার পরে যে জায়গায় ভোগ দেওয়া হয়েছিল সেইখানে তিনটি বঁহতায় জল ভর্তি করে রেখে দিয়ে প্রণাম করবেন এবং মনে মনে তিন কুলের পিড়হি জননী ও জিতিয়া মাঞকে স্মরণ করে বলবেন — “আগো আমার তিন কুলের পিড়হি জননীগণ, জিতিয়া মাঞ তোমাদের খাওয়ার জন্যঘিয়ের পিঠা দিলাম তোমরা তা গ্রহণ কর।” এই অনুষ্ঠানকে অনেকে ‘চিলঅসিয়ার’ বলে থাকে। পরবর্তী সন্ধ্যায় নিজ হাতে রান্না করা খাবার তৈরী করে খাবেন অন্যের রান্না করা খাবার কিম্বা অন্যের ছোঁওয়া খাবার গ্রহণ করবেন না।

(৪) জিতিয়া পরবের উপবাসের দিন ঃ

ভাদর মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথির দিন জিতিয়া পরবের উপবাস। ঐ দিন বিহানেই (সকাল) ঘর, দুয়ার, উঠান, আঁগিনা গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে লরা-লাপটা করা হয়।

জিতিয়া মাঞয়ের পরবতিরা দল বেঁধে বনে যাবেন জিতা পূজার জন্য ফুল-ফল, পাত-দাঁতুন আহরণের কারণে। বনে তাঁরা হরিতকি, আমলা, কেয়াফুল, বেলনদরী, তুলসী, দুর্বাঘাস, বনআদা, ধানপাতা, শতমূলী ও অন্যান্য ফুল, সালপাতা এবং দাঁতুন সংগ্রহ করবেন।

বন থেকে ফল-ফুল সংগ্রহ করে নিয়ে ঘর ঘুরে আসার পর হলুদ বাঁটা, তেল, কাঁকুড় পাতা সঙ্গে করে পুকুর ঘাটে সিনান করতে যাবেন।

(৫) বেটা ভাসা ঃ

পুকুর ঘাটে তিনটি কাঁকুড় পাতা এক সারিতে বিছিয়ে পাতার উপর দাঁতুন, হলুদ বাঁটা, তেল রেখে তিন আঁজলা জল দিয়ে প্রণাম করবেন। প্রণাম করার সময় মনে মনে তিন কুলের পিড়হি জননী ও জিতিয়া মাঞকে স্মরণ করে বলবেন — “অগো পিড়হি জননীগণ তোমরা ডাল পূজা করবে। তোমাদের মুখ ধোয়ার জন্য জল দাঁতুন, সিনান করার জন্য তেল-হলুদ জল দিলাম তোমরা তা গ্রহণ কর। আমি ডাল পূজা করব। তোমরা আমাকে সহায়তা করবে।”

পরবতি স্নান করার সময় হাতে একটি পাতা সমেত কাঁকুড় নিয়ে সূর্যঠাকুরের দিকে তাকিয়ে শরীর কোমরের উপর জলে ডুবিয়ে সূর্যদেবকে

স্মরণ করে মনে মনে বলবেন — "হে করম গুঁসাঞই — ধরমগুসাঞই — মহারাই সূর্যদেব আমার সন্তান যেমন গুণে, মানে, খাতিরে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে সমাজের-দেশের আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। আমাকে সেই বরদান করঅ। আমার সন্তানকে সমাজরূপ গঙ্গায় দান করছি। তুমি তাকে দেখো। সব সময় তার স্বহায় হউ।" এই বলে দুই হাত উপরে তুলে জলে ডুব দিয়ে মাথার উপর দিয়ে পিছনের দিকে কাঁকুড় প্রতীক বেটাকে জলে বাসানোর পর সিনান করে ভিজে কাপড়ে পরবতি ঘর আসবেন।

(৬) আঁকুর ভাঙা ঃ

পরবতি পুকুর থেকে স্নান করে এসে বাড়ীর তুলসী থানের সামনে ভিজে কাপড়ে ধূপ-ধুনা জ্বেলে আঁকুর উবুড় করে বার করা হয়। একে আঁকুর ভাঙা বা আঁকুর ঔঝলা বলা হয়।

(৭) আখড়ায় ডাল গাড়া ঃ

গাঁয়ের কোন আখড়ায় অথবা কারো আঁগিনায় জিতিয়া ডাল গাড়া হয়। সেখানেই পূজা দেওয়া হয়। লায়া জিতিয়া পূজা করেন অন্যান্য পরবতিদের পূজা দেওয়ার নির্দেশ ও সহায়তা করেন।

আখড়া/আঁগিনায় মাঝ বরাবর একটি গর্ত খুঁড়া হয়। ঐ গর্তের ভিতর প্রথমে একটি গোটা সুপারী, একটি হরিতকি ফল. তামা-লৌহার টুকরা, হলুদ গাঁঠা, আতব চাল, দূর্বাঘাস একটি শাল পাতার উপরে রেখে পোটলা বেঁধে গর্তের ভিতরে ফেলে দেওয়া হয়। একটি আঁখঝাড় যাতে তিন, পাঁচ, সাতটি অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যক আঁখ থাকবে তা গেড়ে দেওয়া হয়। আঁখ ঝাড়ের গোড়ার সঙ্গে আম, বট, অশত্থ, পাকুড়, ডুমুর, কেঁওয়া, বন আদা, চিড়চিড়ি, শিয়াললেজুড় (শতমূলী) ভেলা ইত্যাদি ডাল বেঁধে দেওয়া হয়। একটি শিকড় সমেত বিজোড় সংখ্যার ধান গাছি, একটি ঘোলবাঁধানী পাশে রেখে দিতে হয়। চাল গুঁড়ির আলপনা এঁকে ধান দিয়ে তার উপরে একটি ঘটভাঁড় এবং একটি জাগর হাঁড়ি বসিয়ে দেওয়া হয়।

পরবতিরা সারভার একটি নূতন ডালায় সাজিয়ে নূতন কাপড় পরে ডাল তলে পূজা করতে যাবেন। সারভারের ডালায় বঁহতায় আতব চাল, চিড়া, গুড়, দুধ, দই, ঘি, মধু, সিঁদুর, কাজল, ধূপ-ধুনা, গোটা সুপারী, হরিতকি, কাঁকুড়ের বেটা, কাঁকুড় চেটা, কাঁকুড় পাতা, আঁকুর হলুদ বাঁটা, গুঁড়ি, একটি হলুদ গাবা নেকড়া, জাগর। জাগর বাতিটি ঘরেই জ্বেলে ডালার ভিতরে রেখে আলতি

পাতা ঢাকা দিয়ে নিয়ে যাবেন। পরবতিরা আখডাল ঘিরে নিজের নিজের সারভার নিয়ে বসবেন।

(৮) জিতিয়া পূজা ঃ

পূজারী লায়া নিজে চন্দন/রহিন মাটির ফোঁটা নিয়ে অন্যান্য পরবতিদের নিতে বলবেন। একটি ঘটিতে জল ভর্তি করে তিনটি আমপাতা নিয়ে ঘটির জল জিতিয়া আখড়ার চারপাশে পরবতিদের গায়ে ছিটিয়ে দিবেন। তারপর ঘটভাঁড়ে, জাগর হাঁড়িয়ে তিনটি করে সিঁদুরের দাগ দিবেন। ঘটভাঁড় জল ভর্তি করে একটি গোটা সুপারী হরিতকি ফল জলের ভিতর ফেলে দিয়ে ঘটভাঁড়ের মুখে বিজোড় সংখ্যার পাতা যুক্ত একটি আমডাল গুঁজে দিবেন। ঘট ভাঁড়ের সামনে একটা চাল গুঁড়ির ঘর কাটবেন। তারপর তার সামনে চালগুঁড়ো দিয়ে একটি নয় খোপ বিশিষ্ট খঁড় আঁকবেন। চিত্রটি নিম্নরূপ। সামনের ঘরটি জিতিয়া মাঞয়ের অন্যান্য ঘর এক এক দেব/দেবীর জন্য—

জিতিয়ামাঞ

করম গুঁসাঞ	জাহির মাঞ	বুঢ়াবাবা
মহামাঞ	গুঁসাঞরাই	গাঁগেরাম
বসমতা মাঞ	বড় পাহাড়	গরৈইআ ও অন্যান্য

পূজারী লায়া আখ ডাঁড়িয়ে, ধান গাছিয়ে গুঁড়ি, সিঁদুর-কাজল দিবেন। অন্যান্য পরবতিদের সিঁদুর কাজল দিতে বলবেন। পরবতিরা গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল দিয়ার পর চাকতির আকারে কাটা কাঁকুড় আখ ডালের পাতায় বেঁধে দিবেন।

লায়া পরবতিদের ডালকে চুমাতে বলবেন। সন্তানের প্রতীক কাঁকুড় ফলকে কাঁকুড় পাতা আখ গাছের সামনে বিছিয়ে রেখে দিতে বলবেন। কাঁকুড় ফলের উপর হলুদ গাবা নেকড়া দিয়ে অর্দ্ধেক পরিমাণ ঢেকে দিতে বলবেন। লায়ার নির্দেশক্রমে ঐ কাজগুলি করবেন। ঐগুলি করার পর প্রণাম করবেন। লায়া আঁক দেওয়া ঘরে প্রত্যেক দেব/দেবীদের নির্বাচিত স্থানে প্রতিটিতে প্রথমে সিঁদুরের দাগ, তারপর, সিঁদুর দাগের উপরে তুলসী পাতা, তুলসী পাতার উপরে দূর্বাঘাস এবং চিঁড়ে, আদব চাল, গুড়, ঘি, মধু, দুধ, দুই আঁকুর

মিশিয়ে ভোগ তৈরী করে এক এক দেব/দেবীকে স্মরণ করে ভোগ দিবেন। তারপর প্রতি ঘরে দেব/দেবীদের স্মরণ করে ফুল দিবেন।

ধরমগুরু বুড়াবাবাকে স্মরণ

(সকল পরবতি হাতে ফুল নিয়ে জোড়হাত করে বলবেন)

— "হে বুড়াবাবা বড়পাহাড় — তুমিই মানব সভ্যতার শ্রষ্ঠা। তুমি আমাদের আদি গুরু — ধরম গুরু। সকলের সুখ শান্তি উন্নতির জন্য তুমিই সারি ধরম, সমাজ ব্যবস্থা সমাজের নেগ-নীতি-নেগাচার প্রচলন করেছ। তুমিই সমাজের কৃষি পদ্ধতি, শিল্প-বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, যোগ-সাধনা, নাচ-গীত, চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবক্তা। তুমি সমস্ত গুণের অধিকারী। সমাজ জীবনের যাহা কিছু পেয়েছি তা সবই তোমার দানে ও গুণে লাভ করেছি। তোমার ধর্ম্মমত ও সমাজ ব্যবস্থার গুণে আমি মা হতে পেরে আমার নারী জনম সার্থক হয়েছে। কিন্তু তোমার বাণী থেকেই জানতে পেরেছি কেবলমাত্র সন্তানের জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না। সামাজিক বিধি-বিধান, শ্বশুর কুলের স্বামীর সাংসারিক কর্তব্য পালনের মাধ্যমে এবং মাতৃসুলভ স্বভাব ও কর্তব্যের মধ্যে সংযত আচরণের মাধ্যমে সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও সুশিক্ষার দ্বারা সমাজের যোগ্য সন্তান গড়ার উদ্দেশ্যে নিজেরা প্রকৃত মা হওয়ার বাসনায় আজ আমরা — আদি মাতা জিতিয়া মা ষষ্ঠীর পূজা করতে চলেছি। এই জিতিয়া পূজা যাতে আমরা সার্থক ভাবে করতে পারিএবং আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে তোমার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। হে বুড়াবাবা তোমায় প্রণাম করি।" (ফুলদান ও প্রণাম)

ধরম ঠাকুরকে স্মরণ

(ফুল হাতে নিয়ে)

— "হে সুরজ-মহারাই-ধরমঠাকুর-করম রাজা তুমিই জগতের সমস্ত শক্তির মূল উৎস। তোমার শক্তির লীলা-খেলায় পঞ্চভূতের সৃষ্টি। সেই পঞ্চভূতের বিভিন্ন অনুপাতে মিলনের ফলে ও গুণে জীব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে চলেছে। তুমিই আমাদের জীবনী শক্তির মূল উৎস। আমি/আমরা আদিমাতা মা জিতিয়া/জিতা পূজা করতে চলেছি। এই পূজা যাতে করে সার্থকভাবে করতে পারি তার জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।" (ফুলদান ও প্রণাম)

বসমতা মাঞয়ের স্মরণ

(সমবেত ভাবে হাতে হাতে ফুল নিয়ে)

— "হে ধরতি মাঞ, — তুমি জগৎ মাতা। এই জগতে তুমিই মাতৃস্বরূপা। তোমার গুণেই আজ আমি/আমরা মা হতে পেরেছি। হে জগৎমাতা তোমার আশীর্ব্বাদ প্রর্থনা করি। তোমাকে প্রণাম করি।" (ফুলদান ও প্রণাম)

চাঁদকে স্মরণ

(সকলে হাতে ফুল নিয়ে)

— "হে চাঁদঅ-রাই, তোমার আবর্তনের গুণেই যেমন ধরতি মাঞ মাতৃত্ব লাভ করেছে তেমনি ধরতি মাঞয়ের কোলে সমস্ত নারীগণ তোমার গুণেই ঋতুচক্রের মাধ্যমে মাতৃত্ব শক্তি লাভ করে। আমাদের জীবনে তোমার দান ও করুণা অপরিসীম। আমি মাতা জিতিয়ার পূজা যাতে ভালভাবে করতে পারি তার জন্য তোমার আশীর্ব্বাদ কামনা করি। তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

(ফুলদান ও প্রণাম)

গ্রহ মণ্ডলীর স্মরণ

(এক সঙ্গে হাতে ফুল নিয়ে)

— "হে গ্রহ মন্ডলী, তোমাদের শক্তিদানে ও আবর্তনের কারণে আমাদের ও আমাদের সন্তানদের দেহ-মন পুষ্ট হয়। তোমাদের এইরূপ অকৃপণ দান ও করুণা পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ। তোমাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। তোমাদের সকলের প্রতি প্রণাম জানাই।" (একসঙ্গে ফুলদান ও প্রণাম)

অপরাপর গ্রামের দেব/দেবীদের স্মরণ

(সমবেত ভাবে হাতে ফুল নিয়ে)

— "হে টাড়াসিনি, গরইয়া, হাঁসাবেড়া, মা মনসা, হুঁটু পাথর, চেংড়া পাথর গ্রামের দেব/দেবীগণ তোমরাই গ্রামের সব কিছুর রক্ষক। জিতিয়া মাঞয়ের পূজায় তোমাদের সকলের সহায়তা প্রার্থনা করি। সবাইকে প্রণাম জানাই।

(একসঙ্গে ফুলদান ও প্রণাম)

জিতিয়া মাঞয়ের স্মরণে

(একক ভাবে, হাতে ফুল নিয়ে, জোড়হাতে)

— "অগো জিতিয়া মাঞ- মা ষষ্ঠী! তুমিই আমাদের আদি মাতা। গুরুমাতা। তুমি মাতৃত্বের পূর্ণ আধার। তুমিই সমাজ স্বরূপা। বুঢ়াবাবার ধরম করমে

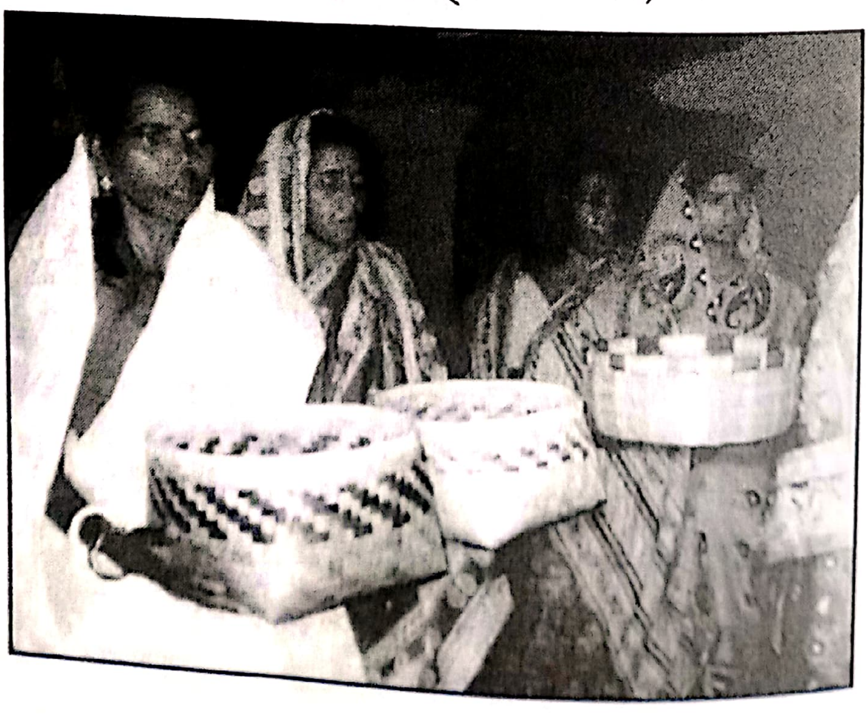
তোমার ধারণে আমাদের সৃষ্টি। তোমার গুণেই আমি মা হতে পেরেছি। তোমাকে প্রণাম করি। (ফুল দান ও প্রণাম)

কাঁকুড় হাতে নিয়ে ঃ আমি শ্রীমতী .... গ্রামের .... গোষ্ঠীর কন্যা হিসাবে জন্ম নিয়ে এখন আমি এই ....গ্রামের .... গোষ্ঠীর আমার শ্বশুর কুলের কুলবধু। শ্বশুরের কৃপায় আমি পেয়েছি সামাজিক ও কুলবধুর মর্যাদা। তিনি তাঁর বংশের ধারা বহন করার গুরু দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন মা হওয়ার অধিকার। নারী জীবনে স্বামীই পরমগুরু। একমাত্র শক্তি, একমাত্র অধিকার। সেই পবিত্র জ্ঞানে স্বামী সেবার মাধ্যমে এবং তোমার গুণে আমি সন্তানের মা হতে পেরে আমার নারী জনম সার্থক হয়েছে। আমার প্রতীকি সন্তান কাঁকে'ড় ফলকে তোমার চরণে নিবেদন করছি। সেই সন্তানকে যাতে সমাজের যোগ্য সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে পারি এবং তোমার কোলে তুলে দিতে পারি তার জন্য আমাকে পূর্ণ মাতৃত্বের গুণাবলী দান কর। আমার সন্তানদের তুমি মঙ্গল কর। এই মনস্কামনা নিয়ে তোমার পূজা আরাধনা করছি। তোমাকে প্রণাম করি।" (কাঁকে'ড় ফলকে ডাল তলে রেখে দিয়ে প্রণাম)।

জাগর হাতে নিয়ে

(দুই হাত জোড় করে)

— "অগো জিতিয়া মাঞ — মা ষষ্টি। নারীত্ব, স্নেহ-মমতা, অহংকারহীন, বিনয়তা, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা, সুভাষিণীতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, সংযম, সৎজ্ঞান, সৎকর্ম, সৎচিন্তা, স্বাস্থ্যজ্ঞান, কৃতজ্ঞতাবোধ, লালন ক্ষমতা, তোমার



এই ষোড়শবিধ গুণাবলীর যাতে আমার মধ্যেও — জাগরীত হয় তার জন্য তার জন্য তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, তুমি আমার শ্বশুরকুল, স্বামী-সংসার ও সন্তান সন্ততিদের মঙ্গল কর। সবরকম সমাজ-সামাজিকতা বজায় রাখতে পারি। হৃদয়ের অন্তর থেকে তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই।

(জাগর রেখে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম)

সমবেত ভাবে

(সমস্ত পরবতি হাতে ফুল নিয়ে)

— "হে জিতিয়া মাঞ — মা ষষ্ঠি । তুমি মাতৃত্বের পূর্ণ আধার। তোমার গুণেই, তোমার কৃপাতেই আজ আমরা মা হতে পেরেছি। তোমার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা জানাই তুমি আমাদের দেহ-মনে — মাতৃত্বের সমস্ত গুণাবলী সঞ্চার কর, — যাতে আমরা আমাদের সন্তান সন্ততিদের সঠিক ভাবে লালন -পালন করে সমাজের যোগ্য সন্তানরূপে গড়ে তুলতে পারি। তুমি আমাদের শ্বশুর কুল, স্বামী সংসার ও সন্তান-সন্ততিদের মঙ্গল কর। আমাদের যদি কোনরূপ দোষ হয়ে থাকে নিজ সন্তান ভেবে আমাদের তুমি ক্ষমা করে দাও গো মা। তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম করি।

(ফুলদান করে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম)

(লায়া পূজা স্থলে দুধ ঢাল, জল ঢাল দিয়ে হাঁটুগেড়ে প্রণাম করবেন)

দাঁড় ধারা

(সমস্ত পরবতিরা হাত ধরা-ধরি করে)

আঁখডালাটিকে মাঝে রেখে বাম দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে ঘুরে দাঁড় গীত ধরে নাচ করে আড়াই পাক ঘুরবেন। গীতি নিম্নরূপের। যেমন —

"তেলি ঘরের তেল, ধবা ঘরের বাতি;
না জ্বলে জিয়ার, জ্বলে সারা রাতি।"

- দাঁড় শেষ হওয়ার বাদে আখড়ায় উপস্থিত গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ নিবেন। নিজেদের মধ্যে কোলাকুলি করবেন। তারপর আঁখডালকে কোল আঁকাড় করে, প্রণাম করবেন।
- অন্যান্য মা-বোনেরা নাচ-গীত করবেন।
- পুরুষ মানুষের দলও বাজ-বাজনা-ঢোল-মাদল-নাগড়া সহযোগে নাচগীত করবেন।

- জাগরণ শেষে ভোর রাতে জিতিয়া আখড়ায় বাঁদনা গীত অহিরা গাওয়ার সূচনা করবেন।

(৯) জিতিআ ডাল ভাসান

(দুধ ঢাল জল দিয়ার বাদে প্রণাম করে)

নবমী তিথিতে লায়া ডাল উপড়াঞ মাথায় তুলে পুকুরে কিম্বা নদীতে ভাসিয়ে দিবেন। লায়ার সঙ্গে অন্যান্যরা ফুল-পাতা-ফল একটি ঝুড়িতে নিয়ে ভাসিয়ে দিবেন। ভাসান করতে যাওয়ার সময় গীত বলে যাওয়া।

(১০) "জিতিয়ার পারণার দিন ঃ

(ক) নবমী তিথিতে পরবতিরা হাতে একটি ঘটি, ঝিঙা পাতা, দাঁতুন, হলুদ বাঁটা, তেল নিয়ে বাঁধ-পুকুর- নদীতে স্নান করতে যাবেন।
পরবতি বাঁধঘাটে এক সারিতে তিনটি ঝিঙে পাতা বিছিয়ে নিবেন। ঝিঙাপাতার উপরে একটি করে দাঁতুন, হলুদ বাঁটা ও তেল দিয়ে তিন আঁজলা জল দিয়ে প্রণাম করবেন। প্রণাম করার সময় তিন কুলের পিড়হি জননীদের স্মরণ করে মনে মনে বলবেন — "আগো আমার তিন কুলের পিড়হি জননীগণ তোমাদের মুখ ধোয়ার জন্য জল-দাঁতুন এবং স্নান করার জন্য হলদ্ -তেল-জল দিলাম। তোমরা মুখ ধোও, সিনান করঅ। সিনানের বাদে তোমরা পারনা করবে। আমাকে পারনা করার জন্য সহাযতা করবে। তোমরা আশীর্ব্বাদ দাও আমার পারনা করায় যেন কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে।" তারপর স্নান করে ভিজে কাপড়ে এক ঘটি জল নিয়ে ঘরে ফিরে আসবেন।

(খ) পারনা ঃ ঘরে এসে পরবতি ভিজে কাপড়ে তূলসী থানের সামনে ধূপ-দীপ জ্বেলে পারনা করতে বসবেন। বাম হাতে তুলে একটি করে আঁকুরদানা যেমন — ছোলা, বাটলা, কুত্থি, মুগ, আতব চাল ডান হাতের চেটোয় নিয়ে তার সঙ্গে দুধ, দহি, ঘি, গুড়, মধু ঢেলে কপালে ঠেকিয়ে জিতিয়া মাঞকে স্মরণ করে খেয়ে নেবেন। তারপর একটা কাঁকৈড় ফলকে তিনবার আড়াই কামড় খেয়ে নেবেন।

(গ) পিড়হি জননীদের ভাত খাওয়া ঃ পরবতি নূতন হাঁড়ি, নূতন খোলায় কুমড়া, পুঁইশাক, আঁকুরি এক সঙ্গে মিশিয়ে তরকারী ও ভাত রান্না করবেন। তারপর রান্না হয়ে যাওয়ার পর তিনটি আলতি পাতায় ভাত-তরকারী এবং তিনটি বঁহায় জল ভর্ত্তি করে তূলসী থানের

পাশে ছাঁছাঁকলে ভাত তরকারী ও জল দিয়ে তিন কুলের পিড়ুহি জননীদের স্মরণ করে বলবেন — "হে আমার তিন কুলের পিড়ুহি জননীগণ! আমি তোমাদের খাবার জন্য ভাত-তরকারী ও মুখ ধোয়ার জন্য জল দান করলাম। তোমরা পারন কর। হাত-মুখ ধোও। আমাকে পারন করতে সহায়তা দান কর। হে আমার পিড়ুহি জননীগণ, জিতিয়া মাঞ তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আলতি পাতায় যেমন জল ধরে না, তেমনি আমার শ্বশুর কুলে কোন দোষের দাগ যেন না লাগে"।

(১১) আঁকুর বিলা ঃ

গাঁয়ের যে পরিবারের ডাল পূজা হয় না তাদের বাড়ীতে আঁকুর পৌঁছে দেওয়া হয়। পরববাসি গুড় পিঠা তৈরী করে পিঠার সঙ্গে আঁকুর আত্মীয় -স্বজন, ফুল-পরান, পড়শি বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বিঃ দ্রঃ ● বাড়ীতে ডাল পরবের সময় যদি গাইয়ে বাচ্চা দেয় সেই পরিবারে পরব না থাকলে নূতন করে করার সূচনা হয়।

● ডাল পরবের সময় যদি কোন মহিলা মা হন তাহলে সেই গোষ্ঠীর পরব আসে বলে ধরে নেওয়া হয়।

● যদি ঐ সময় কোন মানুষ মারা যায় তা হলে পরব নষ্ট হয়ে যায়।

● কোন পরিবারের পুত্রবধূ যদি নূতন করে জিতিয়া পরব করতে চান তাহলে তাঁকে তাঁর শ্বাশুড়ির কাছ থেকে নিতে হয়। শ্বাশুড়ি পুত্রবধূকে জিতিয়া ব্রত সমর্পণ করে দেন। শ্বাশুড়ি না দিলে পুত্রবধূ এই ব্রত পালনের অধিকার অর্জন করতে পারে না।

যে বৎসর ভাদর মাসের চাঁদে ভাদর মাসে কৃষ্ণা অষ্টমী হয় সেই বৎসর শ্বশুড়ি পুত্রবধূকে ব্রত করার অধিকার দিতে পারেন। এমনি এমনি দেওয়া যায় না। জিতিয়া উৎসবের সময় কৃষ্ণা সপ্তমী অর্থাৎ সঁজত বারের আগের দিন সন্ধ্যার পর বিশেষ অনুষ্ঠান করে শ্বাশুড়ি পুত্রবধূকে ব্রতকরা সমর্পণ বা জিতিয়া ডালা হাতে দিয়ে অনুমতি প্রদান করেন।

ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য পুত্রবধূ ও শ্বাশুড়িরা পরামর্শ করে একদিনে এক সঙ্গে অনুষ্ঠান কারো আঙিনায় করে থাকেন।

একটি ঝাড়া ধান (উড়কি) দিয়ে ছোট আকারের বিটলা (ধানের পুড়া) বেঁধে তার উপর পা রেখে একটি উখলে পুত্রবধূকে বসিয়ে চোখ বন্ধ করে সামনে পিছনে কাঁড়বাঁশ দিয়ে কাঁড় চালাতে বলা হয়। পুত্রবধূকে দু-হাতে তাঁর চোখ ঢেকে জিজ্ঞাসা করা হয়, — সে শ্বশুর মানে কিনা? ভাসুর মানে কিনা?

জিতিয়া ব্রত শ্রদ্ধাভরে পালন করবে কিনা? আগু-পিছু ভাবনা চিন্তা করে কাজ করবে কিনা? পুত্রবধূ শ্বাশুড়ির মনের মত প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলে পর নূতন ডালায় জিতিয়া পূজার সারভার ও প্রদীপ জ্বেলে দুই হাতে তুলে পুত্রবধূকে দিবেন। পুত্রবধূ হাসি মুখে শ্বাশুড়ির কাছ থেকে দুই হাতে জিতিয়া ডালা নিবেন। (শ্বাশুড়িকে ও অন্যান্য উপস্থিত গুরুজনদের প্রণাম করবেন) হাতে ডালাধরার সময় থেকেই পুত্রবধূ জিতিআ ব্রত পালন করার অধিকারী হয়ে যেতে পারেন।

● শ্বাশুড়ির কাছ থেকে পুত্রবধূ জিতিয়া ব্রত গ্রহণ করার থেকেই তাঁর বাপের বাড়ী থেকে মাজননী ব্রত করার সমুহ জিনিস পত্র নূতন ডালা, শাড়ী কাপড়, কাঁকুড়, ঘি-গুড়-দই কন্যার শ্বশুর বাড়ীতে ব্রতের আগের দিন নাগাদ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন। দাদা কিম্বা ভাই এসে সারভারের জিনিস পৌঁছে দিয়ে যান।

জিতিয়া পরবের উদ্দেশ্য ঃ

- সমাজ-সামাজিকভাবে নিরহংকারী হয়ে মেনে চলার অঙ্গীকার করা ;
- ভালো মা হওয়ার শপথ গ্রহণ করা ;
- চরিত্রবান-গুণবান সন্তান সমাজের জন্য যোগ্য সন্তান গড়ে তোলার প্রার্থনা করা।



ছাতা পরব

প্রতি বৎসর ভাদর মাসের সাঁকরাত (সংক্রান্তির) দিনে ছাতা পরব। কুড়মালি নেগাচারে ঐ দিনটিতে অনেক রকম ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হয়। এই সময় আমন ধান রোপনের কাজ শেষ হয়ে যায়। বড় অভাব অনটনের সময়। অভাব কিন্তু গা সওয়া হয়ে যায়। সবাই জানে এই সময় রাজার ভান্ডার শূন্য। সাধারণ লোকের তো হতেই পারে। এই ছাতা বা সংক্রান্তির দিনটি মানুষ আনন্দ উচ্ছ্বাসে প্রতিপালন করেন।

ভিনসর (ভোর) হওয়ার পূর্বেই চাষী ঘুম থেকে উঠে, হাতে একটি টাঁগিলা (ছোট আকৃতির কুঠার) হাতে নিয়ে বন যেয়ে ছাতা ডালি কেটে ঘর ঘোরেন। ঘরের আঁক দুয়ারের পাশে দেওয়ার জন্যএকটি লম্বা শাল পঁগড়া, ক্ষেতে ও অন্যান্য স্থানে গাড়ার জন্য শিহড়ি ডাল, শিয়াল নেজুড় (শতমূলী) ডাল নিয়ে আসেন।

বাসি মুখেই ঘরের আঁকদুয়ারের পাশে প্রথম শাল ডালের ছাতা গাড়া হয়। ডালের মাথার কাছে শিয়াল নেজুড়ের ডাল বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর একে একে গোবরকুড়ে, প্রতিটি ধান ক্ষেতে, সব্জি বাড়ীতে এক একটি ডালি গেড়ে দেওয়া হয়।

ডালি গাড়লে ইঁদুর, উইপোকা বা অন্য কোন ক্ষতিকর পোকা ফসল কেটে নষ্ট করে দিতে পারে না। অনেক রোগ থেকে ফসল রক্ষা পায়।

কৃষক ডালি গাড়ার মাধ্যমে বছরে অন্ততঃ একবার প্রমাণ করেন এই ক্ষেত, বাড়ী আমার। অন্যের জমিতে কেউ কাউকে ডালি গাড়তে দিবে না।

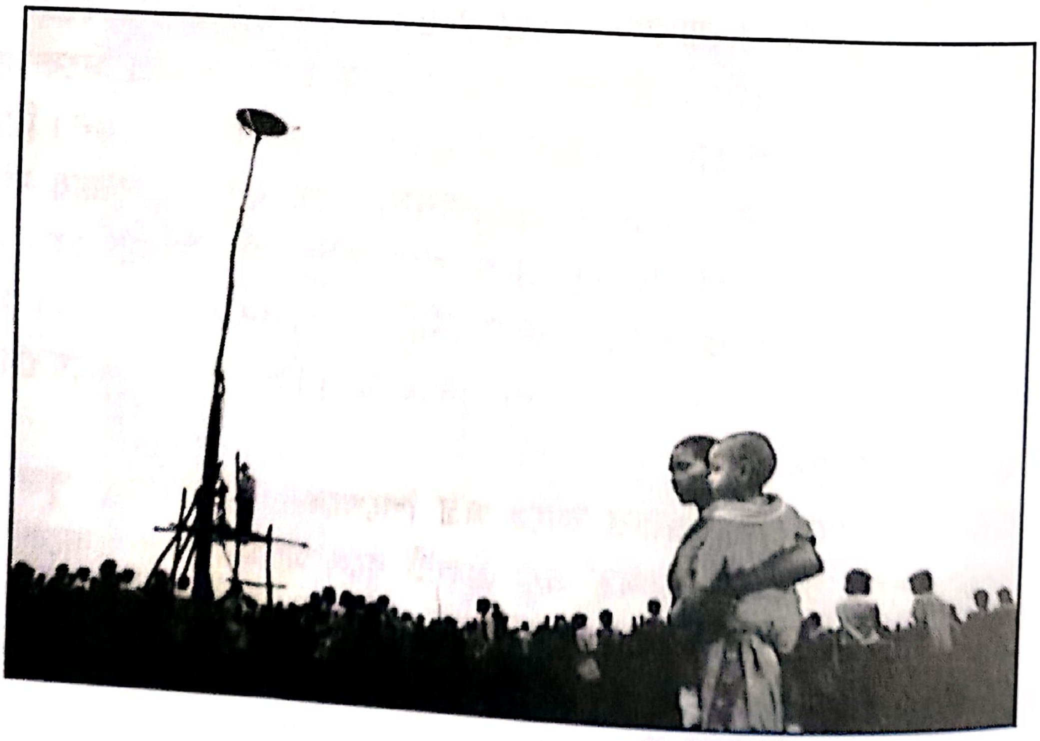
ছাতার দিন অনেক চাষি পরিবার মা মনসার পূজা করে থাকেন। নিজের বাড়ীতেই তূলসী থানের সামনে নিজেই মনসা পূজা করেন। পূজায় কুঁদরি, ঝিঙা, জুনহার (ভূট্টা) বলি দেওয়া হয়। শেষে হাঁস বলি দেওয়া হয়। ভোর থেকেই উঠান, আঙিনা গোবরজল দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করা হয়। মনসা পূজার জন্য শীতল (ধান খৈ) ও অন্যান্য পূজার জন্য জিনিস পত্র আগে থেকেই যোগাড় করে রাখতে হয়।

যাঁরা ঔঝা হয়েছেন, গুরুর কাছে মন্ত্র শিখেছেন তাঁরা মনসা পূজা শেষ করে পূজা শেষে তাঁর অধিত মন্ত্র এক একটি বলে মা মনসা ও গুরুকে স্মরণ করে প্রতিটি মন্ত্রের শেষে মা মনসাকে এক একটি করে ফুল দেন। তাতে তাঁর শেখা মন্ত্র জীবন্ত থাকে। বছর ভর মন্ত্রের ফল যোল আনায় পাওয়া যায়।

মন্ত্রের কাজ ভাল হয়। ফুল দেওয়া শেষ করে দুধ ঢাল জল ঢাল দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করেন।

গাঁয়ের আখড়ায় আখড়ায় দাঁড়শালিয়া নাচ-গীত করা হয়। কোথাও আবার জাঁত, মনসা মঙ্গলের অনুষ্ঠান চলে।

কোন- কোন গ্রামে ছাতা উঠার জোর মেলা বসে। অনেকে ছাতা উঠার মেলা দেখতে যায়। কোন কোন গ্রামে আবার কাড়া লড়াই করার আসর বসে। সাধারণ কৃষক কাড়া লড়াইয়ে অংশ নিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন।



জিহুড়

(আশ্বিন) সংক্রান্তির দিন জিহুড়। কুড়মালি নেগাচারে এই দিনটিকে গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। এই দিনে যে সকল নেগাচার পালন করা হয় তার মধ্যে (১) আমন ধানের ক্ষেতে ধানকে "সাধঅন্ন" খাওয়ানো, (২) 'খামার বাঁধা' প্রধান।

(১) সাধঅন্ন খাওয়ানো ঃ

সকালেই ঘর, উঠান, আঙিনা গোবর দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। তারপর বাড়ীর গৃহিনী স্নান করে নয় রকমের উপকরণ যেমন — ঔল, আলতি(কচু), মান, আদা, গেঁটি আলু, কুমড়া, বরবটি, কলা, পুঁই শাক এক সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করেন।

জিহুড়ের সময় আমন ধানে শিশ্ ফুটবার অবস্থা হয়। এই সময় কালকে ধানের টেট্‌টিরক্ষল (গর্ভাবস্থা) অবস্থা বলা হয়। ধানগাছি আগে-পাতে হয়ে ফুটবার অপেক্ষায় থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে কোন বধূ মা হতে যাওয়ার আগে তাকে 'সাধ-ভাত' বা 'নমাসি' খাওয়ানো হয়। ধানের ক্ষেত্রেও তেমনি জিহুড় দিনে ধানকে কৃষক 'সাধ ভাত' খাওয়ান।

নয় রকমের উপকরণ মিলিয়ে গৃহিনী যে রান্না করেন কৃষক সেই রান্না করা খাবার কোন পাত্রে রেখে মাথায় তুলে আমন ধানের ক্ষেতে যান। সেখানে একটি মান পাতার উপরে রান্না করা ভোগ একটি মান কচুর পাতার উপরে রেখে ধান ক্ষেতে ধানগাছির গোড়ায় দিয়ে একটি বহঁতায় জল ভর্তি করে নিবেদন করে প্রণাম করেন।

প্রণাম করার সময় মনে মনে বলেন, — "মা লক্ষ্মী ধান। তোমার খাবার সাধঅন্ন দিলাম। হাত-মুখ ধোয়ার জল দিলাম। তুমি তা গ্রহণ কর।"

(২) জিহুড় ডাক/জিহুড় জাগা ঃ

(ক) জিহুড় ডাক ঃ কৃষক তাঁর ধান ক্ষেতে যেয়ে আলের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, —

"ইন্দুররে বিন্দুররে,
চোর চন্ডালের মুখ বাঁধিরে।"

আবার

"লোকের ক্ষেতে আল-মাল,
আমার ক্ষেতে শুধুই ধান।"

এরপর কৃষক জোরে হাঁক পারেন, — "জি-হু-ড় জাগো।" গাঁয়ের এবং পাশাপাশি গ্রামের কৃষকেরাও হাঁক পাড়েন; — "জি - হু - ড় জা - গো।"

(খ) জিহুড় জাগা ঃ কুড়মালি নেগাচারী মানুষ বিশ্বাস করেন। জিহুড় জল বড়ই গুণকারী। এই জিহুড়েররাতেই জল খেয়ে বিষধর সাপ গর্তে শীতঘুম দেওয়ার জন্য প্রবেশ করে। আবার ধরণ মাসের রহিনের দিন গর্ত থেকে সাপ বাইরে বেরিয়ে আসে। জুহুড় জল খাওয়ার ফলেই দীর্ঘ সাত/আট মাস কাল আর সাপকে খাবার ও জল খেতে হয় না। সেই কারণেই যাতে করে শরীরে জিহুড় জল গায়ে লাগে তার জন্য খোলা আকাশের নীচে রাত্রি জাগরণের অনেক রকম অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস, জিহুড় জল যদি সাপের মাথায় পড়ে তাহলে মানিক, ঝিনুকের গায়ে লাগলে মুক্তা, হাতির মাথায় পড়লে গজমুক্তা তৈরী হয়। স্বাতি নক্ষত্র এই সময় পৃথিবীর কাছা-কাছি অবস্থান করে। সেই স্বাতি নক্ষত্রের জল অনেক সময় পৃথিবীতে ঝরে পড়ে। এই স্বাতি নক্ষত্রের জল মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে মানুষ রোগমুক্ত ও সম্পদশালী হয়।

জাঁত মনসা মঙ্গল গাওয়ার জিহুরের দিন বৎসরের শেষ দিন। রহিনের আগে পর্য্যন্ত গাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সেই কারণে জাঁত-মনসা মঙ্গলের আসর বসানো হয়। কোথাও দাঁড়নাচ, কোথাও নাচনি নাচ আবার কোথাও বৈঠকি ঝুমুর গীতের আসর বসে। কোথাও সেরকম না হলে নিদেনপক্ষে লোক, রূপকথা, জান কহ্নি, ভাঙাল কহ্নির আসর বসে।

(গ) অন্যান্য আচার পালন ঃ জিহুরের দিন গাঁয়ের কিছু লোক মনসা পূজা করে থাকেন। হাঁস বলি দেন। ওঝারা তাঁদের মন্ত্র জীবন্ত করে নেন।

ঔল, মান, কচু, সিম, শুশনি, সালন্তি, কলমি, কানা, খাপরা, কুইল্যাখাড়া, হেলেঞ্চা, ভুরভুরি, নুন্যা, পুঁই, আপাৎ, থানকুনি, ধূরুপ, গুলঞ্চ, ব্রাহ্মী, গাঁদাল, পাট ইত্যাদি একুশ রকমের শাক পাতা এক সঙ্গে মিশিয়ে আলুন্যা সেদ্ধ করে সামান্য পরিমাণে সকল লোকজনকে পরিবারের গৃহিনী ভাগ করে খেতে দেন। বিশ্বাস, এই শাক-পাতা সেদ্ধ খাওয়া শরীরের খুবই উপকারে লাগে। কোন রোগ ব্যাধি তাকে আক্রমণ করতে পারে না। শরীরে কোন বিষাক্ত দ্রব্য যদি থেকে থাকে, তাহলে সেই বিষকে নাশ করে দেয়। শরীরকে সুস্থ সতেজ করে রাখে। রৌদ্র-শীত, কঠিন পরিশ্রম কখনো কাবু করতে পারে না।

খামৃহার বাঁধা ঃ খামার বাঁধা একটি গুরুত্বপূর্ণ নেগাচার। কেননা ঐ খামারেই গোটা বছরের শ্রেষ্ঠ ফসল আমন ধানকে ক্ষেত থেকে এনে সংগ্রহ

করে রাখা হয়। ধানের খড় খামারেই সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ফসলে যাতে করে বালি, পাথর, মাটি না মিশতে পারে সেইজন্য খামার পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে করে রাখতে হয়। অপর দিকে অপরিষ্কার থাকলে ইঁদুরের উপদ্রব বাড়ে। ফসল ও খড়ের ক্ষতি করে দেয়।

যে জায়গায় খামার করা হয়, সেই স্থানটিকে প্রথমে কোদাল দিয়ে ছেঁচে ঘাস-পাতা-আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হয়। কাদা মাটির উপরে মৈ চালিয়ে কাদা সমতল করে নিতে হয়। তারপর বাড়ীর মহিলারা হাত দিয়ে চিকন করে নেন। এই অনুষ্ঠানকে "খাম্‌হার পল্যা" বলা হয়ে থাকে।

খামার পল্যা হয়ে যাওয়ার পর গৃহিনী স্নান করে এসে মাঝখান বরাবর একটি মাটির ভাঁড় বসিয়ে দেন। ভাঁড়ের মুখে একটি পাতা সমেত ভেলাডাল, চিট্‌চিটি ডাল, একটি টুট্‌কু বাড়হ্যন্‌ (ক্ষয়ে যাওয়া ছোট আকারের ঝাঁটা) রেখে দেন। যাতে করে ভাঁড়ের মুখে বসানো ঝাঁটা ও ভেলাডাল সহজেই নজরে পড়ে যায়। বিশ্বাস, কোন কুনজর কোন অপদেবতা খামারের ভিতর প্রবেশ করতে পারবে না। ফসলে খামার ভরে যাবে। বেশী ফসল হলে পরিবারের সকলে সারা বছর নিশ্চিন্তে খেয়ে পরে দিব্যি আনন্দে থাকতে পারবে। সমূহ এই কাজকে খামার বাঁধা বলা হয়। খামার বাঁধা হয়ে গেলে গৃহিনী বলদের শিংয়ে সরিষার তেল মাখিয়ে দেন।



বাঁদনা/সহরাই পরব

সহরাই (কার্তিক) মাসের অমাবস্যা তিথিতে বাঁদনা/সহরাই পরব/উৎসব পালন করা হয়। কুড়মালি নেগাচারে এই পরব অত্যন্ত গুরুত্ব, নিষ্ঠা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে প্রতিপালিত হয়। পাঁচদিন ধরে এই পরব হয়ে থাকে। প্রস্তুতি চলে প্রায় একমাস কাল ধরে। কৃষক পরিবারের সকলকেই নানা রকম নেগ-নীতি-নেগাচার পালন করতে হয়। পাঁচদিন ব্যাপি বাঁদনা অনুষ্ঠানের প্রত্যেক দিনের নেগাচার পৃথক পৃথক। (ক) ঘাউয়া, (খ) আমাবস্যা, (গ) গরইয়া, (ঘ) বুড়িবাঁদনা ও (ঙ) কাঁটাকাড়ুহা প্রভৃতি এক এক দিনের অনুষ্ঠানের নাম।

বাঁদনা কথার অর্থ বন্দনা করা। বাঁদনা উৎসব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উৎসব। কৃষকদের কৃষিকর্মের সহযোগী বলদ/কাড়া (মহিষ) ও কৃষি যন্ত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। আদিবাসী মানুষের ধর্মই হল উপকারীর উপকার স্বীকার করা, তার সুখ্যাতি গুণগান করে কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা জানানো।

এই সময় ধানক্ষেত অত্যন্ত শোভাময় হয়ে ওঠে। ক্ষেতভর্তি ফসল ধান সোনার বরণ হতে থাকে। ক্ষেত ভর্তি সোনার ধান দেখে কৃষকের মন আনন্দে নেচে ওঠে। এ্ সোনার ফসলে তার ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিজন খেয়ে পরে আমোদে সারা বৎসর নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। কোনরূপ অসুবিধায় পড়তে হবে না। এই ফসল দেখে কৃষকের মনে পড়ে বলদের কথা। তার একার পরিশ্রমে এই ফসল ফলানো সম্ভব ছিল না। বলদের সহযোগীতা তাদের পরিশ্রম অধিক। ফসলের ভাগিদার সেও। তাদের কতটুকু অংশ আমরা দিয়ে থাকি? ফসলের অংশ দিতে না পারলেও তাদের ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অন্ততঃ আনন্দের ভাগীদার করা যায়। কৃষকের এই ভাবনায়বাঁদনা পরব সূচনার মূল কারণ।

(ক) **ঘাউয়া ঃ** ঘাউয়া বাঁদনা পরবের পূর্ণরূপে প্রস্তুতির দিন। আমাবস্যা/অমাবস্যার রাত্রি বাঁদনা জাগরণের রাত্রি। অমাবস্যার পূর্বদিনকে বলা হয়ে থাকে ঘাউয়া। বাঁদনা পরবের ঘাউয়ার পরবর্তী যে চারদিন অনুষ্ঠান হবে, সেই দিনগুলিতে কোন কোন জিনিসের বা দ্রব্যের প্রয়োজন পড়বে পারতপক্ষে সেই সকল দ্রব্য আগের থেকেই জোগাড় করে এই দিন শেষ করে নেওয়া হয়।

প্রায় একমাস ব্যাপী ঘরের মা-বোনেরা তাদের নাওয়া-খাওয়া ভুলে নানা রকমের মাটি সংগ্রহ করে ঘর-দুয়ার উঠান-আঙিনা বিশেষ করে বাড়ীর পাঁচিল নূতন করে মাটি দিয়ে নিকিয়ে ঝাক্-ঝকে তক্-তকে করে নেয়। গোয়াল ঘরে

ও অন্যান্য ঘরে কোন তফাৎ রেখে দেয় না। গোয়াল ঘরের মেঝে পর্যন্ত আয়না বরাবর করে তোলে। গেরুমাটি, খড়িমাটি, সিমপাতা ও অন্যান্য ফুল পাতার রং তৈরী করে ঘরের পাঁচিলে রঙ-বে-রঙের কত রকম লতা-পাতা, ফুল-ফল ইত্যাদি দেওয়াল চিত্র এঁকে দেওয়ালকে সুশোভিত করে তোলে। প্রস্তুতির শেষ দিনে নূতন সূপ/কুলা, নূতন মাটির খাপরি (কড়াই), জাগরের জন্য মাটির প্রদীপ, মাটির সরা, পানিয়া লতা, আতব চাল, নূতন কাপড়, সরিষার তেল, ঘি, গুড়, ধূপ-ধুনা, সিঁদুর, সরিষা, কাচাশন, শনকাপাটি, মুরগী ইত্যাদি ইত্যাদি আজকের দিনেই মজুত করে রেখে দেওয়া হয়। যদি কোন গরু অন্য কাউকে দেওয়া থাকে তাহলে ঐ দিনের আগেই ফেরৎ আনা হয়। অনেক পরিবার এই দিন থেকে গাই-গরুকে তেল দেওয়া শুরু করেন।

(খ) **আমাবস্যা ঃ** অমাবস্যা তিথিতে আমাবস্যা। ঐ দিন বাঁদনা পরবের জাগরণের দিন। সকাল থেকেই ব্যস্ততা। প্রথমেই ঘর-দুয়ার, আঙিনা-উঠোন গোবর দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিকানো হয়। পিঠে তৈরী করার জন্য আতব চাল ভিজিয়ে ঢেঁকিতে কুটে চালগুঁড়ি তৈরী করে নিতে হয়। গাই-গরু-বলদকে স্নান করানো হয়। গরুর খাবার জন্য ঘাস কেটে সংগ্রহ করতে হয়। কাঁচঅ দুয়ারী করার জন্য মড়রাঘাস ক্ষেত থেকে কেটে আনা হয়।

(১) **গট পূজা ঃ** গাঁয়ের লায়া গাঁয়ের প্রান্তে কুল্‌হিমুড়ায় বিকালবেলা চালগুঁড়ি দিয়ে খঁড় তৈরী করে নয়টি ঘর তৈরী করেন। প্রতি ঘরে সিঁদুরের দাগ কেটে তুলসীপাতা রেখে তার উপর দূর্বাঘাস দিয়ে আতব চালে ঘি, গুড়, দুধ, মধু, দই মিশিয়ে ভোগ তৈরী করে এক এক দেব/দেবীকে স্মরণ করে ভোগ দেন। খঁড়ের মাঝখানে একটি মুরগী ডিম বসিয়ে জল-ঢাল, দুধ-ঢাল দিয়ে প্রণাম করেন। প্রণাম করার সময় মনে মনে প্রার্থনা করেন বাঁদনা পরব যেন নির্বিঘ্নে পার হয়। গাঁ-ঘর যেন ভাল থাকে। কোন দুর্ঘটনা, গোলমাল যেন না হয়। দেব/দেবীগণ তা যেন মনযোগ সহকারে দেখেন।

ঠিক ঐ সময় ঐ পথ দিয়ে গাই-গরুর গট গাঁয়ে ফিরে আসতে থাকে। খঁড় ডিঙিয়ে গাই-গরু পার হওয়ার সময় গরুর পায়ে লেগে ডিম ভেঙে যায়। যে গরু ডিম ভাঙে তাকে চিহ্নিত করা হয়। যার গরু তাকে সেই বছরের গাঁয়ের ভাল মানুষ বলে মানা হয়। সেই গৃহকর্তা গরুবাগাল ও লায়ার পা ধুইয়ে দেয়। তারপর নূতন ধূতি/গামছা দিয়ে সম্মান জানায়। গট পূজার পর থেকে পুরোদমে বাঁদনা পরব সুরু হয়ে যায়। ঢোল-ধামসা-মাদাল

বাজনা আরম্ভ হয়ে যায়। ঘরে ঘরে গুড় পিঠা ছাঁকতে গৃহিনীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গুড় পিঠার সাথে সাথে পানআসিকা, মশলা পিঠা তৈরী করেন।

(৪) **গরুর সিং-এ তেল দেওয়া ঃ** গৃহকর্তা হাত-পা-মুখ ধুইয়ে পরণের কাপড় বদলে, সরিষা তেলের পাত্র নিয়ে গোয়ালে গিয়ে প্রত্যেকটি গাই-গরু- বাছুরের সিং-এ ও মাথায় তেল দিবেন। দেখে নিবেন কোন গরু বাদ পড়েছে কি না । তেল দেওয়ার পর প্রত্যেক গরুর জন্য ঘাস-খড় খাবার দিবেন। খাবার যেন ভরপেটা হয়, আন্দাজ করে সেই পরিমাণ কিম্বা কিছু বাড়তি খাবার দিয়ে দেওয়া হয়। গরুর বসার জন্য অনেক সময় অনেকে গোয়ালের মেঝেতে খড় বিছিয়ে রেখে দেন।

(৫) **জাগর জ্বালা ঃ** গরু/কাড়াকে তেল দেওয়া, খাবার দেওয়া হয়ে যাবার পর গৃহকর্তা প্রত্যেকটি গোয়ালের জন্য আলাদা আলাদা জাগর বাতি তৈরী করেন। নূতন মাটির প্রদীপে ঘি ভর্তি করে প্রদীপে সলিতা দিয়ে গোয়ালের কুলঙ্গিতে রেখে দেন। প্রদীপ রাখার সময় প্রদীপের তলায় গোবর ও কাচা শনের বেড়ির আসন বিছিয়ে জাগর তার উপরে বসিয়ে রেখে দেন। নীচে গোবর দেওয়া থাকলে সহজে প্রদীপ নড়ে না। রাতভর গোয়ালে ঘি-এর বাতি জ্বলতে থাকে। মোহময় মৃদু আলোয় গোয়াল ভরে থাকে। গৃহকর্তাকে সবসময় নজর রাখতে হয়, প্রদীপের ঘি যেন শেষ না হয়ে যায়। এই অনুষ্ঠানটিকে 'জাগর জ্বালা' অনুষ্ঠান বলা হয়। জাগর জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহকর্তা বাঁদনাগীতি- অহিরা গাইতে থাকেন।

"অহি রে, —
জাগহো লক্ষ্মী, জাগহো ভগবতী।
জাগে ও আমাবস্যার রাত।
জাগে কা প্রতিফল, —
দেবো গো মাঞই;
পাঁকঅ পুতায় দশঅ ধেনুগাইঅ রে।।"

(৬) **ঝাঁগড়/ধেগুঁয়ান দলের গাই জাগা ঃ** ঝাঁগড়দল তাদের বাজ-বাজনা, মাদ্যল, ঢোল, ধমসা, করতাল, বাঁশী, কারহা নিয়ে বাঁদনা গীত অহিরা গাইতে গাইতে গাঁয়ের প্রত্যেকটি পরিবারে যাবেন গাই-গরু জাগাতে। ঝাঁগড়/ধেগুঁয়ান দল বাড়ীতে এলেই গৃহকর্তা তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানান। তামাক, বসবার আসন দিয়ে আহ্বান করেন। গৃহকর্ত্রী থালা/ঝুড়ি ভর্তি পিঠে নিয়ে, খাবার জন্য দেন। তারপর খাবার ও হাত ধোয়ার

জন্য ঘটি ভর্তি জল এনে দেন। ঝাঁগড়দল গাই-গরু জাগার বাঁদনা গীত গেয়ে নাচ করার পর অপর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য রওনা দেওয়ার সময় গৃহকর্তা কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দলকে বিদায় জানান। পাশের বাড়ীতে যাওয়ার আগে গৃহকর্তার পরিবারের মঙ্গলের জন্য আশীর্বাদি গীত গেয়ে বিদায় নিয়ে চলে যান। কর্তা ঘরের আঁকদূয়ারের বাহির পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যান।

পরিবারের সকলে যার যেমন ইচ্ছা মতন পিঠা খায়। অন্যদের বাড়ীতে এনে পিঠে খাওয়ায়। এই সকল করতে করতে কখন বিহান এসে যায়।

(গ) **গরৈআ ঃ** আমাবস্যার পরের দিনকে বাঁদনা পরবের গরৈআর দিন বলা হয়। এই দিনেও অনেক রকম নেগ নেগাচারের নীতি নিয়ম অত্যাধিক নিষ্ঠা ও গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালন করতে হয়। নীতি-নিয়মের এতটুকু অবহেলা করা চলবে না। আমাবস্যার ভিনসরেই গৃহকর্তাকে গরৈআ ফুল জোগাড় করতে যে পুকুরে ঐ ফুল পাওয়া যাবে সেখানে যেতে হয়। তা নাহলে ফুল পাওয়া যাবে না। গরৈআ পূজার জন্য চাই সুঁধি শালুক ফুল। বাড়ীর অন্যান্য মেয়ে বউরা বিহানেই ঘরের আঙিনা উঠান গোবর জল দিয়ে লরা-লাপ্‌টা করে নেয়। চোখপুরা/আলপনা দেওয়ার জন্য পানিয়ালতা ছেঁচে জলের পাত্রে ভিজতে দেয়। ঐ পানিয়ালতের ভেজানো জল থেকে চালগুঁড়ি গোলার লার/ আটা তৈরী করে নেয়। আতব চাল ভিজিয়ে গুঁড়ি তৈরী করে নেয়।

(১) **দাদুড় খেলা/আতড়া ফেলা ঃ** অমাবস্যা তিথি পার হলে পর প্রতিপদ তিথিতে গরৈআ পূজা হয়। যে বছর দিনভর অমাবস্যা থেকে যায় সেই বছর আমাবস্যার গাই জাগানোর পর গরৈআপূজা হয় না। সেই দিনকে বলে বিশ্রামের দিন।

যাই হোক, প্রতিপদ লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁগড়/ধেঙ্গুয়ানের দল বাজ-বাজনা সহযোগে দল-বল নিয়ে দাদুড় খেলা/আতড়া ফেলার কাজে বেরিয়ে পড়েন।

গাঁয়ের লায়া মাথায় একটা বড় আকারের বাঁশের পুরাতন ঝুড়ি চাপিয়ে দলের আগে আগে চলতে থাকেন। তার পিছনে বাদ্যকারীগণের সঙ্গে গাঁয়ের ছেলেরা নাচ করে জোর চিৎকার করে বলতে থাকে –

"লে হাগি লে খা;
খাপরা পিঠা মাগেই খা ।"

যে পরিবারের দূয়ার দিয়ে দাদুড় খেলার দল চলতে থাকে ঘর থেকে বাড়ীর বউ ভাঙা কূলা, ঠুট্‌কু বাড়ুহন, পুঁইশাক, আলতি ঝাড় লায়ার ঝুড়িতে

দিয়ে দেয়। ঘরে যদি বাচ্চা ছেলে-মেয়ে থাকে তাকে কু'ল্হির দূয়ারে বালি/ মাটির উপর শুইয়ে দেয়। লায়া ও তার সঙ্গি-সাথীরা বাচ্চাকে ডিঙিয়ে চলে যায়। বাড়ীর মেয়ে বউরা জামবাটিতে গুঁড়ি নিয়ে লায়া ও অন্যাদের (গুঁড়িগুলা জলে হাত ডুবিয়ে) পিঠে পেটে হাতের চেটোর দাগ দিয়ে দেয়। কপালে গালে গৃহকর্তা সিঁদুরের দাগ এঁকে দেয়। অনেকে লায়ার মাথায় গুঁড়িগুলা জল মাথায় ঢেলে দেয়। এমনি করে চলতে চলতে লায়ার মাথার ঝুড়ি ভরে যায়। সকলেরই একটা কিম্ভূত-কিমাকার রূপ হয়ে যায়। গাঁয়ের সীমানার বাইরে যেয়ে ঝুড়ি, কুলা, সবজি সকল ফেলে দিয়ে গাঁয়ে ফিরে আসে। মনে করা হয় এই দাদুড় খেলা বা আতড়া ফেলার অনুষ্ঠান করে গাঁয়ের যত অশুভ শক্তি ও রোগ-ব্যধিকে গাঁয়ের বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে। ফেলে দেওয়া হয়েছে।

(২) **হাল-জোঁয়াল-মই ধূয়া ঃ** গাঁয়ের পরিবারের লোকজন যখন বুঝতে পারে গাঁয়ের আতড়া ফেলা হয়ে গেছে, তখন বাড়ীর যত হাল, জোঁয়াল, মইকে বাঁধ-পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয় স্নান করানোর জন্য। পুকুরের জলে ডুবিয়ে ভালভাবে হাল-জোঁয়ালকে ধুইয়ে পরিষ্কার করা হয়। যেন কাদা-মাটি গায়ে না লেগে থাকে। পরিষ্কার ভাবে ধোওয়া হয়ে গেলে পর ঘরে এনে তুলসীতলায় সাজিয়ে রেখে দেওয়া হয়। বাড়ীতে দেখে নেওয়া হয় কোথাও কোন হাল-জোঁয়াল পড়ে আছে কিনা? ঘরের গাঁট-কোদালকেও ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। গোয়াল ঝাঁট দেওয়ার ঝাঁটা, গোবর ফেলা ঝুড়ি গোয়ালে রেখে দেওয়া হয়। পূজার সময় যেমন ঐ গুলি হাতের কাছে থাকে।

(৩) **গরৈআর পিঠা তৈরী ঃ** পরিবারের গৃহিনী নূতন কুলায় আতব চাল নিয়ে স্নান করতে যাবেন। সেখানে পুকুর ঘাটে স্নান করার সময় ঐ চাল ধুয়ে স্নান করবেন। ভিজে কাপড়ে বাড়ীতে এসে ভিজে চালের গুঁড়ি ঢেঁকিতে কুটে নিবেন। বাড়ীতে নূতন উনান তৈরী করে, নূতন খাপরিতে (কড়াই) দুধ, গুড়, গুঁড়ির সঙ্গে মিশিয়ে নূতন খাপরিতে ঘি ঢেলে পিটা ছাঁকবেন। আগুন সাধারণতঃ শাল কাঠের হবে। বাড়ীর অন্য কেহ ঐ সময় স্পর্শ করবে না। সমূহ কাজটি হবে স্নান করে আসা ভিজে কাপড় পরে। পিঠা তৈরী হয়ে গেলে কাঁসার থালায় সাজিয়ে গোয়াল ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে গৃহকর্তা গরৈআ পূজা করবেন।

(৪) **গরৈআ পূজা ঃ** গৃহকর্ত্তা একটি ঘটি নিয়ে পুকুরে স্নান করতে যাবেন। একটি বর্গাকার কাদামাটির ছোট পিঁড়ির আকৃতির পিঁড়ি তৈরী করবেন।

তারপর স্নান করে ঘটিতে জল ভর্ত্তি করে পিঁড়ি নিয়ে ঘরে আসবেন। ভিজে কাপড়ে গোয়ালে গরৈআ পূজা করতে বসবেন। পিঁড়িটি পেড়ে পাশা-পাশি দুইটি গরৈয়া ফুল/সুঁধি শালুকের ফুলের কুঁড়ি পিঁড়ির উপরে বসিয়ে দিবেন। পিঁড়ির সামনে একটি চালগুঁড়ি দিয়ে নয়টি ঘর কেটে খঁড় তৈরী করবেন। খঁড়ের এক একটি ঘর আলাদা আলাদা দেব/দেবীর থান। প্রথমে ফুলের কুঁড়িতে, পিঁড়ির উপরে তিনটি সিঁদুরের দাগ দিবেন। তারপর খঁড়ের প্রত্যেকটি ঘরে, পূজার স্থলের পাশের রাখা গাঁট, কোদাল, ঝাঁটা গোবরঝুড়ি, গরুর খুঁটা, পাঘা ইত্যাদিতে সিঁদুরের দাগ দিবেন। সিঁদুরের দাগ দেওয়া জায়গায় একটি করে তুলসী পাতা, একটি দূর্বাঘাস দিবেন। তারপর তার উপরে এক একটি ঘিয়ের পিঠা নিয়ে কিছুটা ভেঙে প্রত্যেক দেব/দেবীদের স্মরণ করে দিবেন। বাড়ীর গৃহিনী কর্তাকে হাতের কাছে সব দরকারী জিনিস এগিয়ে দিবেন। পূজার সময় অতি অবশ্যই ধূপ দীপ জ্বালানো হবে এবং যাবতীয় কাজ করতে হবে স্নানের কাপড় পরে অর্থাৎ ভিজে কাপড়ে। গাঁইট, কোদাল, ঝাঁটার অর্থাৎ যেখানে যেখানে সিঁদুর দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক জায়গায় ভোগ দিতে হবে। কেউ কেউ গরৈয়া পূজায় মুরগী অথবা পাঁঠি ছাগল বলি হিসাবে বলি দেন। বলি শেষে দুধ ঢাল দিয়ে প্রণাম করে পূজা শেষ করেন। বাড়ীর অন্যান্য সদস্যরাও প্রণাম করে। গৃহিনী প্রত্যেককে ভোগ হিসাবে একটি করে ঘিয়ের পিঠা দেন।

গরৈইআ

জাহির মাঞ	করম গুঁসাঞ	বুঢ়াবাবা
মহামাঞ	বসমতা মাঞ	গুঁসাঞরাই
গাঁগেরাম	বড় পাহাড়	বাঘুৎ ও অন্যান্য

(৫) **গরৈআর চোক পুরা ঃ** বাড়ীর মেয়ে-বউরা পানিয়ালতার লার (আঠা) তৈরী করে জল, চালগুঁড়ি ও পানিয়ালতার লার মিশিয়ে চোকপুরার (আলপনা) দেওয়ার রঙ তৈরী করে কুলহীর দুয়ার থেকে আরম্ভ করে তূলসীথান, তূলসীথান থেকে গোয়াল দুয়ার পর্যন্ত চোক পুরেন। যেখান

থেকে চোকপুরা সুরু করেন সেইখানে একটা গোবরের নাড়ু করে বসিয়ে দেন। নাড়ুর মাথায় পাশা-পাশি দুই গুচ্ছ দূর্বাঘাস গুঁজে দেন। সঙ্গে একটি চিড়ুচিড়ি ডালও গুঁজে দেন। তারপর দূর্বাঘাসের গোড়ায় সিঁদুর ফোঁটা দেন। দূর্বাঘাসের এক এক গুছিকে বুঢ়া-বুঢ়ি অর্থাৎ বুঢ়াবাবা ও মহামাঞ মনে করা হয়। চিড়চিড়ি ডালকে অশুভ নজর এড়ানোর প্রতীক মনে করা হয়। বুঢ়াবাবা, মহামাঞকে প্রণাম করে চোকের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে সিঁদুর ফোঁটা দেওয়া হয়। একটি আদাড় বাছুরকে দিয়ে গোবরের নাড়ুটিকে ডিঙানো হয়। কারণ যদি অন্য ছেলে-মেয়ে ভুল করে বুঢ়াবাবা মহামাঞের প্রতীককে ডিঙোয় তাহলেও তার কোন দোষ লাগে না বলে বিশ্বাস করা হয়।

(৬) **গরৈআর মোড় গাঁথা ঃ** গৃহকর্তা তাঁর ক্ষেতে বিকালবেলা যেয়ে পুরষ্ট দেখে দা দিয়ে বেছে কিছু ধান গাছি কেটে নেবেন। তারপর পাঁচটি মোড় গাঁথবেন এবং চুমানোর জন্য পাঁচ/সাতটি ধানের শিষ নিয়ে ঘরে ফিরবেন। ঘরে ফিরে ঐগুলি ঘরের চালার উপরে রেখে দেবেন। যাতে করে ঐ গুলি কোন ছেলে-মেয়ে নষ্ট করে না দিতে পারে। ছাগল-গরুই খেয়ে না দেয়।

(৭) **গরৈআ চুমান ঃ** সন্ধ্যার সময় হাত-পা-মুখ ধুইয়ে বাড়ীর গাই-গরু-বলদ-কাড়া-মহিষকে শিং- য়ে তেল মাখিয়ে দিবেন। তেল দেওয়া হয়ে গেলে গৃহকর্ত্রী নূতন কুলায় মোড় গুলি সাজিয়ে ধূপ-দীপ, সরিষা ও চুমান ধানের শিষের ধান ও দূর্বাঘাস দিয়ে তূলসী তলায় মোড়কে চুমিয়ে গোয়াল ঘরে যাবেন। ইতিপূর্বে কুলহির দুয়ারে গাই-গরুকে হলুদ-জলে পা ধূইয়ে প্রণাম করে ঘরে নিয়ে এসেছেন।

গৃহকর্ত্রী সিরি গাইয়ের শিং-য়ে ও কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিবেন। গৃহিনী সিরি গাইয়ের কপালে এবং গৃহস্বামী সিরি-বলদের কপালে ধানের মোড় পরিয়ে দিবেন। পাশা-পাশি সিরিগাইয়ের-সিরিবলদকে দাঁড় করিয়ে গৃহিনী তিনবার ধান-দূর্বা দিয়ে চুমাবেন। তারপর পা ধুইয়ে দিয়ে প্রণাম করবেন। একটি মোড় খাম খুটায়, একটি তূলসীথানের হাল-জঁয়ালে ও বাকী একটি মোড় ঘরের দুয়ারের চৌকাঠে বেঁধে দেন। চুমান শেষে নূতন মাটির সরায় ধূনা জ্বেলে সিরিগাই -সিরি-বলদের গায়ে বাম হাতে ঘুরিয়ে ডান হাত দিয়ে নিজের দুই পায়ের ফাঁকে গলিয়ে আবার গাই-গরুকে ঘোরাবেন। এইভাবে আড়াইবার (তিন) ঘুরিয়ে ধূপের সরা গৃহকর্তার হাতে তুলে দেবেন। কর্তা সেইটি নিয়ে গাঁয়ের তেমাথা, চৌমাথা রাস্তার মাঝে সরা

উবুড় করে দিয়ে বাম পায়ের এড়ি (গোড়ালি) দিয়ে ভেঙে বাড়ী ফিরবেন। কোন প্রকারেই পিছন ফিরে তাকাবেন না।

রাত্রিতে ফুল-পরাণ, প্রতিবেশীকে ঘরে গরৈআ পূজার বলির মাংস খাওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে আনবেন।

(ঘ) **বুঢ়ি বাঁদনা ঃ** আমাবস্যার দ্বিতীয় অর্থাৎ দ্বিতীয়া তিথিতে বুঢ়িবাঁদনা। ঐ দিনেও অনেক রকম নেগ-নেগাচারের মধ্য দিয়ে বুঢ়িবাঁদনা পালন করা হয়। চোকপুরা, গাইগরু চুমান, মোড় গাঁথা, জামাই বাঁদা, গরুখুঁটা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নেগাচার।

(১) **চোকপুরা ঃ** সকালে মা-বোনেরা গোবরের সঙ্গে ভূসিকালি মিশিয়ে জলে গুলে আঙ্গিনা ভালভাবে লরা লাপটা করে নেন। পানিয়ালতার লার তৈরী করে জলের সঙ্গে গুঁড়ি গুলে হাত ডুবিয়ে চোক পুরেন। গরৈয়ার দিন এক ডাঁড়্যা অর্থাৎ অল্প জায়গা জুড়ে চোক পুরেন। এই দিন পুরো আঙিনা ভর্ত্তি করে চোক দেন। ঘরের দেওয়ালে বিশেষ করে দুয়ারের দুইপাশে হাত ডুবিয়ে হাতের চেটো পাঁচিলে বসিয়ে দেন তাতে হাতের ছবি উঠে। গরৈয়ার দিন যেভাবে চোকের সুরুর উপরে বুঢ়াবুড়ির প্রতীক গোবরের নাড়ু বসান। আদাড় বাছুর এপার ওপার করান। চোকের ঘরে ঘরে সিঁদুরের টিপ দিয়ে দেন। বিশেষ করে আজকের চোককে বলা হয় ঝাবা চোক। সুন্দর করে ডাল-পালা খেলানো চোক। ঘর আঙ্গিনা উঠান অপরূপ শোভায় সেজে উঠে।

(২) **বুঢ়িবাঁদনার মোড় গাঁথা ঃ** পরিবারের গৃহকর্তা সকালবেলা কোন কিছু না খেয়ে দা নিয়ে কোন পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে ক্ষেতে যাবেন। সেখানে পুরুষ্ট ধানের শিষ দেখে বেছে বেছে কেটে নিয়ে মোড় তৈরী করবেন। বাড়ীতে যতগুলি গাই-গরু-মহিষ আছে গুণে গুণে ততগুলি, বাড়তি হিসাবে থামখুটায় দেওয়ার জন্য, হাল-জোয়ালে দেওয়ার জন্যে, ঘরের চৌকাটে এবং পরবর্তী মাঙ্গলীক কাজের প্রয়োজনে বেশী সংখ্যার মোড় তৈরী করে নেবেন। চুমানের জন্যে সাত/নয়টি ধানের শিষ নিয়ে ঘরে আসবেন। মোড়গুলি তুলসী থানের মাথায় কিম্বা ঘরের চালার উপরে রেখে দেবেন।

(৩) **জামাই বাঁদা ঃ** সেই বছরে যদি কোন মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বাঁদনা পরবে মেয়ে-জামাইকে বাড়ীতে আনা হয়। এই দিন কোঠাঘরের ভিতরে মেয়ে-জামাইকে পাশা-পাশি পিঁড়ির উপর বসিয়ে চুমানো হয়।

বাড়ীতে আজি (ঠাকুরমা) থাকেন তিনি আগে চুমাবেন। তারপর মা চুমাবেন। ঐ সময় মেয়ে-জামাইকে যার যেমন সামর্থ কিছু দিয়ে আশীর্বাদ করেন। মেয়ে-জামাই প্রণাম করে।

(৪) **বুঢ়হি বাঁদনার চুমান ঃ** গৃহকর্তা হাত-মুখ ধুইয়ে প্রত্যেকটি গাই-গরুকে এবং মহিষকে শিংয়ে ও কপালে সরিষার তেল মাখিয়ে দেবেন। গিন্নী নূতন শাড়ী, সায়া-সেমিজ পরে, আলতা পরে, সিঁদুর কাজল পরে উপবাসে থাকলেও মুখে পানখিলি গুঁজে নূতন কূলায় ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে ধান, দূর্বা, সরিষা, সিঁদুর সাজিয়ে এক হাতে ঘটি ভর্তি জল নিয়ে বুঢ়িবাঁদনাচুমানের জন্য তৈরী হন।

প্রথমে কূলা-জলঘটি নিয়ে তূলসী তলায় আসবেন। মোড় মোড়ের ধান তূলসী থানে রেখে মোড়কে চুমাবেন। হাল জেআঁয়ালে, মৈইয়ে তূলসী থানে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, হাল-জোঁয়ালে মোড় পরিয়ে চুমাবেন। প্রণাম করবেন তারপর গোয়ালঘরে যাবেন গাই-গরু চুমাতে। গিন্নী সিরিগাই ও অন্যান্য গাইয়ের সিং-এ কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিবেন। মাথায় ধানের মোড় পরিয়ে দিবেন। অনুরূপ ভাবে কর্ত্তা বলদ-গরুকে সিঁদুর ও মোড় দিবেন। গৃহকত্রী প্রতিটি গাই-গরু-বাছুর, মহিষকে চুমাবেন। ঘটির জলে পা ধূইয়ে দিবেন। তারপর প্রণাম করবেন। শেষে প্রত্যেকটি মাটির সরায় ধূপ জ্বলিয়ে বাম হাতে সরা নিয়ে গরুর শরীরের উপরে ঘোরাবেন।এইরূপ আড়াই (তিন) বার করার পর ধূপ সরা কর্ত্তার হাতে দিবেন। কর্ত্তা সোজা দপথের রাস্তায় ধূপসরা উপুড় করে ফেলে দিয়ে বাম পায়ের এড়ি (গোড়ালি) দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে বাড়ীতে ফিরবেন। কখনোই পেছনে ফিরে তাকাবেন না।

নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রত্যেক বাড়ীতে দল বেঁধে বউয়েরা বুঢ়িবাঁদনা চুমোতে যাবেন। চুমান শেষে বাড়ী বাড়ী দল বেঁধে খেতে যাবেন।

(৫) **গরু খুঁটা ঃ** গাঁয়ের কোন নির্বাচিত স্থানে, কিম্বা আখড়ায় আখড়ায় অথবা পাড়ায় পাড়ায় নিজ নিজ কু'ল্হির দূয়ারে বলদকে খুঁটানো হয়। ঘরের বউয়েরা যখন গাই-গরু চুমানোর কাজ করেন, পুরুষ মানুষেরা বলদ খুঁটানোর জন্য বড় আকারের শক্ত কাঠের খুঁটা গাড়েন। একে 'মালখুঁটা' বলা হয়। খুঁটার উপরিভাগে গুঁড়ি-সিঁদুর মাখানো হয়। ধানের মোড় বেঁধে দেওয়া হয়। ফুলের মালাজড়িয়ে দেওয়া হয়। বলদ বাঁধার জন্য বিশেষ কায়দায় মোটা শক্ত পরহি দড়ির পাঘা তৈরী করে খুঁটার মাপে বাঁধা হয়।

ইতিপূর্বে যে বলদকে খুটানো হবে তাকে গুঁড়ি, রঙ দিয়ে সাজিয়ে, মাথায় বিশেষ আকারের ধানের মোড় পরিয়ে, ফুলের মালা দিয়ে মালখুঁটায় বাঁধার জন্য নিয়ে আসা হয়। এই সময় বাঁদনা পরব চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে যায়।

বলদ খেলানোর দল ঢোল, ধামসা, মাদ্যল বাজাতে বাজাতে হাতে মহিষের চামড়া/বস্তা নিয়ে নাচতে নাচতে গীত গাইতে গাইতে জোর কুলকুলি দিতে দিতে বলদের দিকে এগিয়ে আসে। মহিষের চামড়া বলদের সামনে দিতেই বলদ রেগে গিয়ে ঐ চামড়াকে শিং দিয়ে আঘাত করে। খুঁটার চারদিক ঘুরে ঘুরে খেলোড়ি চামড়া পাতে। বলদও ঘুরে ঘুরে চামড়াকে গুঁতোতে থাকে। জনতা চারদিক থেকে হাততালি কুলকুলি দেয়। ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি গাঁয়ের সবাই সাজ গোজ করে গরুখুঁটা পরব দেখতে আসে।

যার বলদ ভাল মার/খেলা করে সেই বলদের মালিকের সুখ্যাতি করা হয়। অনেক সময় গাঁয়ের ষোল আনার পক্ষ থেকে তাকে কোন কিছু পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

বুড়িবাঁদনার দিন যে বলদকে খুঁটানো হয় সেই বলদকেই কেবলমাত্র সাজানো হয় এমন নয়। অন্যান্য বলদকেও গুঁড়ি-রঙ দিয়ে সাজানো হয়.

বিঃ দ্রঃ বাঁদনা পরবে অন্যান্য কাজে মেতে থাকলেও বিশেষ ভাবে নজর রাখতে হয় প্রত্যেকটি গাই-গরু যেন পেট ভর্ত্তি খাবার পায়।

(ঙ) **কাঁটাকাড়হা ঃ** বুড়িবাঁদনার পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয়া তিথিতে কাঁটাকাড়হা। গরুবাগাল, কাড়া বাগালের বিশ্রামের দিন। ঐ দিন বাগাল তার ইচ্ছা অনুসারে কোন কাজ করতে পারে। বাঁদনার এই কয়দিন বাগালের দিবা-রাত্রির ভাবনা কেমন করে রাখলে কি কি খাওয়ালে বলদ/কাড়া ভাল মার/খেলা করবে। কাড় (মহিষ) মাতাল হয়ে যায়। যে দিকে মন চায় দৌড় মারে। বাগালকেও পিছনে পিছনে দৌড়তে হয়। অনেক সময় তার পা কেটে যায়। পায়ে কাঁটা ফুটে যায়। কিন্তু সে দিকে তার নজর দেওয়ার সময় কুথা? সেই কারণে পায়ের কাঁটা তোলার জন্য আজকের দিনের নাম হয়েছে — কাঁটাকাড়হা।

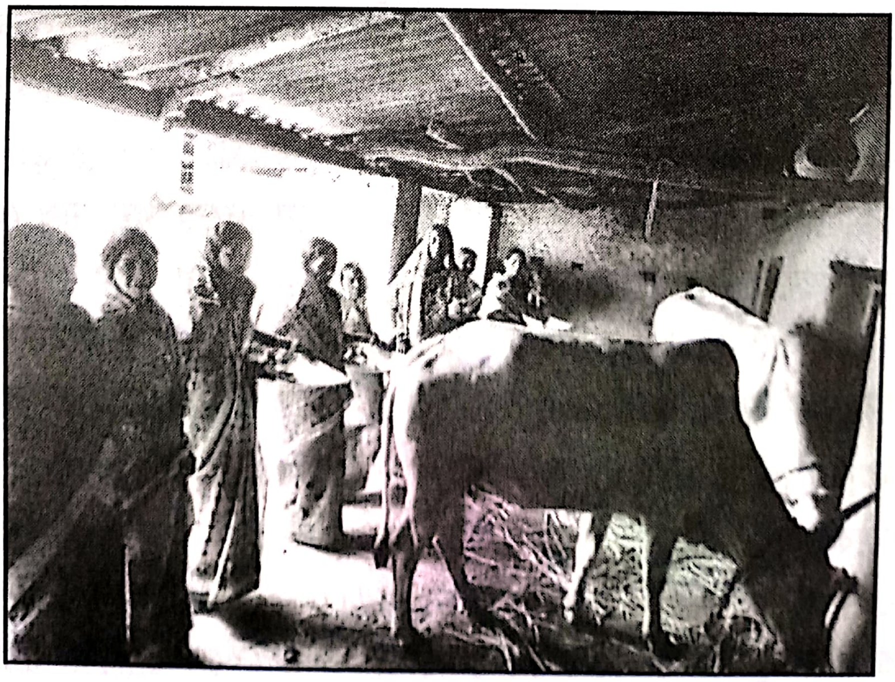
(চ) **কাড়া খুঁটা ঃ** কাঁটা কাড়হার দিন কোন নির্বাচিত স্থলে কাঁড়া খুঁটা হয়। প্রত্যেকের নিজ নিজ কাড়াকে খুঁটাবার জন্যে শক্ত মালখুঁটা গাড়তে হয়। মোড়, ফুলের মালা, গুঁড়ি-সিঁদুর দিয়ে যে যেমন পারেন খুঁটাকে সাজান। অনেকে আবার খুঁটার উপরিভাগে নোটের মালা বেঁধে দেন। পাকা খেলোড়ি

পারলে ঐ টাকার মালা খুলে নেয়। তাতে বিপদের বেশ ঝুঁকি থাকে। অসাবধান হলে জীবনহানিও হতে পারে।

মালখুঁটায় শক্ত-মোটা শন দড়ি বিশেষ মাপে ও কায়দায় বাঁধা হয়। যেটিতে কাড়া বাঁধা হবে, ফুলের মালা, ধানের মোড় পরিয়ে গায়ে গুঁড়ির ছাপ এঁকে সাজিয়ে আখড়ায় এনে খুঁটায় বাঁধা হয়।

খেলোড়ির দল হাতে মহিষের চামড়া নিয়ে ঢোল, মাদ্যল, ধমসা বাজিয়ে নাচ করতে করতে আনন্দ উল্লাসে কাড়া খেলতে আসে। মহিষের চামড়াকে কাড়ার সামনে আড়া-আড়ি ভাবে মেলে ধরে। কাড়া রাগে জোর ফোঁস ফোঁস শব্দ করে চামড়াকে জোর শিং দিয়ে আঘাত করে। কাড়াকে খুঁটান অহিরা গীত শোনানো হয়। গীত শেষে আবার বাজনা বাজানো হয়। দর্শক জোর হাততালি কুল্‌কুলি দেয়।

একটি কাড়া খেলে খেলোড়ি দল অপর কাড়ার পাশে যায়। কাড়া খুঁটা পরব দেখার জন্য গাঁয়ের মহিলা পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সকলে হাজির হয়। আনন্দ সহকারে কাড়াখুঁটা উপভোগ করে। যার কাড়া ভাল মার করে/খেলা দেখায় তাকে সম্মান ও পুরষ্কার দেওয়া হয়। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে কাড়া খুঁটার আখড়ায় খুঁটান শেষে কাড়া খেলোড়ির দলবল ঘরে ফিরবার সময় বছরের প্রথম টুসু গীত গাওয়া শুরু করে। টুসুগীতের সুরে বাজনা বাজিয়ে দল গাঁয়ে ফিরে আসে। অন্যান্য সকলে বাড়ী মুখো হয়। লোকজন শেষ হয়ে গেলে সাবধানে কাড়াকে খুলে সামনে পিছনে বড় লাঠি হাতে নিয়ে পাহারা দিতে দিতে গোয়ালে নিয়ে আসা হয়।



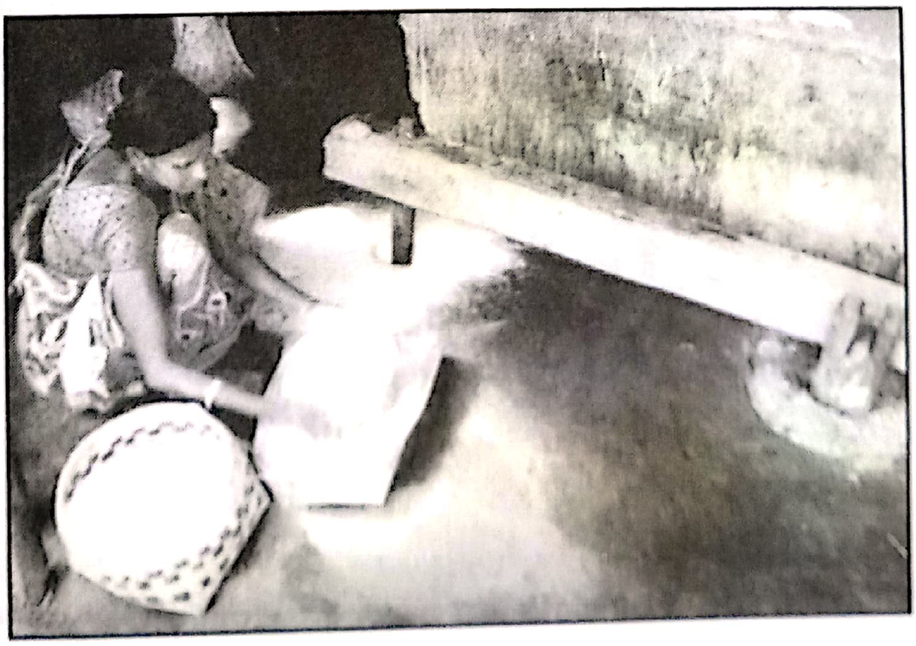
ডেনি/ঠাকুরান আনা

আমন ধান কাটা শেষ হওয়ার মুখে কৃষক পাঁচটি ধানের গাছি ছেড়ে রেখে দিতে বলেন। ক্ষেত থেকে সমস্ত ধান খামারে তোলা হলে শেষ দিনে কিম্বা দু-চার দিন পরে শুভ দিন দেখে ক্ষেতে রেখে দেওয়া পাঁচটি গাছিকে অনুষ্ঠান করে খামারে আনাকে ডেনি উঠা/ঠাকুরান আনা অনুষ্ঠান বলা হয়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান করে নিতে হয়।

যেদিন বাড়ীতে ঠাকুরান/ডেনি আনা হবে সেই দিন সকালেই মা-বউয়েরা ঘর-আঙিনা, উঠান-খামারে গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে নেন। ঘরের আঁকদুয়ার থেকে খামার পর্যন্ত আলপনা দেন। তুলসী থানের সামনে দু'টি পায়ের আলপনা ও ধানগাদার পাশে অনুরূপ পায়ের ছাপের আলপনা দেন। একটি পিঁড়িকে গুঁড়ি দিয়ে সাজিয়ে খামারের পায়ের ছাপ আঁকার সামনে বিছিয়ে রেখে দেন।

কৃষক স্নান করে একটি দা, একটি ঘটিতে জল এবং আতপ চাল, তুলসী পাতা, গেঁদাফুল, গুড়, মধু, দুধ, সিঁদুর বঁহাতায় সাজিয়ে ধান ক্ষেতে যান। সেখানে মাটি সমেত দুটি ধান গাছিকে উপড়ে ও বাকি তিনটি ধানগাছিকে গোড়ায় কেটে একসঙ্গে বেঁধে পূজা করেন। দুধ-ঢাল, জল ঢাল দিয়ে প্রণাম করার পর মাথায় তুলে নিয়ে বাড়ী আসেন। বাড়ীতে ফিরবার পথে কারো সাথে দেখা হলে কথা বলা বারণ।

কৃষক গৃহিণী আগে থেকেই এক ঘটি জল, ঘটির মুখে তিনটি আমপাতা রেখে দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকেন। দুয়ারের চৌকাঠে একটি গামছা রেখে দেন।



কৃষক ধানের আঁটি মাথায় নিয়ে দুয়ারে দাঁড়ালে পর গৃহিনী জল ঢাল দিতে দিতে খামারে যান। পিছনে পিছনে কৃষকও খামারে যান। সেখানে ধানগাদার গা লাগোয়া পিঁড়ির উপর মাথার ধানের আঁটি রেখে দিয়ে প্রণাম করেন। গৃহিনীও প্রণাম করেন। এই সমুহ অনুষ্ঠানটিকে ডেনি/ঠাকুরাণ আনা বলা হয়।

এই দিন কৃষকদের বড় আনন্দের দিন। বাড়ীতে পিঠা পায়েস রান্না হয়। বাড়ীর সকলেই আনন্দ সহকারে ঐ পিঠা-পায়েস ও অন্যান্য ভাল খাবার খেয়ে থাকেন।

ডিনি জিরানি/খামার জিরালি ঃ ডিনি/ঠাকুরান আনার পরের দিন ডিনি জিরানি/খামার জিরালি। এই দিন কৃষকের বাড়ীর বিশ্রামের দিন। এই দিন কোন চাষের কাজ করা হয় না। এমনকি খামারে প্রবেশ করাও নিষেধ। যদি খামারে রাখা কোন জিনিস আনতে হয়, দরকার মত মনে করে আগের দিনেই সেই জিনিস খামার থেকে এনে রাখা হয়।

খামার জিরালির দিন বাড়ীর কোন দ্রব্য কোন অপর লোককে দেওয়া হয় না। বিশ্বাস, ঐ দিন কোন জিনিস দিলে ঘরের লক্ষ্মী চঞ্চলা হবে। ঘরে থাকবে না। ঘরের বউ-বিটি, গাই-গরু ও ধানকে কৃষকপরিবার লক্ষ্মী জ্ঞান করেন। ভালভাবে খামার জিরালি পালন করলে ঘরে লক্ষ্মী বিরাজ করবেন। কোন অভাব ও অঘটন হবে না।

* * * * *



টুসু পরব/মকর

টুসু পরব একটি গুরুত্বপূর্ণ পরব। নানা রকম নেগাচারে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন আরম্ভ হয়ে শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তির দিন মকরে। টুসুকে আমরা নানারূপে পাই। টুসু কখনো মা, দেবী, কন্যা, খেলার সাথী। টুসু মানবি মা, কন্যা, খেলার সাথী নয়। আসলে টুসু এক সৃজনশীল শক্তিস্বরূপা। যে শক্তির গুণেবীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে চারা গাছ, চারা গাছ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল, ফল ও বীজে রূপান্তর ঘটে। সেই ফসল সৃজনশীলা শক্তিই টুসু। আবার এই ফসল/জীব মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে জীবনীশক্তি অর্জন করতে পারে। এই অঙ্কুর সৃজনশীলা ও জীবনীশক্তি সৃজনশীলাই টুসু।

টুসু পাতা ঃ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন কুড়মালি নেগাচারী মেয়েরা ঠিক সন্ধ্যাবেলা তূলসী ধানের পাশে অথবা সদর জায়গায় ঘরের কোন কুলঙ্গিতে টুসু পাতে। একটি নতুন মাটির সরা চালগুঁড়ি গোলা জল দিয়ে গাবিয়ে আলপনা এঁকে সরার ভিতরে এক মুঠা ধান, বকনা বাছুরের গোবরের তিনটি কিংবা পাঁচটি নাড়ু এবং একটি গেঁদা/বাসক/বাঁদুফুল রেখে হাঁটুগেড়ে প্রণাম করে টুসু গীত গেয়ে টুসু পাতে। অতি অবশ্যই ঐ দিন সকালে উঠান-আঙিনায় গোবরগোলা জল দিয়ে লরা-লপ্‌টা করে নেয়।

টুসু পূজা ঃ টুসু পাতা হলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় টুসুর মায়েরা হাত-মুখ ধুইয়ে ধূপ-প্রদীপ জ্বালিয়ে চাল ভাজা, চিড়ে ভাজা, কুত্থি ভাজার ভোগ দিয়ে একটি গেঁদাফুল রেখে প্রণাম করে টুসু গীত গায়। টুসু পূজার মন্ত্র ঐ টুসুসঙ্গীত। বাঁধা ধরা টুসু পূজার কোন গীত নেই। টুসু গীত হলেই হল। কয়টি গীত গাইতে হবে সে রকম কোন নিয়ম নেই।

অন্যান্য নেগ-নেগাচার ঃ টুসু পাতার পর থেকে টুসু বিসর্জন দেওয়ার দিন পর্যন্ত প্রায় একমাস কাল ধরে টুসু পরবকে সামনে রেখে অনেক রকম আচার পালন করতে হয়। এক একটি দিন ধরে এই আচার পালন করতে হয়। যেমন, আঁউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি ও মকর। পৌষ মাসের মধ্যেই আবার একদিন পৌষালু/বনভোজন করতে হয়।

পৌষালু বনভোজন ঃ পৌষ মাসের পনেরো তারিখের পরে এবং আঁউড়ির দিনের আগে যে কোন একদিন গাঁয়ের এক এক গোষ্ঠীর লোক পাশা-পাশি কোন বনে কিম্বা কোন জলাশয়ের ধারে রান্না করে সকলে খাবেন। ঐ দিন সকালে স্নান করে গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি যে কোন একটি গাছের গোড়ায় গোবরের

মাড়ুলি দিয়ে, মাড়ুলির উপরে তিন/পাঁচটি সিঁদুরের আঁক দিয়ে সিঁদুরের আঁকের উপরে তূলসী পাতা রেখে বনদেবী/বনবুড়িকে স্মরণ করে আতব চালের সঙ্গে গুড়-দুধ-মিশিয়ে ভোগ করে নিবেদন করবেন। তারপর পায়রার বাচ্চা কিম্বা মুরগী বলি দিয়ে প্রণাম করবেন। বাড়ীতে সেদিন কোন রান্না করা হয় না। নানা রকমের তরি-তরকারী ও মাংস রান্না করা হয়। উপস্থিত সকলে ওখানেই ভোজন করেন। বাড়ীতে দু-চারজন থাকলে তাদের জন্য খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়। খাবার খাওয়ার আগে ভাত-তরকারী বনদেবীকে দিয়ে ভোজন করা হয়। ঘরে ফিরে আসার সময় পূজাস্থলে প্রদীপ জ্বালিয়ে বনবুড়িকে স্মরণ করে প্রণাম করা হয়। এই সমূহ অনুষ্ঠানকে পৌষালু/বনভোজন বলা হয়। বাড়ীতে ঐ দিন কোন কোন পরিবার রাত্রিতে আ'সকা পিঠা তৈরী করে সকলে খেয়ে থাকেন। সেই বৎসর যে গোষ্ঠীর কোন লোক মারা গেলে পৌষালু/বনভোজন করা চলে না।

আঁউড়ি ঃ পৌষ সংক্রান্তির তিন দিন আগের দিনকে বলা হয় আঁউড়ি। টুসু পরবের গুরুত্বপূর্ণ হল তিল দিয়ে খাবার তৈরী করে খাওয়া। তিলের লাড়ু, বাঁকা পিঠা, গড়গড়্যা পিঠা, উঁধি পিঠার ভিতরে দেওয়া হয় তিলের পুর। এই দিন তিলকে ছুলে উপরের কালো অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। স্নান করতে গিয়ে মা-বোনেরা টুসু পরবের পিঠা তৈরী করার চাল ও তিল ধুয়ে নিয়ে আসেন। বাড়ীতে এসে ধোওয়া চালকে ভিজতে দেওয়া হয়।

বাড়ীর পুরুষ মানুষেরা এই দিন খামারের যাবতীয় কাজ শেষ করে নেন। বিশেষ করে খড়কে ভালোভাবে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখা হয়। যাতে করে খড়ের গাদায় জল ঢুকে না যায়। জল ঢুকে গেলে খড়/পুঁয়াল নষ্ট হয়ে যাবে। সেই কারণে বিশেষ কায়দায় খড়ের গাদায় খড়েরই ছাউনি তৈরী করে দেন।

চাঁউড়ি ঃ টুসু/পৌষ পরবে পিঠা তৈরী করার জন্য আজকের দিনে গুঁড়ি কুটা হয়। মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে থাকলে তাকে আনবার লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। টুসু পরবে সকলের জন্য চাই নতুন জামা-কাপড়। পিঠার জন্য চাই গুড়। ঐ গুলিও সম্ভবতঃ এই দিনের মধ্যে জোগাড় করে/কিনে আনতে হয়। ছেলেরা নদী-পুকুর ঘাটে যেখানে মকরস্নান করা হবে সেখানে ডাল-পাতা দিয়ে 'মকর-কুমা' তৈরী করে রাখে।

বাঁউড়ি ঃ টুসু পরবের এই বাঁউড়ির দিনটি সব চাইতে ব্যস্ততার দিন। সকালে মা-বোনেরা উঠানে-আঙিনায় গোবর দিয়ে স্নান করতে যান। স্নান করার পর টুসুকে প্রণাম করে উঁধি, গড়গড়্যা পিঠা ও তিলের নাড়ু তৈরী করতে বসে যান। পুরুষেরা দল বেঁধে যান বনে শিকার করতে। পুরুষেরা স্নান করে পিঠা খেয়ে চাল ও ধানের কুঁচড়ি বাঁধেন। বিশেষ করে বীজ ধানের কুঁচড়ি।

কুঁচড়ির গায়ে কিছুটা জায়গায় চালগুঁড়ির প্রলেপ দিয়ে সিঁদুরের তিনটি রেখা এঁকে দেন। টুসুর মায়েরা টুসু বিসর্জন করার জন্য চৌড়ল/চতুর্দলা জোগাড় করে নেয়। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যেকেই তলপায়ে সরিষার তেল দেন।

টুসু জাগরণ ঃ বাঁউড়ির দিন টুসু জাগরণ। টুসু জাগরণ করার স্থানে ছামড়া তৈরী করা হয়। টুসুর চৌড়লে ও মালা বদল করার সময় গেঁদাফুলের মালা দরকার সেগুলি গেঁথে রাখা হয়। টুসুকে ভোগ দেবার জন্য ভোগের জিনিস তৈরী করে রাখতে কিম্বা জোগাড় করে নিতে হয়।

টুসুর মায়েরা সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া করে, তলপায়ে সরিষার তেল নিয়ে, ধূপ-দীপ সাজিয়ে, ভোগের থালা ও চৌড়ল নিয়ে বসে যায় টুসুর জাগরণ করতে। টুসুকে ধূপ-দীপ ও ভোগ নিবেদনের পর প্রণাম করে লেগে যায় টুসু গীত গাইতে। রাতভর চলে এই গীত। অন্যান্য মা-বোনেরা বাড়ীর কাজ সমাধা করে যোগদান করেন টুসু জাগরণে।

অপর দিকে ছেলেছোকরা-পুরুষ মানুষের দলও লেগে যায় বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাজনা বাজিয়ে টুসুগীত গেয়ে টুসু জাগরণ করতে। কোন কোন দল ঢোল-ধমসা-মাদ্যল বাজিয়ে টুসুগীত গাইতে গাইতে নাচ করতে করতে কুলহিবেড়ায়।

টুসুর মালাবদল ঃ বাঁউড়ির রাতের ভিনসারে/ভোরবেলায় টুসুর মায়ের দল বার হয় মালাবদল করতে। এক দলের সঙ্গে অপর দলের চৌড়লের ও নিজে নিজের মধ্যেও মালাবদল করে। সখ্যতার আদান-প্রদান করে। মালাবদল করার সময় গাওয়া হয় মালাবদলের টুসুগীত।

মকর ঃ কুড়মালি নেগাচারে আজকের দিন কৃষিবর্ষের শেষ দিন। আজ পর্যন্ত সূর্য্যদেব মকরক্রান্তিতে অবস্থান করেন। পরের দিনেই মকরক্রান্তি ছেড়ে কর্কটক্রান্তিতে গমন করেন। সেই কারণেই এই দিনটিকে শুভদিন মনে করে সূর্য উদয়কে লক্ষ্য করে মকরস্নান করা হয়। এই সময় খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকে। ঠাণ্ডা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ছেলে-ছোকরার দল আগে থেকেই তৈরী করা 'মকর কুমা'য় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মকরস্নান করার পর ছেলে-ছোকরারাতো বটেই অন্যান্যরাও আগুনের সেঁক নিয়ে শরীর গরম করে নেন।

মকরস্নান করার পর ঘটি ভর্তি করে নদী-পুকুর থেকে মকর জল আনা হয়। স্নানঘাটেই নতুন জামা-কাপড় পরা হয়। মকর জল বাড়ীতে এনে প্রথমে তুলসী থানে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গোয়ালঘরে, ধানের গোলা/পুড়ায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কপালে চন্দন কিম্বা রহিন মাটির টিপ নিয়ে গুড়, চিড়া, তিলের নাড়ু, উঁধিপিঠা খেয়ে মকর জল পান করেন। স্নান করে এসে বাড়ীর গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করা হয়।

টুসু বিসর্জন ঃ টুসুর মায়েরা নতুন কাপড় পরে টুসুকে শেষবারের মত ফুল দিয়ে প্রণাম করে চৌড়ল সাজিয়ে তাতে টুসুকে চড়িয়ে হাতে তুলে নিয়ে বিসর্জনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তবুও টুসুগীত গাইতে গাইতে দল বেঁধে কোন নদী কিম্বা জলাশয়ে টুসুকে বিসর্জন করতে নিয়ে যাওয়া হয়। নদীর ঘাটে ঘাটে টুসু বিসর্জনের মেলা বসে। মেলায় টুসুগীতের প্রতিযোগিতা হয়। দলে-দলে গীতের মাধ্যমে জোর সখ্যতার লড়াই জমে ওঠে।

পুরুষ মানুষের ছেলে-ছোকরার দলও চৌড়ল নিয়ে বাদ্যসহকারে টুসুগীত গাইতে গাইতে নাচ করতে করতে মেলায় সামিল হয়। জোর মেলা জমে ওঠে। সন্ধ্যা নামার আগেই টুসু বিসর্জন করে মা-বোনের দল ভারাক্রান্ত মনে আস্তে আস্তে পা ফেলে বাড়ীতে ফিরে আসেন।

বিকালবেলা কোথাও কোথাও পুরুষ মানুষের বেঝা বিঁধা ও ফৌদি খেলার আসর জমে যায়। আবার কোন কোন জায়গায় মৌরগ লড়াইয়েরও মেলা লাগে। সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌরগ লড়াই চলে।

বিঃ দ্রঃ বৎসর কালের মধ্যে যদি কোন গোষ্ঠীর লোক মারা যায়, সেই গোষ্ঠীর লোক যেমন পৌষালু/বনভোজনে যেতে পারেন না তেমনি সেই গোষ্ঠীর পরিবারে তিলের নাড়ু ও উঁধি/গড়গড়্যা পিঠা তৈরী করা নিষেধ থাকে। পরিবর্তে মাংস পিঠা, সীম পিঠা, লাউ চকলি, কপি চকলি ইত্যাদি তৈরী করে পৌষ পরবে/টুসু পরবে খেয়ে থাকেন।



পঞ্চম অধ্যায়

বিশেষ ঘটনা বিষয়ক নেগ-নেগাচার

গো-বধ বিষয়ক ঃ

কুড়মালি নেগাচারে গোহত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। গরুকে কুড়মালি জনগোষ্ঠীর মানুষ বহু উপকারী ও সাহায্যকারী প্রাণী হিসাবেই দেখেন না, গাই-গরুকে অন্যান্য পশুর মত পশু ভাবেন না; তাকে দেব/দেবী জ্ঞানে পূজা করেন। তার সুখ্যাতি করে গীত বাঁধেন এবং ঐ গীত গাই-গরুকে শোনানো হয়। সেই কারণে জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক কেউ যদি গরুকে হত্যা করে বসেন তাহলে তাকে অপরাধী ভাবা হয়। সেই অপরাধ নিরসনের জন্য বা অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে কিছু নেগ-নেগাচার পালন করতে হয়। প্রতিপালন না করা পর্যন্ত সেই পরিবারের লোকজনকে কোন সামাজিক কাজে অংশ নিতে দেওয়া হয় না। সেই পরিবারের কোন খাবার কেউ খায় না। এমনকি কেউ জল পর্যন্ত পান করে না।

নিজের হাতে গরুকে না মারলেও আরও কোন কোন ভাবে মারা গেলেও গৃহকর্তাকে অপরাধী ভাবা হয়। গরু বাঁধা অবস্থায় মারা গেলে, গরুকে আঘাত করার কারণে মারা গেলে, কুয়ায় পড়ে মারা গেলে অথবা জ্ঞানে কি অজ্ঞানে খাবারে বিষ দেওয়ার কারণে গরুর মৃত্যু ঘটলে অপরাধ বর্তায়। যেকোন কারণেই হোক কোনভাবেই বিষয়টি গোপন করে রাখা চলে না। প্রকাশ করতে হয়। অপরাধ স্বীকার করতে হয়। অপরাধ নিরসনের জন্য নেগ-নেগাচার নিয়ম মত পালনের মাধ্যমে অপরাধ মুক্ত হতে হয়।

ঘটনা ঘটে গেলে পর গোষ্ঠীর বয়োঃজেষ্ঠ ব্যক্তিকে এবং বংশের যে বড় ঘর সেই ঘরের বয়োঃজেষ্ঠ যে ব্যক্তি তাদের জানাতে হয়। তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে কিম্বা ডেকে এনে তাঁদের উপদেশ এবং পরামর্শ মত নেগাচার পালন গাঁয়ের মাহাতকে জানাতে হয়। গাঁয়ের মাহাত (মোড়ল) সমাজের পট্‌লৈ বা পট্‌করকে জানাবেন।

অমাবস্যা তিথির যোগ ধরে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উপবাস করবেন। গরুর

মালিক ও পালনকারী বুঢ়াবাবা ও গরৈইয়াকে মান্য করবেন। তাঁদের কাছে অপরাধ স্বীকার করে, তাঁদের স্মরণ করে নেগ-নেগাচার পালন করতে হয়। বাঁদনা পরবে যে ভাবে গরৈইয়া পূজা প্রতিপালন করা হয়। সেই ভাবে আবার গরৈইয়া পূজা করার বিধি আছে। পারলে পাঁচজন আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করে ডাকতে হয়। অমাবস্যার সন্ধ্যায় গাই-গরুকে মাথায় ও শিংয়ে সরিষার তেল মাখানো হয়। গোয়ালে জাগর জ্বালানো হয়। পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে গৃহকর্তা নদী বা পুকুরে স্নান করবেন। দাড়ি-নখ কেটে অথবা মাথা মুন্ডন করে স্নান করার নিয়ম। স্নান করার পর ভিজে কাপড়ে একঘটি জল নিয়ে ঘাটে উঠার মত করে বাড়ীতে আসবেন।

ইতিপূর্বে উঠান-আঙিনা গোবর জল দিয়ে লরা-লপ্টা করা হবে। গৃহিনী স্নান করে ভিজে কাপড়ে নূতন উনান জ্বালিয়ে নূতন মাটির কড়াইয়ে গরৈইয়া পূজার জন্যে ঘিয়ের পিঠা তৈরী করবেন। তূলসীতলায় আলপনা দিয়ে বুঢ়াবাবার স্মরণে পূজা করা হবে। তারপর গোয়ালে চালগুঁড়ির খঁড় এঁকে গরৈইয়াকে স্মরণ করে গরৈইয়া পূজা করা হবে। ঐ সঙ্গে অন্যান্য দেব/দেবী ও পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও পূজা করা হবে। পূজার সময় অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা হবে। পটলৈ পাঁঠি ছাগল কিম্বা পাঁঠা ছাগল বলি দিবেন। সেই মাংসের এক পোয়া বা আড়াইশো আন্দাজে পাঁচ জায়গায় পাঁচটি মাংসের শালপাতা দিয়ে পটলা বাঁধা হবে। একভাগ মাহাত (মণ্ডল), পটলৈ, গোষ্ঠীর বড় অংশ, গোষ্ঠীর বয়োঃজেষ্ঠ ব্যক্তি ও একভাগ মান্য ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। মাহাত ও পটলৈকে ধুতি ও কিছু টাকা সাম্মানিক হিসাবে দেওয়া হবে।

বাড়ীতে ভাত, তরকারী ও মাংস রান্না করা হবে। পটলৈ, মাহাত ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত অতিথি পাড়া-প্রতিবেশী এক সাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করবেন। সকলের খাওয়া হয়ে গেলে পর মাহাতর অনুমতি নিয়ে বাড়ীর স্বামী-স্ত্রী ভোজন করবেন।

গৃহ প্রবেশ ঃ

কোন পরিবার নতুন ঘর-বাড়ী তৈরী করে থাকলে, সেই ঘর ব্যবহারের পূর্বে কিছু নেগ-নেগাচার পালন করে নিয়ে নতুন বাড়ী ব্যবহার করার বিধান আছে। বিধি-বিধান মেনে নেগাচার পালন করে বাড়ী ব্যবহার করলে কোন দুর্ঘটনা হয় না।

যার যেমন ক্ষমতা ও মানসিকতা সেই মত নেগ-নেগাচার ও অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। তবে ছোট হোক বড় হোক খানিকটা করে নিলে মনের সাহস ও বল বাড়ে। অনুষ্ঠানে কিছু লোককে নিমন্ত্রণ করে আনা যায়, আবার নিজে নিজে

করে নিলেও চলে যায়।

সুবিধা মত কোন একটি দিন নির্বাচন করে অনুষ্ঠান করা যায়। যেদিন অনুষ্ঠান করা হবে সেদিন অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীকে উপবাস করে থাকতে হয়। সকালে গোবর জল দিয়ে আঙিনা-উঠান পরিশুদ্ধ করে নিতে হয়। তারপর ঘরের দুয়ারে এবং তুলসী তলায় আলপনা দিতে হয়। দুয়ারে ও বাড়ীর চারিপাশে বনমালা দেওয়া হয়। আঁকদুয়ারে দুটি নতুন জলভর্তি ভাঁড় রেখে ভাঁড়ের মুখে আমপাতা বা ডাল গুঁজে দেওয়া হয়। তুলসী তলায় দেব/ দেবীদের ও পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ করে ধূপ-দীপ জ্বেলে পূজা করা হয়। গৃহ প্রবেশের পূর্বে তাঁদের আশীর্বাদ ও অনুমতি চাওয়া হয়। দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের সম্মানে মুরগি কিম্বা পাঁঠা বলি দিয়ে রক্তপাড়া হয়।

ঘরের ভিতর একটি জায়গায় আলপনা দিয়ে ঘটভাঁড় বসিয়ে গৃহের দেব-দেবী স্থাপন করা হয়। সেখানেও পূর্ব-পুরুষ ও অন্যান্য দেব-দেবীদের অবস্থানের জন্য আহ্বান স্মরণ ও পূজা করা হয়। তাঁদের আশীর্বাদ চাওয়া হয়। বাড়ীতে যেন সুখে-শান্তিতে-আনন্দে বংশ পরম্পরায় নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারা যায়, কোন রোগ শোক দুর্ঘটনা বাড়ীতে প্রবেশ করতে না পারে। সদা-সর্বদা তাঁরা যেন রক্ষক হিসাবে বিরাজ করেন।

পূজা শেষে দুধ ঢাল - জল ঢাল দেওয়ার পর প্রণাম করে দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের আশীর্বাদী জল নিয়ে একটি নতুন মাটির হাঁড়ির ঝারা-বারা তৈরী করে সেই জল মাথায় নিয়ে গৃহস্বামী বাড়ীর চারপাশে ঘুরবেন। স্ত্রী স্বামীর আগে আগে শাঁখ বাজিয়ে ঘুরবেন।

পূজার কাজ ও জলধারা দেওয়ার পর নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের ভোজনের ব্যবস্থা করা হবে। সকলের খাওয়া হয়ে গেলে পর স্বামী-স্ত্রী ভোজন করবেন।

কুয়া বা কূপ প্রতিষ্ঠা ঃ

নতুন কুয়া বা কূপ কুড়ানোর পর বাঁধাইয়ের কাজ হয়ে গেলে যদি তা প্রতিষ্ঠা করার বাসনা জাগে তা হলে কিছু নেগ-নেগাচার পালন করতে হয়।

সুযোগ ও সুবিধা মত একটি দিন ধার্য্য করে, দু-পাঁচ জন পাড়া-প্রতিবেশী ও গোষ্ঠী-ভায়াদের এক-আধজনকে ডেকে অনুষ্ঠান করার নিয়ম। ঐ দিন ঘর-দুয়ার গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়। গৃহকর্তা স্নান করে কাছাকাছি বাঁধ-পুকুর-নদী মিলিয়ে কমপক্ষে পাঁচ জায়গার জল নিয়ে আসতে হয়। ঐ জল কুয়ার ভিতর ঢেলে দিতে হয়। জল দেওয়ার পর দুধ,

দই, ঘি, মধু, বকনা বাছুরের গোবর গোলা জল, গুড়, ডাবের জল কুয়ার জলে ছিটিয়ে দিতে হয়। অথবা ঢেলে দিতে হয়। বাড়ীর বউ স্নান করে এসে ভিজে কাপড়ে/নতুন কাপড় পরে নতুন সূপে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে ধান, দুর্বা, সিঁদুর, গুঁড়ি, কাজল ও ফুল সাজিয়ে কুয়ার গায়ে গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল দেবে। কুয়ার চারপাশে ফুল ছড়াবে। তারপর পূর্ব মুখে ধান-দূর্বা দিয়ে তিনবার চুমাবে। চুমানোর পর স্বামী-স্ত্রী হাঁটু গেড়ে প্রণাম করবে। প্রণাম করার সময় পূর্ব-পুরুষ ও দেব-দেবীদের স্মরণ করে তাঁদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে, যেন এই কুয়ার জল সব সময়ের জন্য ভাল থাকে। কোন অবস্থায় যেন জল শুকিয়ে না যায়। কুয়ার জল যেন সবসময় ব্যবহারযোগ্য থাকে। পানের ক্ষেত্রে যেন অমৃততুল্য হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে গুঁড়-চিড়া বিলানো হবে। তারপর ঐ কুয়ার জলে রান্না করে নিমন্ত্রিত গোষ্ঠী-ভায়াদ, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অনুষ্ঠান করে কুয়ার জল ব্যবহার করলে মনে একটা তৃপ্তি অনুভব হবে। কারো মনে কোন ভয়-ভাবনা থাকবে না। সব কাজে জল ব্যবহার করা যাবে।

বাঁধ বিহা ঃ

নতুন বাঁধ বা পুকুর কাটলে পর ঐ বাঁধের জল সাধারণ মানুষের সকল কাজে যেন ব্যবহারযোগ্য হয় সেই বাসনায় পুকুর প্রতিষ্ঠা বা বাঁধ বিহা করার রীতি-নিয়ম আছে। বাঁধ বিহার জন্যও কুড়মালি নেগাচারে কিছু নেগ-নেগাচার পালন করার চল আছে। বাঁধ বিহা বেশ খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। বর্তমানে এই চল প্রায় উঠেই গেছে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত সামর্থবান পরিবার এমন কাজ করতে পারতেন বা করতেন। এখনও সমাজে একটা কথা চল আছে, সম্পত্তি ও অর্থ থাকলেও যে কেউ বাঁধ-বাগান করতে পারে না। তার জন্য চাই ভাল মনের মানুষ। ভাল মানুষেই পারেন বাঁধ-বাগান দিতে। যে মানুষ অপর জন-সাধারণের সুখ-সুবিধার কথা ভাবনা-চিন্তা করেন, তিনি আখেরে সমাজের মানুষের শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও সুনাম পেয়ে থাকেন। যাই হোক, আসা যাক বাঁধ বিহার কথায়।

বাঁধ কুড়া হয়ে গেলে পর একটি শুভদিন বাছা হয়। পৌষ, চৈত ও ভাদর মাসে বাঁধ বিহা করা চলে না। মনে করা হয় ঐ তিনটি মাস ভাঙা মাস। ভাঙা মাসে শুভ কাজ চলে না। সাধারণতঃ মাঘ, ফাল্গুন ও বৈশাখ মাসে বাঁধ বিহা করা হয়ে থাকে।

বিহা ঘরে অনেক প্রস্তুতির দরকার। বাঁধ বিহায় তেমনি অনেক কিছুই

দরকার পড়ে। আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব, ফুল-পরান, গোষ্ঠী-ভায়াদ, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে নিমন্ত্রণ জানাতে হয়। বিশেষ করে মুদি-মুদ্যানকে (কড়া পরিবারের স্বামী-স্ত্রী) নিমন্ত্রণ করে ডাকতে হয়। কামারকে ত্রিশূল তৈরী করার জন্য এবং ছুথারকে চোখ খুঁটা বানানোর জন্য জানাতে হয়। আগাম নিমন্ত্রণ করতে হয়। তুলসী থানে ছামড়া বাঁধতে হয়। বাঁধ বিহার দিন নাপিত ডেকে বিহাঘরের মতই নখ-চুল-দাঁড়ি কাটতে হয়। ঘর-দুয়ার আঙিনায় গোবর দিতে হয়। তেল-হলুদ বিলানো হয়। পুকুরের মাঝখানে চোকখুঁটা গেড়ে খুঁটার মাথায় ত্রিশূল দিয়ে দিতে হয়। ইতিপূর্বে মুদি-মুদ্যান বাঁধের তিন ঝড়া মাটি খুঁড়ে আলের উপর ফেলে দেন। তাদেরকে সাম্মানিক হিসাবে শাড়ি-ধুতি ও টাকা দেওয়া হয়। বাড়ীর গৃহিনী নতুন কুলায় ধান-দূর্বা, ধূপ-দীপ, গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল নিয়ে ধূপ-দীপ জ্বেলে চোক খুঁটায় গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল দিয়ে পূর্ব মুখ হয়ে চুমাবেন। গৃহকর্তা বাঁধের জল নতুন মাটির হাঁড়ির ঝারাবারা করে বাড়ীতে নিয়ে আসবেন।

সন্ধ্যায় বাড়ীর কর্তা-গিন্নি নতুন কাপড় পরে বউ-বর সাজবেন। তুলসীতলায় ছামড়ার ভিতর উভয়ে পিঁড়ি পেড়ে বসবেন। আমপাতা বদল, পানখিলি বদল ও মালাবদল করবেন। বাড়ীর, গোষ্ঠীর আত্মীয় বউয়েরা বউ-বরকে নতুন কুলায় ধূপ-দীপ জ্বেলে ধান-দূর্বা দিয়ে চুমাবে। উলু দেবে শাঁখ বাজাবে। ঢোল-সানাই বাজবে।

বিহাঘরের মতই দিনভর খাওন-দাওন চলবে অর্থাৎ খাসি কেটে ভোজের ব্যবস্থা করা হবে। হাসি-আনন্দ, নাচ-গীতে অনুষ্ঠান জমজমাট হবে। যাকে বলে বাঁধবিহা হাসি-আনন্দের অনুষ্ঠান। বিটি-জামাই ও অন্যান্য সম্মানীয় আত্মীয়-কুটুম্বকে নতুন কাপড় দিতে হয়। অতীত, ফকিরকে দান দেওয়া হয়। সকলকে ভোজ খাওয়ানো হয়। সবাই যেন হাসিমুখে বিদায় হয়।

বাঁধ বিহার অনুষ্ঠান করতে পারলে দূর-দূর গ্রামে গৃহস্বামীর সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। সবাই ধন্য ধন্য বলবে।

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

কুড়মালি নেগাচারের সর্বক্ষণের জন্য কিছু বিধি-নিষেধের নেগ-নেগাচার

কুড়মালি সমাজ জীবনে সামাজিক ব্যক্তি জীবনে সম্পর্ক বিষয়ে, দৈনন্দিন কাজ-কর্মে, চাষবাসে, আসা-যাওয়ায়, দেওয়া-নেওয়ায়, খাওয়া-দাওয়ায়,পশু-পাখী পালনে কিছু কিছু বিধি নিষেধ পালন করতে হয়। পূর্বের আলোচিত অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করার সময় বেশ কিছু আলোচনা করা হয়েছে, অনেক কিছু বাদ পড়ে গেছে। এই অধ্যায়ে তেমনি কিছু বাদ পড়ে যাওয়া বিষয় আলোচনার প্রয়াস করছি। আমার সাধ্যমত যতদূর জানা সেই মত করার চেষ্টা করছি। কুড়মালি সমাজ অনেক বড় অনেক বিস্তৃত। খুঁটিনাটি সব কিছু ধরা যাবে না। আরও অনেক বিষয় থাকবে যেগুলি বাদ পড়ে যাবে। অনুগ্রহ করে সংযোজন করে নেবেন। বাড়তি অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলা হয়ে থাকলে শুধরে নেবেন। পরবর্তীকালে সেইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে প্রকাশ করার বাসনা থাকলো। কৃপা করে যদি আপনার মতামত জানান, তাহলে ধন্য মনে করবো। এখন আসা যাক সর্বক্ষণের জন্য পালনীয় বিধি-নিষেধের কথায়—

(১) সম্পর্ক বিষয়ক — পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে —

(ক) মামার স্ত্রী সম্পর্কে মামশাশুড়ি। তাঁকে ছোঁয়া, হাতে হাতে কোন জিনিস দেওয়া-নেওয়া ভাগিন জামাইয়ের বারণ। এমন কি কোন ঘরের ভিতরে মামশাশুড়ি থাকলে সেই ঘরে ঢোকা পর্যন্ত জামাইয়ের নিষেধ। যদি ভুল ক্রমে কোন প্রকারে ছোঁয়া হয়ে যায় তাহলে উভয়পক্ষকেই স্নান করে নেওয়ার সামাজিক বিধান আছে।

কারণ হিসাবে বলা যায়, এক সময়কাল পর্যন্ত কুড়মালি সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলন ছিল। সমাজে পরিবারে মামশাশুড়ির বেশ প্রভাব ছিল। বাল্য বিবাহের ফলে অনেক সময় পাত্রী সংসার করার মতো পরিণত বয়স হত না। জামাই পরিণত হত। যেহেতু সমাজে মামশাশুড়ির প্রভাব সেইহেতু যাতে করে

কোনরূপ সম্পর্ক গড়ে না উঠতে পারে। পূর্ব পুরুষেরা সেই কারণে সমাজে এই বিধান চালু করেন।

(খ) বউয়ের দিদি ঠাকুরঝি। তাঁকে ছোঁয়া, হাতে হাতে কোন জিনিস দেওয়া-নেওয়া এমনকি ঠাকুরঝি কোন ঘরের ভিতর একা থাকলে বহিন-জামাইয়ের ঢোকা বারণ। মামশাশুড়ির মতই সমাজের পূর্ব-পুরুষদের ভাবনা একই রকম। সেই কারণেই এইরূপ বিধান সমাজে চালু করে গেছেন।

(গ) বউয়ের দাদা বা ভাইয়ের বউয়ের সম্পর্ক দিদি কিম্বা বোনের। তার সাথে দিদি-বোনের মতই ননদসুকে করতে হয়। তাদের সামনে কোন অশালীন কথাবার্তা জামাইয়ের করা চলে না। সম্ভ্রম বজায় রেখে সাবধানে সমূহ আচরণ প্রতিপালন করতে হয়। সুস্থ সামাজিকতা বজায় রাখতেই এই বিধান।

(ঘ) শ্বশুর-শাশুড়িকে বাবা-মায়ের মতোই গুরুজন মনে করা হয়। তাঁদেরকে সমীহ করে চলা জামাইয়ের কর্তব্য। তাঁদেরকে যথোচিত সম্মান করে শ্বশুরবাড়ীতে গেলে এবং বিদায় নিয়ে আসার কালে প্রণাম করার বিধান আছে। এখানেও সুস্থ সমাজ গড়ার কারণ রয়েছে।

(ঙ) বউয়ের সাক্ষাতে স্বামীর তার বাপের বাড়ীর বদনাম ও অসম্মানজনক কথা বলা বারণ। কারণ বউ অনেক সময় না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে, ছেঁড়া কাপড় পরে থাকতে পারে। শ্বশুরবাড়ীর অনেক গাল/অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে পারে, এমনকি স্বামীর মার পর্যন্ত অবলীলায় হজম করে নিতে পারে কিন্তু বাপের বাড়ীর বদনাম সে কখনো সহ্য করতে পারে না। সেই কারণে পরিবার সুখের হবে, কোন ঝামেলা হবে না ভেবে পূর্ব-পুরুষেরা এই বিধান রেখে গেছেন।

(চ) শ্বশুর বাড়ীর গোষ্ঠী-ভায়াদ ও গাঁয়ের অপরাপর পরিবারের সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ বা সম্পর্ক জামাইকে সেই সম্পর্ক জেনে বুঝে শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক বজায় রেখে কথাবার্তায় এবং অন্যান্য আচরণে প্রকাশ করতে হয়। গোটা গ্রামটিকেই শ্বশুরবাড়ী বলে মনে করে জামাইকে চলতে হয়।

(২) নারী বিষয়ক —

(ক) স্বামীর দাদা সম্পর্কে ভাসুর — বুয়াসিন।বুয়াসিন ভাসুরকে সর্বদাই সমীহ করে চলতে হয়। তাকে ছোঁয়া বা হাতে হাতে কোন জিনিস আদান-প্রদান করা চলবে না। যে ঘরে ভাসুর থাকবে সেইঘরে একা কখনো বুয়াসিন প্রবেশ করতে পারে না। তার উপস্থিতিতে বউয়ের কোন হালকা কথা বলা বারণ। হাসি-মস্করা তার সামনে করা চলবে না।

বাল্য বিবাহ কুড়মালি নেগাচারী মানুষের ছিল। অনেক সময় বউ সংসার করার উপযুক্ত/পরিণত হলেও স্বামী পরিণত হত না। সেই কারণে পরিবারের মধ্যে কোন অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠলে পরিবারে অশান্তি ঘটতে পারে। যাতে সে রকম কোন ঘটনা না ঘটে, সেই জন্য ভাবনা-চিন্তা করে পূর্ব-পুরুষেরা এইরকম বিধি সমাজে চালু করেন। কোন অসাবধানতা বশতঃ যদি ভাসুর-বুয়াসিনে ছোঁয়া লেগে যায়, তা হলে উভয়পক্ষকেই স্নান করে নেওয়ার সামাজিক বিধান দেওয়া আছে।

(খ) স্বামীর মামা মামশশুর। তার সঙ্গেও ভাগিন-বউকে ঘরের ভাসুরের মতই আচরণ করতে হয়। অনেক কাল পর্যন্ত কোন কোন পরিবারে মামার প্রভাব ছিল অনেক বেশী। সেই কারণে বুঢ়া-পুরখারা মামশশুরের সঙ্গে ভাগিন বউয়ের এমন আচরণ করে চলার বিধান তৈরী করে দিয়েছেন। ভাসুরের মতই কোন অসতর্ক মুহূর্তে যদি ছোঁয়া লেগে যায়। তাহলে মামশশুর ও ভাগিন বউকে স্নান করার নিয়ম বেঁধে দিয়ে গেছেন।

(গ) ননদ/ঠাকুরঝির স্বামী নন্দসু। তার সঙ্গে সম্পর্ক সদা-সর্বদা ভাই ও দাদার মত। তার সঙ্গে শালকের বউয়ের কোন চটুল আচরণ করা চলবে না। দাদা/ভাইয়ের মতই মান্যতা দিয়ে চলতে হবে। কোনরূপ ভাবেই অন্যথা করা চলবে না। পরিবারের সুস্থতায় এইরূপ বিধান।

(ঘ) শ্বশুর-শাশুড়ি বাবা-মায়ের মতই গুরুজন। সবসময় বউকে তাঁদের সম্মান ও মর্য্যাদা দিয়ে চলতে হয়। বাড়ীর বাইরে কোথাও গেলে, বাড়ীর কোন জিনিস-পত্র অপরকে দিলে তাঁদের অনুমতি নিতে হয়। অন্য কোন গাঁয়ে যেতে হলে তাঁদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে হয়। তাঁদের সম্মান জানিয়ে পরিবারের সৌজন্যতা বজায় রাখতে হয়। এখানেও পরিবারের সুস্থতা বজায় রাখার কারণ রয়েছে।

(ঙ) শ্বশুর-ভাসুর-স্বামীকে ভাত খাওয়ানোর পর বউয়ের ভাত খাওয়ার নিয়ম। সকলের আগে-ভাগে খেয়ে নেওয়া বারণ। এখানেও সৌজন্যবোধ ও পরিবারের সুস্থতা বজায় রাখার কারণ আছে।

(৩) অন্যান্য বিষয়ক —

(ক) দিনের বেলা না হলেও রাত্রির খাবার এক সঙ্গে বসে খাওয়া নিয়ম। আগে ছোট ছেলেমেয়ে তারপর পুরুষ মানুষ ও সর্বশেষে বাড়ীর মা-বউয়েরা একসাথে বসে খাবার খাবেন। এইভাবে চললে যৌথ-পরিবার সুখে-আনন্দে থাকতে পারে।

(খ) পরিবারের কোন বিশেষ কাজে গৃহকর্তার পরিবারের সকল সদস্যকে

ডেকে সলহা করার সামাজিক বিধান। প্রত্যেকের মতামত শোনা, প্রত্যেককে বলার সুযোগ দেওয়া, নীরব থাকলে যাচাই করে নেওয়াই নিয়ম। সকলের মতামত নিয়ে চললে পরিবারে কোন অশান্তি প্রবেশ করতে পারে না।

(গ) পরিবারের সদস্য কম-বেশী সামর্থ অনুসারে আয় উপায় করেন। কম-বেশী যে যা-ই উপার্জন করুন সেই আয়কে এক হাঁড়ির উপার্জন বলে ধরে নিয়ে চলার নিয়ম আছে।

(ঘ) পরিবারের সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে সবাই সমান। যে বেশী আয় করেন তিনি বেশী ভোগ করবেন, যৌথ পরিবারের এমনতর নিয়ম নেই। অন্যথা হলে যৌথ-পরিবার ভেঙে যেতে পারে।

(ঙ) এক অন্নে থেকে কোন সদস্যের আলাদা কোন অর্থ-সম্পদ থাকা অবাঞ্ছিত। যৌথ-পরিবারে একক অর্থ রাখার নিয়ম নেই। আলাদা থাকলে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং অচিরেই যৌথ পরিবার ভেঙে যায়।

(চ) যৌথ পরিবারে বয়সে বড় মেয়ে থাকতে ছোট বয়সের মেয়ের বিবাহ দেওয়ার বিধান নেই। অনুরূপ ভাবে বড় ছেলে থাকতে ছোট ছেলের বিবাহ দেওয়া বারণ। অন্যথা হলে পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকে না।

(ছ) যৌথ পরিবার ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হয়ে গেলে বড় ভাইয়ের অর্থাৎ দাদার জন্য মান্য-মান হিসাবে কিছু জমি সম্পত্তি বাড়তি দেওয়ার বিধান আছে। কারণ হিসাবে বলা যায়, দাদাকে সমাজ-সামাজিকতার কিছু দায়-দায়িত্ব বহন করে চলতে হয়। বাড়তি সম্পত্তি দেওয়াকে 'বড় অংশ' দেওয়া বলা হয়।

(৪) ভাগিনা-ভাগনি বিষয়ক —

অনেক সময়ই ভাগিনা/ভাগনি বয়সে মামাদের চাইতে ছোট হয় কিন্তু মামাদের ভাগিনা/ভাগনিকে বিশেষ মান্যতা দিয়ে চলতে হয়। কারণ হিসাবে বলা যায় সামাজিক ভাবে ভাগিনা/ভাগনিকে বাবা মায়ের শ্রদ্ধা-পূজা ও কাজ-ভোজের পরিচালনার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। দেখে নেওয়া যেতে পারে ভাগিনা/ভাগনিকে কিভাবে দেখা হয়।

(ক) দিদি বা বোনের ছেলে-মেয়েরা সম্পর্কে ভাগিনা/ভাগনি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মামাদের চাইতে ভাগিনা/ভাগনি বয়সে ছোট। বয়সে ছোট হলেও কুড়মালি নেগাচার মতে মামা-মামী কখনো ভাগিনা, ভাগনি ও ভাগিন বউয়ের প্রণাম গ্রহণ করেন না।

কারণ হিসাবে ভাবা হয়ে থাকে যেহেতু বাবা মায়ের শ্রদ্ধা-পূজার কাজ

ভাগিনা পরিচালনা করে। তার নির্দেশ অনুসারে মামাদের চলতে হয় সেই জন্য বয়সে ছোট হলেও তাকে বড় বলে সম্মান করতে হয়।

(খ) ভাগিনা/ভাগনি কখনো মামাদের আপন হয় না। তাদের পর ভাবা হয়। দিদি বা বোনের ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এত কাছের এত আদর-সম্মানের তবু পর ভাবা হয় কি কারণে ? এখানেই একটি সামাজিক গভীর তাৎপর্য আছে। কুড়মালি সামাজিকতায় সম বা একই ঝাড়/গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হয় না। বিবাহ হলে পর মেয়ে বা বউ স্বামীর গোষ্ঠীর পরিচয় পায়। অর্থাৎ তার বংশ বা ঝাড় বদলে যায়। ছেলে-মেয়েরা বাবার গোষ্ঠীর পরিচয় পায়। যেহেতু দিদি/বোনের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তার বংশ/গোষ্ঠী বদলে যায়। তার ছেলে-মেয়েরাও দিদি/বোনের স্বামীর বংশের পরিচয় পায়। সেই কারণে মামা ও ভাগ্নে এক গোষ্ঠীর হয় না। আলাদা বংশের মানুষ হয়। নিজ গোষ্ঠীর লোক আপন অন্য গোষ্ঠীর লোক আপনজন হয় না।

(গ) মা-বাবার শ্রদ্ধা-পূজার কাজ পরিচালনা করার জন্য মামাদের ভাগিনাকে কিছু দিতে হয়। মামাদের এই দেওয়াকে 'ভাগিনা দান' বলা হয়। ভাগিনাকে মান্যমান কিছু না দিলে ভাগিনা মামাদের শ্রদ্ধা-পূজার কাজ পরিচালনা করবে না বলে সামাজিক ভাবে ধরে নেওয়া হয়।

(ঘ) সামাজিক কাজ করার সময় ভাগিনাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ জানাতে হয়। বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ না পেলে ভাগিনা মামার বাড়ীর কাজে আসবে না বলে সামাজিক ভাবে ধরে নেওয়া হয়।

(ঙ) গোষ্ঠী যাই হোক, পাওনা-গণ্ডা দেওয়া-নেওয়া যাই হোক মামা-ভাগিনার সম্পর্ক আত্মীক সম্পর্ক। বড় আদরের ও ভালবাসার সম্পর্ক। গভীর সম্পর্ক তাকে সব চাইতে আপন ভাবা হয়। অন্যান্য আত্মীয়ের চাইতে তাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৫) কৃষি বিষয়ক –

(ক) বাস্তু বাড়ীতে তিল বোনা বা তিলের চাষ করা বারণ। তিলের চাষ বাস্তুভিটায় করলে তার বংশ নাশ হবার সম্ভাবনা।

(খ) নারী জাতির হালের বঁটা ধরা বা লাঙ্গল করা নিষেধ। নারী জাতি লাঙ্গল চালালে তার গর্ভস্থান নষ্ট হয়ে যায়।

(গ) অম্বুবাচী, রথ ও জন্মাষ্টমীর দিন হাল চালানো বারণ। আমাবতী বা অম্বুবাচীর দিন পৃথিবীর জন্মদিন। আবার ঐ দিন বসুন্ধরা ঋতুবতী হয়। রথ ও জন্মাষ্টমী পালন করা হয় কৃষ্ণদেবকে স্মরণ করে। কৃষ্ণ যেহেতু গোপালক

সেই জন্য চাষীরা ঐ কয়দিন হাল বন্ধ করেন।

(ঘ) ধানের পালইয়ে ভেলা ডাল গুঁজে দেওয়া হয়। ভেলা কীটনাশক ও রোগ প্রতিরোধকারী, আবার ভেলা ডাল দিয়ে দিলে কুনজর কোন অশুভ শক্তি ধানের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

(ঙ) ধান ঝাড়ার সময় পাটাতনের নীচে কোন লৌহার টুকরা বা অস্ত্র রেখে দেওয়া হয়। মনে করা হয় লৌহা দিলে কোন অশুভ শক্তি ফসলের শষ্যের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(চ) ধান গাদায় ও ধানের পাড়নে লৌহার টুকরা বা অস্ত্র ফেলে রাখা। কারণ অশুভ শক্তির বিনাশ।

(ছ) ধানের গাদায় ও পাড়নে বেড়ি দেওয়া অর্থাৎ ধান পরিষ্কার করার কুলোর মুখ দিয়ে দাগ কাটা হয়। আবার ধানের উপর ত্রিশূলের দাগ একেঁ দেওয়া হয়। ত্রিশূল বুঢ়াবাবার শিবের প্রতীক। তিনি কৃষির মূল দেবতা, সেই কারণে তার প্রতীক আঁকা হয়। তিনি ফসল রক্ষা করবেন বলে মনে করা হয়।

(জ) খামারে ধান পাড়ন দেওয়ার সময় ধূপবাতি গোবর নাড়ুর উপরে গুঁজে দেওয়া হয়, তা না হলে ধূনা জ্বালানো হয়। ধূপ-ধুনা ও গোবর ফসলের রোগ প্রতিষেধক ও পরিবেশ ভাল করে দেয়।

(ঝ) ধান উমানের সময় (মাপ করা) কোন কথা বলা বা শব্দ করা নিষেধ। কথা বললে বা শব্দ করলে মাপের গণতি ভুল হয়ে যেতে পারে।

(ঞ) নিজের জমিতে বীজ না ফেলে বীজ আগে কাউকে দেওয়া চলে না। কারণ, বীজ কমে গেলে বা বীজ না বার হলে আবার নূতন করে বীজ বপন করতে হয়। কমতি বা দরকার পড়লে নিজেরটি অপরকে দিয়ে আর কেন কোথায় খুঁজবে ?

(ট) চারা নিজের ক্ষেতে না লাগালে অন্যকে চারা দেওয়া নিষেধ। কারণ ঐ একই। বরং আবার মনে করা হয় আগে চারা লোককে দিলে ফসলের শষ্য চলে যায়।

(ঠ) কাড়া-গরুর মাথার হাড় বেগুন বাড়ী, কপি বাড়ীতে কোন দণ্ডের মাথায় রেখে গুঁজে দেওয়া হয়। যাতে করে সকলের নজের পড়ে। কারণ হিসাবে ধরে নেওয়া হয় কোন কুনজর যা অশুভ শক্তি ফসলের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

(৬) গাই-গরু বিষয়ক —

গরু চাষী পরিবারের সব চাইতে গুরুত্বের প্রাণী। অত্যন্ত ভালবাসার

প্রাণী। কুড়মালি নেগাচারী মানুষের কাছে লক্ষ্মীস্বরূপা। গরুকে লক্ষ্মী বলা হয়। সেই কারণে গরুকে নিয়ে অনেক কিছু নেগ-নেগাচার পালন করে থাকেন।

(ক) গাই-গরুর গায়ে পা ছোঁয়ানো যায় না। যদি বা অসাবধানতা বশতঃ পা লেগে থাকে তাকে প্রণাম করা হয়। সহযোগী ও উপকারী হওয়ার জন্য গাই-গরুকে মা-বাবার মত শ্রদ্ধা করা হয়।

(খ) গাইকে হাল জোতা বা লাঙ্গল টানানো বারণ। যদি কেউ গাইকে হাল জোতে তাকে সমাজের হীন গণ্য করা হয়। লাঙ্গল টানা করালে গাই বাচ্চা দেয় না।

(গ) কোন পরিবারে জিতা পূজা না থাকলে জিতা পরবের সময় যদি পরিবারের শিশু কিম্বা গাই বাচ্চা দেয় তাহলে সেই পরিবার/গোষ্ঠীতে জিতা পার্বন নূতন করে আরম্ভ করেন। অপর দিকে যদি কোন মানুষ কিম্বা গরু মারা যায় তাহলে জিতা পরব নষ্ট হয়ে যায়। অতএব দেখা যায়, গাই-গরুকে পরিবারের মানুষের মতই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

(ঘ) গরুর পালে গাই বাচ্চা দিলে, সেই পরিবারের ভাল দিন যাবে অর্থাৎ ধনে-সম্পদে তাঁর বাড়ী পূর্ণ হবে বলে মনে করা হয়।

(ঙ) পালে-মাঠে গাই বাচ্চা দিলে তাকে ঘর আনবার সময় গলায় ভেলা ডাল দিয়ে দেওয়া হয়। ভেলার রোগ প্রতিষেধক ও রোগনাশক ক্ষমতা আছে। মনে করা হয়, কোন কুনজর ও কুপ্রভাব কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(চ) লক্ষ্য রাখা হয়, গাই যেন তার ফুল খেয়ে নিতে না পারে। যদি ফুল খেয়ে ফেলে, তাহলে আর বাচ্চা দেয় না, অসুখ করে, দুধ শুকিয়ে যায়। অনেক সময় মারা যায়।

(ছ) গাইয়ের ফুল উইগাদার গর্তে কিম্বা গোয়ালের কোণায় গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হয়। কারণ হিসাবে ভাবা হয় ফুল কুকুর-বিড়ালে খেয়ে ফেললে গাই আর বাচ্চা দেয় না। দুধ শুকিয়ে যায়।

(জ) গাইয়ের গায়ে তেল-হলুদ ভালোভাবে মাখিয়ে দেওয়া হয়। তেল-হলুদ বাঁটা দিলে গায়ের ব্যথা-বেদনা কমে যায়। পরিষ্কার হয়। মশা-মাছি বসে না। হলুদের অনেক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা থাকে।

(ঝ) গাইয়ের গলায় মানুষের চুলের দড়ি পাকিয়ে ভেলা বীচ ও কড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। ভেলা ও কড়ি রোগনাশক ও রোগ প্রতিষেধক। আবার চুলের দড়ি, কানাকড়ি ও ভেলা বীজ কুনজর ও কুপ্রভাব নষ্ট করে দেয়।

(ঞ) এঁড়ে বাছুরের গায়ে জড়ুল/জঁটা থাকলে তাকে বুঢ়াবাবা শিবের বাহন মনে করে তাকে অনুষ্ঠান করে যাঁড় ছাড়া হয়। ঐ বাছুরের দাবিদার

কখনো আর গৃহকর্তা হতে পারে না। তাকে সাধারণের বলে ধরে নেওয়া হয়।

(ট) গরু বিক্রয় করলে গরুর পাখা দেওয়া হয় না। পাখা দিলে ঘরের লক্ষ্মী চলে যায়। পরিবার অভাবী হয়ে যায়।

(ঠ) গোয়ালে পাকা তাল রাখা হয় না এমন কি খাওয়া হয় না। গোয়ালে তাল পাকা রাখলে গোয়াল নোংরা হয়ে যেতে পারে। ফলে গরুর অনেক রকম রোগ আক্রমণ করতে পারে।

(ড) দুইবেলা গোয়াল পরিষ্কার করে ঝাঁট দিতে হয়। ঝাঁট বেশী বেলা করে দেওয়া যায় না। সকালে যত তাড়াতাড়ি ঝাঁট দেওয়া যায় তত ভালো। তা না হলে গাই-গরু অসন্তুষ্ট হয়। পরিবার ছেড়ে চলে যায়। পরিষ্কার রাখলে কোন রোগ-জ্বালা হয় না।

(ঢ) সন্ধ্যা-সকালে গোয়ালে মাড়ুলি ও ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যা প্রদীপ দিতে হয়। না দিলে পরিবারে অশান্তি হয়। হাভাতে হয়ে যায়।

(ণ) পরিবারের বিশেষ দিনে, সংক্রান্তি, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় গাই-গরু বিক্রয় করা চলে না। করলে পরিবারের অভাব-অনটন বেড়ে যায়।

(ত) গোয়ালে মাছ-মাংস ধোয়া জল ফেলা যায় না। গরু তৃণভোজী নিরামিষি প্রাণী। আমিষের আঁশটে গন্ধ গরু সহ্য করতে পারে না।

(থ) ভাদর মাসে গোয়াল ঘরের দেওয়ালে এবং মেঝেতে মাটি দেওয়া চলে না। ভাদর মাসে মাটি দিলে গরুর বংশ নাশ হওয়ার সম্ভাবনা। গোয়াল এমনিতেই গরুর পেচ্ছাবে প্রায় স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে অবস্থায় থাকে। ভাদর মাসে মাটি বর্ষার কারণে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বেশী মাত্রায় ভিজে অবস্থায় থাকে সেইজন্যই ভিজে মাটি গোয়ালে দেওয়া নিষেধ।

(দ) যে চাষী তামাক সেবন করে না তাকে গরু বিক্রয় করা হয় না। মনে করা হয়, চাষ করার সময় অর্থাৎ লাঙ্গল দেওয়ার সময় চাষে লাঙ্গল বন্ধ করে অনেক সময় তামাক খেয়ে থাকে। তামাক সেবনের সময় বলদও খানিকটা বিশ্রাম নিতে পারে। আর যে চাষী তামাক খায় না তার হাল চালানো বন্ধ করার দরকার পড়ে না। ফলে বলদও বিশ্রাম পায় না। একনাগাড়ে হাল টানতে হয়। জেনে শুনে বিশ্রামহীনকে বলদ বিক্রয় করলে তার বলদের কষ্ট হবে। কত ভালবাসা থাকলে এত ভাবা যায়?

(ধ) গোয়ালে ঝাঁট দেওয়ার পর ঝাঁটা গোয়ালে ফেলে রাখা যায় না। ঝাঁট দেওয়ার সময় ঝাঁটা নোংরা হয়ে যায়। গোয়ালে ফেলে রাখলে পরিষ্কার করা হয় না। ফলে ঝাঁটাও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আবার নোংরা ঝাঁটা গোয়ালে দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে।

(ন) গাইয়ের জন্য নরাত ও একুশা পালন করা হয়। একুশার দিন গরইআ ও বুঢ়াবাবার স্মরণে গাইয়ের দুধের ক্ষীর তৈরী করে দেওয়ার পূর্বে দুধ খাওয়া ও দেব-সেবায় দেওয়া চলে না। ঐ সময়কালে গাইয়ের দুধ গাধড়া (বেশী মাত্রায় ঘন) থাকে মানুষের হজম করার পক্ষে কষ্টকর।

(৭) দেওয়া-নেওয়া বিষয়ক —

(ক) ধানের আগা রাখা, আগা কাউকে না দেওয়া। এক সময়কাল পর্যন্ত চাষীকে মহাজনের কাছে ঋণ নিয়েই সংসার চালাতে হত। ফসলের আগা দিলে আর তেমন কিছু অবশিষ্ট থাকত না। সেই কারণে কিছুটা ঘরে রেখে দেওয়া হত।

(খ) বিটি বিদায় করার পর কাউকে বাড়ীর কিছু না দেওয়া। বিটি বা মেয়ে পরিবারের বড় আদরের বস্তু। শ্বশুর বাড়ীতে মেয়ে যতই সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকুক না কেন তাকে বিদায় করার পর পরিবারের সকলের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এই সময় বা সেইদিন কোন আদান-প্রদান না করাইভাল। ভুল হয়ে যেতে পারে।

(গ) কামারকে আগে ধান দেওয়া; — কামার কৃষকের চাষের যন্ত্রপাতি হাল, ফাল, পাশি, দা দিয়ে থাকেন। কুড়ার, গাঁইট, শাবল, ছাঁনিকাটা ব্যবহারের উপযুক্ত করে দেন। বিনিময়ে বৎসরের শেষে ধান পেয়ে থাকেন। নাপিত, কুমার, ধোপা এদের পাওনা দেওয়ার আগে কামারকে দেওয়া হয়। কারণ অন্যদের পাওনা দিতে না পারলে সামাল করে নিতে পারা যায় কিন্তু কামারের পাওনা না দিলে চাষের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। সেইজন্য আগে ভাগে কামারের পাওনা চাষী পরিশোধ করতে যত্নবান থাকেন।

(ঘ) বীজ পুহ্নার দিন, খামার জিরালির দিন, পরিবারের বিশেষ বিশেষ পালনীয় দিনে বাড়ীর কোন জিনিস অপরকে দেওয়া হয় না। ঐ দিনগুলোতে পরিবারের ব্যস্ততা থাকে ঐ দিকেই বেশী মনোযোগ থাকে। দেওয়া-নেওয়া ভুল হয়ে যেতে পারে।

(ঙ) বাগালকে মাইনা দেওয়ার পর অন্যদের সঙ্গে কোন আদান-প্রদান করা হয় না। বছরের শেষে মাইনা দেওয়া হবে এই চুক্তিতে বাড়ীর কাজ করার জন্য বাগাল (রাখাল) নিয়োগ করা হত। যেদিন বাগালের মাইনা দেওয়া হয় তারপর বাগাল কোন কাজ করে না। গোটা বছর গরু-বাছুর এমনকি চাষের কাজও বাগাল সব কিছুই করে দিত। সেই সামাল করত। একটা অভ্যাস গোটা বছর হয়ে আসছিল। হঠাৎ করে সেই অভ্যাসে ঘাটতি পড়ে। যাবতীয় কাজকর্ম

বাড়ীর লোককেই করে নিতে হয়। অনাভ্যাসের ফলে কাজের ভুল-ত্রুটি হতে থাকে। সেই কারণে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও ভুল হয়ে যেতে পারে। তার চাইতে আদান-প্রদান না করায় ভাল।

(চ) কাটা লাউ কাউকে দেওয়া বারণ। কাটা লাউয়ে সহজেই রোগ বীজানু প্রবেশ করতে পারে। লাউ কাটার পরেই রান্না করতে হয়। ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

(৮) খাওয়া বিষয়ক —

(ক) বাসি মুখে খাবার না খাওয়া। মুখ না ধুইয়ে খেলে দাঁত ও অন্যান্য রোগ দেখা দিতে পারে।

(খ) রাত্রিতে আলো না থাকলে খাবার খাওয়া নিষেধ। আলো না থাকলে খাবারে পোকা ও ময়লা পড়ে যেতে পারে। সেই খাবার খেলে অনেক রকম অসুখ হতে পারে।

(গ) কুকুর-বিড়ালে খাবারে মুখ দিলে সেই খাবার খাওয়া বারণ। কুকুর-বিড়ালের মুখে এক রকম লালা বার হয়। ঐ লালা খাবারে মিশে যায়। তাতে ঐ খাবার খেলে ডিপথেরিয়া রোগ দেখা দেয়। জীবনহানীর আশঙ্কা থাকে।

(ঘ) ভোজবাড়ীতে এক এক সঙ্গে খেতে বসলে সবার পাতায় খাবার না পড়লে খাওয়া বারণ। আগে খাওয়া আরম্ভ করলে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিতে পারে। যার পাতে খাবার পরিবেশন করা হয় না সে অসম্মান বোধ করতে পারে।

(ঙ) বুঢ়াবাবার পূজার ফলারের আগে আম খাওয়া চলে না। তার পূর্বে ফল ছোট ও কচি থাকে। যাতে কচি অবস্থায় নষ্ট ও ক্ষতি না হয় সেই কারণেই এই বিধান চালু করা হয়েছে। ফলারের দিন ছোলা, আম, গুড় খাওয়া হয়। আগে বুঢ়াবাবা ও পূর্ব পুরুষদের ভোগ হিসাবে দেওয়া হয়।

(চ) মনসা পূজায় জুনহার (ভুট্টা) পূজা হিসাবে বলি দেওয়া হয়। সেই কারণে মনসা পূজার আগে জুনহার খাওয়া বারণ। আমের মতোই জুনহার মনসা পূজার আগে পর্যন্ত কচি থাকে। কচি ভুট্টা খাওয়া যায় না। ঘরের ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে করে কচি জুনহার খেয়ে নষ্ট করে না দেয়।

(ছ) (১) রাত্রিবেলা কাল্লা ও অন্যান্য তিতো জিনিস খাওয়া নিষেধ। তিতা খাবার দিনের বেলা খেলে শরীরের পিত্ত নাশ করে। রাত্রিতে খেলে তার উলটো ফল ফলে।

(২) রাত্রিতে টক খাবার না খাওয়া, খেলে অম্বল বেড়ে যায়।

(জ) বীজ পূহ্নার দিন শাক না খাওয়া; ঐ দিন শাক খাওয়া বারণ। শাক খেলে ফসলের ক্ষেতে ঘাস-পাত আগাছা বেশীমাত্রায় জন্মাবে। ফসলের ক্ষতি হবে। শাক খেলে শাকের বীজ ধানের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

(ঝ) রোহিনের দিন রোহিন ফল খেতে হয়। রোহিন ফলের মধ্যে বিষ প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে। সাপ-পোকামাকড়, কীট-পতঙ্গ দংশ করলে বিষ শরীরের কোন তেমন ক্ষতি করতে পারে না।

(ঞ) আমাবতীর সময় দুধ-আম খেতে হয়। এই দিন দুধ-আম খেলে বর্ষাকালীন পেটের অসুখ করে না। রোগ প্রতিষেধকের কাজ করে।

(চ) পিঁড়রা ফলের ভাজা বা তরকারী বৎসরে একবার অন্তত খেলে অসময়ে অসুখে মানুষ মরে না। শরীরে সহ্য করার ক্ষমতা উৎপন্ন হয়।

(ছ) প্রকৃতিজাত সময়ের ফল যেমন ডুমুর, ভেলা, পিয়াল, জাম, কেঁদ, আমলকি, আম খাওয়ার বিধান আছে। প্রকৃতি জাত সময়ের ফল খেলে শরীর পুষ্টিজাত ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। স্বাস্থ্য পুষ্ট হয় সতেজ তরতাজা থাকে।

(জ) পরিবারের কেউ মারা গেলে সেই বৎসর তিল ও তিলজাত খাবার খাওয়া নিষেধ। তিল শরীরের কামবর্দ্ধক ও প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বাড়ীর লোক মারা গেলে মনে একটা শোক থেকেই যায়। শরীরে ও মনে শোকের ভাব থাকলে সন্তান অপরিণত বা বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণে তিল সেবন থেকে বিরত থাকা ভাল।

(ঝ) উনোন থেকে না নামিয়ে কোন খাবার খাওয়া বারণ। উনোনে থাকাকালীন খাবার অধিক মাত্রায় গরম থাকতে পারে কিম্বা ঠিক মত খাবার তৈরী হয় না। ঐরূপ খাবার খেলে শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। অপর দিকে পারিবারিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

(ঞ) খাবার খাওয়ার পর হরিতকি, আমলকি শুকিয়ে মুখ-সুদ্ধি হিসাবে খাওয়ার বিধান আছে। খাবার পর আমলকি, হরিতকি খেলে হজমশক্তি বাড়ে। খাবার ভালভাবে হজম হয়ে শরীরে শক্তিবৃদ্ধি করে। আমলকি ও হরিতকির বিশেষ খাদ্যগুণ আছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে।

(ট) সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ চলাকালীন খাবার খাওয়া বারণ। ঐ সময় প্রকৃতিতে রোগ বীজানুর শক্তি প্রবল হয়। খাবারের সঙ্গে রোগ বীজানু প্রবেশ করতে পারে। ফলে শরীর অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। সেই কারণে এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন।

(ঠ) খাবারে মাছি বা পোকা পড়লে সেই খাবার খাওয়া বারণ। মাছি

অনেক রকম রোগ বীজানুর বাহক। পোকা বিষাক্ত হতে পারে। সেই খাবার খেলে রোগ বীজানু ও বিষ শরীরে প্রবেশ করতে পারে। শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। খাবার শরীরের পুষ্টিসাধন ও ঘাটতিপূরণ করে। যে খাবার শরীরের উলটো কাজ করবে সে খাবার না খাওয়াই বিধেয়।

(ড) লুকিয়ে কোন খাবার খাওয়া বারণ। তাহলে একদিকে যেমন পরিবারের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। অপর দিকে গোপনে খাবার খেলে ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া হয় না। ভালোভাবে চিবিয়ে না খেলে ঠিক মত খাবার হজম হতে পারে না। ফলে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

(ঢ) আধ পোড়া, আধ সেদ্ধ খাওয়া বারণ। ঐ খাবার খেলে অনেক সময় মুখে অরুচি ভাব আসে। অরুচি করে খাবার জোর করে খেলে তা শরীর গ্রহণ করে না। অনেক সময় বমি হয়ে যেতে পারে। ফলে খাবার শরীরের ক্ষতি করে বসে।

(ণ) ভাদর মাসে গুড় ও ফাগুন-চৈত মাসে নিম পাতা খাওয়ার বিধান আছে। ভাদরে গুড় খেলে শরীরের পিত্ত নাশ করে। ফাগুন-চৈত মাসে নিম পাতা খেলে চামড়ার কোন রোগ হয় না।

(ত) প্রত্যহ হলুদ খেলে শরীরের হাড় পুষ্ট হয়। চামড়া মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়। কিন্তু শোকের দিন/সময়ে হলুদ খাওয়া নিষেধ। শোকের সময় হলুদ খেলে বিপরীত ফল হয়। দেখা যায় শোকের সময় হলুদ খেলে গর্ভবতী মা মৃত সন্তান প্রসব করেন।

(থ) শোক পালনের সময় চর্বি ও তেল জাতীয় খাবার খাওয়া বারণ। চর্বি ও তেল হজম করার পক্ষে বেশ শক্ত। শোকের সময় শরীরের হজমশক্তি কমে যায়। সেই কারণে এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

(দ) দুধ খাবার সময় লবণ মেশানো নিষেধ। বলা হয়, তাহলে গাভীর স্তন ফেটে যায়। দুধ এমন খাদ্য যাতে খাদ্যের সব উপাদান ঠিক ঠিক পরিমাণে মজুত থাকে। দুধকে সেই কারণে সুষম খাদ্য বলা হয়। দুধে লবণ/নুন মেশালে দুধের খাদ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বিপরীত ফল হয়। অতএব নুন না মেশানোই ভাল।

(ধ) মাছ-মাংস খাবার পর দুধ সেবন নিষেধ। মাছ ও মাংস আমিষ জাতীয় খাদ্য ও যা সহজে পরিপাক হয় না। দুধও সহজে হজম হয় না। বেশ সময় লেগে যায়। সেই কারণে দুই রকমের গুরুপাক খাবার এক সঙ্গে না গ্রহণ করাই উচিত।

(ন) পোকা খাওয়া ফল খাওয়া বারণ। পোকা খাওয়া ফল অনেক সময়

বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে। ফলে ঐ ফল না খাওয়াই ভাল।

(প) পূজার জন্য ভোগের সামগ্রী পূজার আগে খাওয়া নিষেধ। আগে খেলে দেব/দেবী অসন্তুষ্ট হন। পরিবারের অকল্যাণ হয়। এই কাজ মান্যতা করতে শেখায়। ধৈর্য্য শক্তি বাড়ায়।

(ফ) (১) ধরম ঠাকুরের নামে মানত করা পাঁঠার মাংস পূজায় বলি দেওয়ার পূর্বে খাওয়া নিষেধ। ধরম ঠাকুর সূর্যদেবকে এক দিকে যেমন এতে মান্যতা দিতে শেখায় এবং ত্যাগ করার ক্ষমতা বাড়ায়। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

(২) ভাত খাবার পর চিঁড়ে-মুড়ি-পিঠে খাওয়া নিষেধ। খেলে শরীর তা হজম করতে পারে না। পেট খারাপ হয়ে যায়।

(ব) ঘোলা ডিম ও বাচ্চা থাকা ডিম খাওয়া বারণ। খোলা ডিমে ডিমের কোন খাদ্যগুণ থাকে না। আবার ঐরূপ ডিম থেকে অরুচি হয়ে যেতে পারে। ডিমের ভিতরে বাচ্চা জন্মালে ঐ ডিম খেলে একদিকে যেমন অরুচি হতে পারে অপর দিকে আর্থিক ক্ষতি হয়ে যায়।

(ভ) অঢাকা খাবার খাওয়া নিষেধ। খাবারে ঢাকা না দেওয়া থাকলে অনেক সময় পোকা-মাকড় পড়ে যেতে পারে। নোংরা জিনিস পড়ে যেতে পারে কিম্বা বিষাক্ত পশু খাবারে মুখ দিতে পারে। ফলে খাবার বিষিয়ে যেতে পারে। সেই কারণে সাবধানে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

(ম) ঘরে পায়রা পুষলে বাড়ীর কমপক্ষে একজনকে পায়রার মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়। বাড়ীর পোষা পশুপাখী-নারীদের যত্নশীল হতে শেখায়। একটা আত্মীক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

(য) ঝাড়/বংশের প্রতীক (টোটেম) কুড়মালি নেগাচারের মানুষের কাছে বেশ সম্মানের ও গুরুত্বের। সেই কারণে এক এক গোষ্ঠীর মানুষ তাঁদের কুলপ্রতীক খায় না। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করে থাকেন। কাছিম, হরিণ, খরগোশ, কুচিয়া মাছ, ডুমুর, কুমড়া, কুঁদরি, বন শূকর, তিতির পাখী, ময়ূর, বালিহাঁস, পান ইত্যাদি খায় না।

(র) কম বয়সী ছেলেমেয়েদের মুরগীর চুতিপড়া খাওয়া বারণ। খেলে ছেলেমেয়ে পিলকু/ভীতু হয়ে যায়। মুরগীর পিছনের অংশ অনেক সময় নোংরা লেগে থাকে। সেই কারণে না খেয়ে ফেলে দিতে বলা হয়। অপর দিকে যে কোন মাংসের শরীরের এক একটি অঙ্গ/অংশের মাংস বিভিন্ন রকম কাজ করে।

(ল) ছাগল-ভেড়ার মাথার গেধি/ঘিলু কম বয়সী ছেলেমেয়ের খাওয়া নিষেধ। মাথার ঘিলু/গেধি অধিক গুরুপাক। কম বয়সী ছেলেমেয়ে খেলে হজম

করতে পারে না। পেট খারাপ হয়ে যায়।

(শ) শঁশা/খরগোশ শিকার করতে গেলে এবং শিকার হলে পর মাংস ভাগ করার সময় প্রত্যেককে খেলুপড়ার (খরগোশের লোম, নাড়ি-ভুড়ি এক সাথে মিশিয়ে পোড়ানো) অংশ ভাগের ভাগ খেতে হয়। বলা হয়, না খেলে পরবর্তীকালে শিকারে এলে আর শিকার জুটবে না। কারণ হলো খেলুপড়া শরীরে ঔষধীর কাজ করে। আলুনা, অরুচিকর, বিস্বাদ খেতে হলেও বাধ্য-বাধকতার জন্য এক রকম জোর করেই খেতে হয়।

(৯) পরা বিষয়ক —

(ক) আলতা আধপুরা বা কারবা করে পরা নিষেধ। বলা হয় অশুভ শক্তি শরীরে প্রবেশ করে। আধপুরা/কাবরা রঙ পরা যেমন অসুন্দর দেখায়। তেমনি অমনযোগিতা প্রকাশ পায়।

(খ) হাতে শাঁখা পরলে তার সাথে পলা পরা নিয়ম। শাঁখা অল্প অঘাত পেলেই ভেঙ্গে যায়। পলা পরলে সহজে শাঁখায় আঘাত লাগে না। পলা শাঁখার রক্ষক হিসাবে কাজ করে। তাহলে শাঁখা অনেক দিন পর্যন্ত টিকসই হয়। ফলে বাড়তি খরচের সাশ্রয় হয়।

(গ) অবিবাহিত মেয়ের সিঁদুর পরা নিষেধ। সিঁদুর বিবাহের প্রতীক ও স্বামীর কল্যাণকারী। অবিবাহিত মেয়ের ঐ দুটির প্রয়োজন পড়ে না।

(ঘ) বিধবা নারীর শাঁখা-সিঁদুর পরা বারণ। অবিবাহিত মেয়েদের মতো বিধবারও সিঁদুর পরার কোন প্রয়োজন থাকে না।

(ঙ) সধবা/বিবাহিত নারীদের স্বামীর প্রতীক হাতে লৌহার খাড়ু পরতে হয়। লৌহা শরীরে ধারণ অশুভ শক্তি কোন ক্ষতি করতে পারে না। সামাজিক বিধানকে মান্যতা দেওয়া হয়।

(চ) বিধবা নারীর লৌহার খাড়ু পরা বারণ। স্বামীর মৃত্যুর পর হাতের লৌহা খুলে ফেলে দিতে হয়। পরবর্তীকালে কারো ছোঁয়া সিঁদুর ও লৌহার খাড়ু পরে নিলেই তার সাংঘার বউ হয়ে যায়। আর বিধবা থাকে না।

(১০) কথা বলা বিষয়ক —

(ক) গুরুজনের সামনে উঁচু গলায় কথা বলা নিষেধ। তাতে গুরুস্থানীয় ব্যক্তিকে অবমাননা ও অবজ্ঞা করা হয় বলে ধরে নেওয়া হয়। গুরুজন অপমানিত বোধ করেন।

(খ) বক বক করে কথা বলা বারণ। বকবক করে কথা বললে তাকে ফাজিল বলা হয়। অন্যের কথা ঢাকা পড়ে যায়।

(গ) মিথ্যা কথা বলা নিষেধ। মিথ্যা কথা বললে তাকে মিথুক বলা হয়। সে যদি সত্য কথাও বলে থাকে কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। ফলে সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে।

(ঘ) লাগান-বাঝানের কথা বলা বারণ। তাতে নিজের ও পরিবারের আখেরে ক্ষতি হয়। এমনকি জানাজানি হয়ে গেলে তার সঙ্গে কেউ মিশতে চায় না।

(ঙ) পাঁচজনের সভায় বাড়তি কথা বলা নিষেধ। মেপে কথা বললে সভার লোক তার কথা মনযোগ সহকারে শোনেন। তার কথার গুরুত্ব দেন।

(চ) পরিবারের ও সমাজের সম্পর্ক অনুযায়ী কথাবার্তা বলা বিধেয়। সকল সম্পর্কের লোকের সামনে সব রকম কথা বলা নিষেধ। বাবা-মা ও অন্যান্য গুরুজনের সামনে ভাই-বোনের সামনে চটুল/লঘু কথা বলা যায় না। অপর দিকে দেবর/শালিকাদের সামনে হেসে অনেক সময় চটুল কথা বলা যায়।

(ছ) (১) জোরে কথা বলার মতই গুঁদুর-গাঁদার অস্পষ্ট কথা বলা বারণ। ঐ ভাবে কথা বললে অপরে যেমন তার কথা শুনতে পায় না, কি বলতে চাইছে তা বুঝতে পারে না। ফলে যে শোনে সে অপমানিত বোধ করে। তাকে কূট ও জটিল চরিত্রের লোক বলে ধরে নেওয়া হয়। ফলে সমাজে সে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় দুষ্টলোক মনে করে তার সঙ্গ এড়িয়ে চলে। সেই কারণে বিড়বিড়, গঁদ-গঁদ করে কথা বলা পরিহার করাই কর্তব্য।

(২) পাওনাদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে চটিয়ে কথা বলা বারণ। করলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।

(১১) হাঁটা-চলা বিষয়ক –

কেমন ভাবে মানুষ হাঁটা-চলা করবে সে বিষয়েও পূর্ব-পুরুষগণ বিধি-নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। যেমন –

(ক) গুরুজনের সামনে বুক চিতিয়ে মাথা উঁচিয়ে চলা নিষেধ। তাঁদের সামনে এই ভাবে চললে তাঁরা অসম্মানিত বোধ করবেন। চলে যাওয়া ব্যক্তিকে অহংকারী ও অপিরণামদর্শী ভাবা হয়ে থাকে।

(খ) জোরে পায়ের শব্দ করে চলা বারণ। পায়ে শব্দ করে চলা ব্যক্তিকে দাম্ভিক ভাবা হয়। অতএব চলারসময় দম্ দম্ করে না চলায় বিধেয়।

(গ) দেব/দেবীর থানের উপর চলা নিষেধ। দেব-দেবীর থানের উপর চললে দেব/দেবী কুপিত হন। দেব/দেবী কুপিত হলে ব্যক্তি ও পরিবারের অকল্যাণ হতে পারে। অপর দিকে সামাজিক বিধান না মানলে না মানার প্রবণতা বাড়ে। হামবড়া ভাব জাগে। ফলে সামাজিক ভাবে নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়।

(ঘ) রাত্রি জাগরণ করে পথ চলার সময় এবং অনেক সময়ও পথ চলতে চলতে খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়। এই ভাবে পথ চলা বারণ। ঘুম হালকা না হয়ে অনেক সময় গাঢ় হতে পারে। রাস্তায় ঐ অবস্থায় হোঁচট খেতে পারে। খানা-খন্দে পড়ে যেতে পারে। অন্যের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেতে পারে। অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। চলতে চলতে সেই কারণে না ঘুমানোই উচিত।

(ঙ) পথ চলার সময় গভীর কোন ভাবনা-চিন্তা করে পথ চলা নিষেধ। তাতে পথ ভুল হয়ে যেতে পারে কিম্বা ঘুমিয়ে পথ চলার মতোই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সেই কারণে গভীর বিষয়ে চিন্তা করে পথ চলা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

(চ) পাঁচ লোকের মজলিসের সময় সভার মাঝ দিয়ে হেঁটে যাওয়া বারণ। সভার মাঝখান দিয়ে হেঁটে পার হয়ে গেলে সভার লোক অপমানিত বোধ করেন। পাশ কেটে পার হওয়া দরকার।

(ছ) অকারণে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা নিষেধ। এই ভাবে হাঁটলে অনেক সময় শরীর অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। শিরা-উপশিরায় টান পড়তে পারে।

(জ) অন্ধকারে চলা-ফেরা করা নিষেধ। অন্ধকারে চলা-ফেরা করলে পায়ে আঘাত লাগতে পারে। কোন বিষাক্ত জিনিস পায়ে ফুটে যেতে পারে। বিষাক্ত কীট বা সাপ দংশন করতে পারে।

(ঝ) অন্ধকারে পথ চললে শব্দ করে পথ চলতে হয়। বাধ্য হয়ে অন্ধকারে চলতে হলে শব্দ করলে পথে কোন ক্ষতিকর জন্তু-জানোয়ার, সাপ-খোপ থাকে, শব্দ পেলে রাস্তা থেকে সরে যায়। কোন বিপদ ঘটে না।

(ঞ) গুরুজন ও সম্মানীয় ব্যক্তির সামনে সামনে হাঁটা বারণ। ঐভাবে হাঁটলে তাঁকে হেয় করা হয়। দাঁড়িয়ে তাঁদের আগে যেতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। পথ ছেড়ে দিলে তিনি সম্মানিত বোধ করেন এবং সুফল কামনা করেন।

(ট) অজানা-অচেনা পথে একলা চলা নিষেধ। অজানা অচেনা পথে কখন কি বিপদ ঘটে যেতে পারে। সেই কারণে আগে থেকে সাবধান হলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

(ঠ) নোংরা, অস্থানে, কুস্থানে খালি পায়ে হাঁটা বারণ। হাঁটলে শরীরে রোগ-বীজাণু প্রবেশ করতে পারে।

(ড) দুষ্ট-কুচরিত্রের লোকের সঙ্গে পথ চলা বারণ। সঙ্গে চললে তার চরিত্রের প্রভাব পড়ে যেতে পারে। অপরে তার দোসর বলে মনে করতে পারে। অতএব এড়িয়ে চলাই ভাল।

(ঢ) প্রকৃতির অবস্থা না দেখে-শুনে রাস্তায় বার হওয়া নিষেধ। ঝড়-বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, শিলাবৃষ্টিতে পথে বিপদে পড়তে হয়।

(ণ) প্রখর গরমে দুপুর বেলা পথ চলা বারণ ঐ সময় শরীরে লু লেগে যেতে পারে। অসুস্থ হয়ে পড়তে হয়। তার চাইতে ঐ সময় না হাঁটাই দরকার।

(ত) মাথায় বোঝা ও কাঁধে ভার নিয়ে অসমানভাবে চলা বারণ। ভার/বোঝা নিয়ে চলার সময় ব্যক্তির চলার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে/মাথার দ্রব্যেও সমান গতি লাভ করে। সমভাবে সমান তালে চললে কোন আঘাত লাগে না। গতি পেয়ে হালকা হয়ে যায়। ফলে ভার বহনকারীর কষ্টের লাঘব হয়।

(থ) পথ চলা সঙ্গী দুর্বল ও অসুস্থ বোধ করলে জোরে হেঁটে এগিয়ে যাওয়া নিষেধ। তা নাহলে সঙ্গী অসহায়তা বোধ করবে। হতাশ হয়ে পড়বে। সঙ্গীর সামর্থের মতই তার সঙ্গে চলতে হবে।

(দ) দল-বল সহ হাঁটলে নীরবে পথ চলা বারণ। পরস্পর গল্প করে, গীত বলে চললে পথ কখন শেষ হয়ে যায় বুঝতে পারা যায় না। পথ চলার পরিশ্রম বোধ হয় না।

(ধ) পথ চলার সময় পথে অচেনা নারীকে সঙ্গী হিসাবে নেওয়া নিষেধ। অচেনা নারী পথে কোথায় কি আবদার করে বসে। কোন অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। সেই কারণে পথে অচেনা নারীকে বর্জন করাই বিধেয়।

(ন) বিদেশে-বিভূঁএে লাউয়ের কাঁটা ফুটে। অতএব অজানা জায়গায় চলতে হলে সদাই সতর্ক ও সাবধান হয়েই চলতে হয়। কেননা লাউ লতায় ও ফলে কোন কাঁটা থাকে না। কাঁটা না থাকলে কাঁটা পায়ে ফুটবে কেমন করে? তাৎপর্য অন্য জায়গায়। পূর্ব-পুরুষরা সাবধানে পা ফেলার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

(প) তেমাথা, চৌমাথা, ঘুরাট/বাঁকা পথ না দেখে পার হওয়া নিষেধ। কারণ একটু দাঁড়িয়ে দেখে-বুঝে পার হলে কোন বিপদ ঘটবে না।

(ফ) সোজা পথে কম সময় লাগবে কিন্তু কোন বিপদ ঘটতে পারে। আবার বেশী সময় লাগবে কোন বিপদ-আপদের সম্ভাবনা নেই, আরামে যাওয়া যায় সেই পথে যেতেই বিধান দিয়ে গেছেন।

(১২) উঠা-বসা বিষয়ক —

উঠা-বসা সাধারণ মামুলি ব্যাপার কিন্তু উঠা-বসা বিষয়েও পূর্ব-পুরুষরা নিয়ম-নীতি বেঁধে দিয়ে গেছেন। যেমন —

(ক) এমন জায়গায় বসা বারণ, যেখানে বসলে লোকের অসুবিধা হতে

পারে। বলা আছে, এমন জায়গায় বসবি বেটা যেমন কেউ না বলে উঠ।

(খ) দুষ্ট-বদমাইশ লোকের সঙ্গে উঠা-বসা নিষেধ। সমাজের ঐ রকম চরিত্রের লোকের সঙ্গে উঠা-বসা করলে লোকে খারাপ ধারণা করবে। তার স্বভাবের প্রভাব পড়ে যেতে পারে।

(গ) শিশু ঘুমানো অবস্থায় তার মাথাতলে/মাথার দিকে বসা মানা। তাতে নাকি শিশুর অকল্যাণ হয়। আসল কথা, ঘুমন্ত অবস্থায় মাথার দিকে বসলে শিশুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। কাঁচা ঘুমে উঠে জোর কান্না জুড়ে দিতে পারে। আবার মাথার দিকে বসলে অসাবধানতা বশতঃ শিশুর মাথায় আঘাত লেগে যেতে পারে।

(ঘ) ঢেঁকির মাথায় বসা নিষেধ। মনে করা হয় যে বসে সে হা-ভাতা হয়। ঢেঁকির মাথার দিকে ঢেঁকির গড় থাকে। ঢেঁকির গড় বেশ গর্ত হয়। এবং গর্ত আড়ালে থাকে। গর্তে বিষধর সাপ ও বিষযুক্ত কীট লুকিয়ে থাকতে পারে। ঢেঁকির মাথায় বসলে সে নিজের বিপদ বুঝে পরিত্রাণের জন্য দংশন করতে পারে। সেই কারণে ঢেঁকির মাথায় বসতে বারণ করা হয়েছে।

(ঙ) গুরুজন এলে তাকে দেখার পরও বসে থাকা বারণ। উঠে দাঁড়াতে হয়। বসে থাকলে গুরুজন অপমান ও অগ্রাহ্য করার বোধ জাগতে পারে। তাঁকে অবহেলা করা হচ্ছে বলে ধরে নিতে পারেন। তিনি কল্যাণ কামনা থেকে বিরত থাকতে পারেন। রাগ করে চলেও যেতে পারেন।

(চ) গুরুজনের জন্য বসার নির্দিষ্ট আসন থাকলে সেই আসনে বসা নিষেধ। গুরুজনের আসনে বসলে গুরুজন অপমানিত বোধ করেন। সেই কারণে ঐ আসনে বসা থেকে বিরত থাকাই উচিত।

(ছ) নিজের জন্য বসার নির্দিষ্ট আসন থাকলে সেই আসনে না বসে অপরের নির্দিষ্ট আসনে বসা বারণ। বসলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

(জ) কেউ খাবার খেলে অকারণে তার সামনে বসে থাকা নিষেধ। বলা হয় সেই খাবার হজম হয় না। খাবার ভালো ভাবে চিবিয়ে খেলে ভাল পরিপাক হয়। অন্যথায় হয় না। পাশে কেউ বসে থাকলে কথা বলেত হয়, না হলে কথা শুনেত হয়। কথা বলা ও শোনার সময় অনেক সময় মুখের খাবার ঠিক মত চিবিয়ে খাওয়া হয় না। ভুল হয়ে যায়। সেই কারণে খাবার সময় সামনে না বসাই ভাল।

(ঝ) কেউ কোন কাজ করার সময় তার কাছে বসে গল্প করা বারণ। কাজের সময় গল্প-গুজব করলে কাজে একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। কাজের ক্ষতি হয়।

(ঞ) ঘরের চৌকাঠের উপর বসা নিষেধ। ঘরের দুয়ারের চৌকাঠের উপর বসলে ঘরের ভিতর অন্যের আসা-যাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। অকারণে অসুবিধা করে কোন লাভ নেই।

(ট) দেব/দেবীর পূজার থানের উপর বসা বারণ। থানের উপরে বসলে দেব/দেবীকে অপমান করা হয়। ফলে দেব/দেবী কুপিত হতে পারেন। মান্যতা করার প্রবণতা কমে যায়। ফলে অনেক সময় ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষতি হয়।

(ঠ) সভাস্থলে বার বার ওঠা-বসা করা নিষেধ। তাতে সভার কাজে ব্যাঘাত ঘটে। সভাস্থলের লোক কুপিত হতে পারেন। নিয়মভঙ্গকারী হিসাবে চিহ্নিত হতে হয়। বোধহীন বলে ভাবা হয়।

(ড) অবসরকালীন পাঁচজনের সঙ্গে উঠা-বসা করতে হয়। পাঁচজনের আলাপ-আলোচনা বসে শুনলে অনেক জ্ঞান বাড়ে।

(ঢ) খাবার পর না বসে রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়া বারণ। খাবার পর খানিকটা বসে বিশ্রাম না করে নিলে রাত্রির খাবার পরিপাক হয় না। ফলে শরীর খারাপ হয়ে যায়।

(ণ) খাবার পর বার বার উঠ-বস করা নিষেধ। পেটের খাবার নড়ে যায়। ফলে খাবার ঠিক মত হজম হয় না। হজমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

(ত) গরুর গায়ের উপর বসা নিষেধ। গরুকে দেব/দেবী ভাবা হয়। গরুর গায়ের উপর বসাকে দেব/দেবীর গায়ের উপর বসার সমতুল্য গণ্য করা হয়। গরু বসে থাকার সময় গ্যাজ/জাবর কাটে। গরু তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে নেয়। খাবার চিবিয়ে খেলে শরীর থেকে যে লালা খাবারে মিশে তা হজমে সাহায্য করে। জাবর কাটার সময় লালা খাবারের সঙ্গে মিশে যায়। ঐ সময় গরুর উপর বসলে গরু গ্যাজকাটা বন্ধ করে দেয়। তার হজমের ব্যাঘাত ঘটে।

(থ) নোংরা জায়গায় উঠা-বসা নিষেধ। উঠা-বসা করলে শরীরে রোগ-বীজাণু প্রবেশ করতে পারে। শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে।

(দ) বসে বসে ঘুমানো বারণ। বসে বসে ঘুমালে অনেক সময় পড়ে যেতে পারে। শরীরে আঘাত লাগতে পারে। বসে বসে ঘুমানো অমনযোগিতার লক্ষণ। এমন অভ্যাস করলে অনেক সময় সঠিক কাজ সময়ে সম্পন্ন করা যায় না। শরীর সচল থাকে না। অলসতা রোগে পেয়ে বসে।

(ধ) কোন আসনে না বসে খাবার খাওয়া নিষেধ। আসলে বসে খাবার খেলে আরামে নিশ্চিন্ত মনে খাবার খাওয়া যায়। স্নান, আহার, নিদ্রা আরামের জিনিস। আরাম করে ঐগুলি করলে সুফল পাওয়া যায়। অন্যথা হলে বিপরীত ফল হয়।

(১৩) দেখা-শোনা বিষয়ক —

দেখা-শোনা মিলে কথাটির অর্থ হল পরিচর্চা বা যত্ন করা কিন্তু দেখা ও শোনা পৃথক। কুড়মালি নেগাচারে দেখা ও শোনা বিষয়ে দেখে নেওয়া যাক কি সব নীতি-নিয়ম পালনীয়।

(ক) গর্ভবস্থায় নারীর সাপ দেখা নিষেধ। সাপ দেখলে সন্তান ক্রুর ও খল স্বভাবের হবে বলে ধরে নেওয়া হয়।

(খ) গর্ভবতীর ভয় পাওয়ার মত কোন ঘটনা, ছবি ও মূর্তি দেখা বারণ। ভয় পেলে সন্তান পাণ্ডুর বর্ণ হবে এমন ধরে নেওয়া হয়। ভয় পেলে মায়ের শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। ফলে গর্ভের সন্তানের উপর প্রভাব পড়বে।

(গ) দাঁড়িয়ে কাঠ কাটা দেখা বারণ। কাঠ কাটা দেখলে অনেক সময় কাঠ ছিটকে এসে শরীরে আঘাত লাগতে পারে। ডাক পুরুষের কথায় বলা আছে — বাপ কাটা দেখা ভাল, কাঠ কাটা দেখা ভাল নয়।

(ঘ) সূর্যগ্রহণ খালি চোখে দেখা নিষেধ। চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ চোখের দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হতে পারে। দেখার কৌতূহল থাকলে থালায় হলুদ গোলা জল রেখে সূর্যগ্রহণের প্রতিবিম্ব দেখার বিধান দেওয়া আছে।

(ঙ) গর্ভবতী মায়েদের সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ দেখা বারণ। বলা হয় তাতে তার সন্তান বিকলাঙ্গ হবে।

(চ) ওলের ফুল দেখা নিষেধ। ফুল দেখতে সুন্দর। ফুল দেখলে মন আনন্দে ভরে উঠে।ওলের ফুল বিষাক্ত। সেই কারণে ওলের ফুল দেখা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

(ছ) কারো দিকে ড্যাব-ড্যাব করে দেখা/তাকানো বারণ। ঐভাবে চোখ বড় বড় করে দেখলে লোক কূপিত হয়। সেই কারণে ঐভাবে না তাকানোই দরকার।

(জ) আড় চোখে দেখা নিষেধ। আড় চোখে দেখলে খল ও দুষ্ট মানুষ ভাববে। মনে করবে খারাপ ও ক্ষতি করার ভাবনা আছে।

(ঝ) কোন শিশুর দিকে স্থির চোখে দেখা/তাকানো বারণ। শিশুর মা ভয় করবে ভাববে শিশুর উপর কু-নজর দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে ঐ ভাবে না দেখাই ভাল।

(ঞ) লোকের খাবার সময় বার বার দেখা/তাকানো নিষেধ। মনে করা হবে ঐ খাবারের উপর লোভ আছে। কিম্বা খাবার খাওয়াটা ঠিক মত মেনে নিতে পারছে না। ফলে খাবার খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

(ট) বাবা-মা ও অন্যান্য গুরুজনেদের দোষ দেখা বারণ। তাঁদের দোষ

ধরলে তাঁরা অপমানিত বোধ করতে পারেন। কিম্বা বুঝার ভুল থাকতে পারে।

(ঠ) লুকিয়ে কাউকে দেখা অনুচিত বলে বলা আছে। স্বভাবের দোষ আছে বলে লোকে মনে করবে। আড়াল থেকে দেখলে সে রাগও করতে পারে। কোন খারাপ ভাবনা আছে বলে মনে করতেও পারে।

(ড) দেখে পথ চলা দরকার বলা আছে। দেখে না পথ চললে আঘাত লাগতে পারে। কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতেও পারে।

(ঢ) খাবার সময় দেখে খাবার খাওয়া দরকার বলে বিধান আছে। দেখে না খেলে কোন সময় কি খাওয়া হয়ে যেতে পারে। কোন বিষাক্ত জিনিস খাবারের সঙ্গে মিশে পেটে যেতে পারে। একটু অসতর্কতার ফাঁকে সমূহ বিপদ হয়ে যেতে পারে।

(ণ) ঘরের ভিতরে কে আছে না দেখে ঘরে ঢোকা নিষেধ। তাতে স্বভাব সামাজিক আচরণের ক্ষতি হতে পারে। অবিবেচক, কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাবতে পারে।

(ত) কোন কিছু আদান প্রদানের সময় ভাল ভাবে সাবধানে দেখে নেওয়া উচিত বলে বলা আছে। অন্যথায় ঠকতে হয় কিম্বা গুনাগার দিতে হয়।

(থ) ফসল ও সবজির ক্ষেত দু-বেলা দেখা দরকার। না দেখলে ঠিক মত পরিচর্চা হয় না। ফলে ফসল ভাল হয় না। ডাক পুরুষের কথা আছে;— আলে গেলেই কুটুম নিত ভাঁঅরে চাষ।

(দ) গৃহপালিত পশু-পাখীদের নিয়মিত দেখাশোনা করতে হয়। তা নাহলে না করলে নষ্ট হয়ে যায়।

(ধ) অপরের নিন্দা না শুনা উচিত। শুনলে মন্দ ছাড়া ভাল হয় না।

(ন) গুজবে কান না দেওয়া অর্থাৎ গুজব না শোনাই উচিত।

(প) গুরুজনদের কথা শুনতে হয়।

(ফ) লোকের কথা শুনে বিশ্বাস করে ঠকতে হয়। সেই কারণে লোকের কথা না শোনাই দরকার।

(ব) পাঁচজন দশজনের কথা শুনতে হয়। তাতে ফল ভাল পাওয়া যায়।

(ভ) সংসারে দেখেশুনে চলতে হয়। অন্যথায় পস্তাতে হয়।

(১৪) জাগা ও ঘুমানো বিষয়ক —

জাগা কথার অর্থ সচেতন থাকা। আর ঘুমানোর অর্থ অবচেতন হওয়া। জাগা ও ঘুমানো বিষয়েও পূর্ব-পুরুষগণ কিছু বিধি নিষেধ রেখে গেছেন। যেমন—

(ক) সূর্য উদয়ের পরও ঘুমানো নিষেধ। সূর্য উদয়ের পূর্বেই ঘুম থেকে উঠলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। প্রত্যেক দিনের কাজ যথাসময়ে করা যায়।

(খ) দিনে ঘুমানো নিষেধ। দিনে ঘুমালে শরীর ও মন ভাল থাকে না। পারিবারিক শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক কাজের ক্ষতি হয়।

(গ) অধিক রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকা বারণ। অধিক রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকলে ঠিক মত শরীরের বিশ্রাম হয় না। ভালভাবে রাত্রির খাবার হজম হয় না। ফলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরী হতে পারে। সেই কারণে শরীর ও কাজের উভয়েরই ক্ষতি হয়।

(ঘ) শুয়ে অর্থাৎ ঘুমের জন্য বিছানা গ্রহণের পর জেগে থাকা বারণ। তাতে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। ডাক পুরুষের কথা আছে — শুয়ে জাগে আর খাঞে হাগে সে পুত কনঅ কাজে না লাগে।

(ঙ) পাঁচজনের সভার মাঝে ঘুমানো নিষেধ। তাতে যেমন সভার কাজ ব্যাহত হয়। অপর দিকে সভার আলোচনা শোনা হয় না। সভায় যাওয়া পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। লোকের ঘৃণার পাত্র হতে হয়।

(চ) বসে বসে কিম্বা পথ চলার সময় ঘুমানো নিষেধ। তাতে অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে। ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না।

(ছ) রাস্তার মাঝে ঘুমানো নিষেধ। লোকের চলাচলের অসুবিধা হতে পারে। কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

(জ) চৌকাঠের উপর বিছানা করে ঘুমানো নিষেধ। হয় ঘরের ভিতর কিম্বা ঘরের দুয়ারের বাইরে ঘুমানো যেতে পারে। ঐ অবস্থায় ঘুমালে ঘরের কপাট বন্ধ করা যাবে না। দুষ্টলোক সুযোগ বুঝে ঘরের জিনিস নিয়ে যেতে পারে। অপর দিকে বাড়ীর লোকের যাতায়াতের অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কুকুর-বিড়াল সহজেই ঘরের ভিতর ঢুকে যেতে পারে। অপর কোন জীবজন্তুও ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।

(১৫) ভাব ও ভাবনা বিষয়ক —

বলা হয়েছে, পঞ্চভূতের মিলনে বিশেষ অবস্থায় প্রাণ ও শরীরের সৃষ্টি হয়। শরীরকে মন পরিচালনা করে। মনই দেহের সেনাপতি ও রাজা। মনকে বিবেক ও চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে। মন সদাই চঞ্চল। বিবেক ও চেতনা মনকে সিদ্ধান্ত নিতে, স্থির থাকতে পরামর্শ দেয়। এইসব জটিল প্রক্রিয়ায় মনের ভাব ও ভাবনা তৈরী হয়। আবার বলা হয়েছে, যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। এই ভাব ও ভাবনাই আসল বিষয়। যার যেমন ভাবনা তার তেমন কাজ। এই

ভাব ও ভাবনার গুণেই মানুষ অমরত্ব লাভ করে। অপর দিকে সবংশে ধ্বংস হয়। পিতামাতার শরীর-মনের গুণ নিয়ে সন্তানের জন্ম হয়। সেই কারণে পিতামাতা উভয়কে সচেতন থাকতে হয়। এই বিষয়ে পূর্বপুরুষরা কি বলে গেছেন দেখে নেওয়া যেতে পারে।

(ক) ভাবনা না ভেবে কোন কাজ করা নিষেধ। কাজে হাত দেওয়ার আগে সামনে-পিছনের কথা চিন্তা করে কাজে হাত দেওয়া উচিত। নিজের শক্তি-সামর্থের বাইরের কথা আগাম ভেবে নেওয়া দরকার।

(খ) কোন নেশার জিনিস খাওয়া বারণ। নেশা করলে চেতনা ও বিবেক নষ্ট হয়ে যায়। চেতনা ও বিবেক মনকে নিয়ন্ত্রণ না করলে মন তার ইচ্ছা অনুসারে চলে। নিয়ন্ত্রণহীন মনের ভাব-ভাবনা বেশীর ভাগ সময়েই ভাল হয় না। সেই কারণে কাজও ভাল হয় না। নেশাগ্রস্থ মানুষ সেই কারণেই অসংযত অসামাজিক কাজ করে বসে।

(গ) পরের দ্রব্যের প্রতি লোভ করা নিষেধ। অপরের দ্রব্যের প্রতি লোভ করলে লালসা বাড়ে। না পেলে শরীরে ক্রোধ বাড়ে, ক্রোধ বিবেক ও চেতনাকে অবজ্ঞা করে। লালসা ও ক্রোধের ফলে অবিবেকী হয়, গর্হিত কাজ করে বসে। গর্হিত কাজ করলে তার ফল ভোগ করতে হয়। পরবর্তী চিন্তা-চেতনার অবনতি ঘটে।

(ঘ) অহংকার ও হামবড়ামি ভাব করা নিষেধ। অহংকার ও হামবড়ামি ভাব বিবেক ও চেতনার ক্ষতি করে। মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থের কথা ভুলে যায়। অপর লোককে অবজ্ঞা করে চলে। কোন কিছু সামাজিক নিয়ম-নীতি মানতে চায় না। দিন দিন অসামাজিক হয়ে যায়। অচিরেই সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

(ঙ) সব জান্তা নিজেকে ভাবা অনুচিত। বিশ্ব অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। বিশ্বের এই অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের জ্ঞানসমূহ আয়ত্ব করা অসম্ভব। কোন লোক একাধিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে কিন্তু আরও অনেক জানার বিষয় তার অজানা থেকে যায়। যদি কোন মানুষের ভাব ও ভাবনা হয়ে থাকে যে আমার কিছু জানার-বুঝার অবশিষ্ট নাই। তাহলে তার পক্ষে নূতন জ্ঞান আর লাভ করা হয়ে ওঠে না। বরং অহংকারী হয়ে পড়ে। তার সমূহ ক্ষতি হয়।

(চ) অকৃতজ্ঞ হওয়া নিষেধ। কারো কাছ থেকে কোন উপকার পেলে বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারলে মন প্রফুল্ল হয়। সাহায্যকারী আবার সাহায্য ও উপকার করতে এগিয়ে আসেন। অন্যথায় বিপরীত ফল ঘটে। ভাব ও ভাবনারও অবনতি ঘটে। কুড়মালি নেগাচারে সদা কৃতজ্ঞ থাকতে বলা হয়েছে। উপকারীর পূজা ও গুণগান করতে বিধান দেওয়া হয়েছে।

(ছ) সৌজন্যতা হারিয়ে চলেত নিষেধ করা হয়েছে। গুরুজন ও সম্মানিত ব্যক্তিকে ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। গুণীজনের গুণগান করা। ছোটদের প্রতি স্নেহ-আদর দেওয়ার আচরণ করাকে সৌজন্যতা দেখানো বলে। সৌজন্যতা দেখাতে কোন অর্থ খরচ করতে হয় না। সৌজন্যতা প্রকাশ করতে পারলে নিজের মন, চেতনা, বিবেক আনন্দিত থাকে। ফলে উন্নত ভাব-ভাবনা তৈরী হয়। অপর দিকে অসৌজন্যতা প্রকাশ করলে সকলেই অসম্মানিত বোধ করেন। দুঃখ পেয়ে থাকেন। অনেক সময় বিরূপ হয়ে যান।

(জ) শৃঙ্খলাহীন হতে বারণ করা হয়েছে। শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়লে তার কোন কাজ ঠিক মত হয় না। সমাজের লোকে তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। অনেক সময় অপমানিত হতে হয়। অপমানিত ও অবহেলিত হলে তার ভাব ও ভাবনা ভাল হয় না। বরং ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। অপর দিকে শৃঙ্খলা পরায়ণ ব্যক্তিকে লোকে সমীহ করে। সম্মান ভালবাসা জানায়। সমাজের লোক বিশ্বাস করেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়-দায়িত্ব দেন। তিনিও নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। পরবর্তীকালে তাঁর ভাব ও ভাবনার উন্নতি ঘটে।

(ঝ) অবিশ্বাসী হতে নিষেধ করা হয়েছে। নিজে অবিশ্বাসী হলে অপরকেও অবিশ্বাসী বলে ধারণা হবে। বিশ্বাসঘাতককে কেউ সমাদর করে না। কেউ ভরসা করে না। অবিশ্বাসীর কাজ করলে নিজের চেতনা ও বিবেক দংশন করে। বিবেকের দংশনে তার ভাব-ভাবনায় গণ্ডগোল হয়ে যায়। অনেক সময় স্মৃতি লোপ পর্যন্ত হয়ে যায়। লোকে তাকে পাগল বলে। সামাজিক ঘৃণা সহ্য করতে হয়। অপর দিকে বিশ্বাসী মানুষকে সকলেই সমাদর করে। ভালবেসে যেকোন সম্মানের জায়গায় তার আসন হয়। তার ভাব ও ভাবনা আরও ভাল হয়।

(ঞ) মিথ্যাচার এড়িয়ে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। বাঘ ও রাখাল বালকের গল্পে মিথ্যাবাদী রাখালের কি অবস্থা হয়েছে তা সকলেরই জানা কথা। মিথ্যাবাদী লোক অপর মানুষকেও মিথ্যাবাদী ভাবে। সেও পূর্ণভাবে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। সমাজে সে ঘৃণিত লোক প্রতিপক্ষ হয়। অপর দিকে সত্যবাদী লোককে সকলে বিশ্বাস করেন ভালবাসেন। সম্মান-সমাদর করেন। মিথ্যাবাদীর ভাব-ভাবনাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না কিন্তু সত্যবাদীর ভাব ও ভাবনাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

(ট) লোক ঠকানো থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। ঠকবাজ লোককে কেউ বিশ্বাস করে না। সমাজে সে চিহ্নিত হয়ে যায়। লোক তাকে এড়িয়ে

চলার চেষ্টা করেন। অনেক সময় অপমানিত হতে হয়। লোককে ঠকাতে গিয়ে ডবল গুনাগার গুণতে হয়, নিজেই ঠকে যায়। ঠকবাজের ভাব ও ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটে। ভাবতে হবে, ঠকালে নিজেকেই ঠকতে হবে।

(ঠ) মোহ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। মোহ ও আশক্তি মানুষের ভাব ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বেশী মাত্রায় মোহ থাকলে অনেক সময় দুঃখ পেতে হয়। দুঃখের কারণ হল লোভ ও মোহ। দুঃখ ভোগ করলে ভাব ও ভাবনার অবনতি হয়। সেই কারণেই মোহ ত্যাগ করাই উচিত।

(ড) অলসতা ও কুঁড়েমি পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। সদাই নিজেকে কর্মব্যস্ত ও উৎপাদনশীল হতে বিধান দেওয়া হয়েছে। অলস ব্যক্তি সদাই খারাপ চিন্তা করে। ফলে তার ভাব ও ভাবনা সমাজের ক্ষতিকর হয়। উৎপাদনশীল পরিশ্রমী মানুষের শরীর ও মন তরতাজা থাকে। কোন রোগ-অসুখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুস্থ মন সুস্থ সমাজ গড়তে পারে। তার ভাব ও ভাবনা সবসময় সৃজনশীল হয়ে থাকে। অপর দিকে অলস ব্যক্তির ভাবনা ধ্বংসাত্মক হয়। সেই কারণে অলসতা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

(ঢ) সৎ সাহসী থাকতে বলা হয়েছে। সৎকাজ প্রতিষ্ঠার বাধা সৃষ্টিকারী ও ক্ষতিসাধক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সৎসাহসের সঙ্গে লড়াই-প্রতিবাদ করতে বলা হয়েছে। সৎসাহসী ব্যক্তিই সমাজের দশজনের উপকারে লাগে এমনতর কাজ করে উঠতে পারেন।

(ণ) কুড়মালি নেগাচারে অসামাজিক হতে নিষেধ করা হয়েছে। অসামাজিক হলে গুণবান ব্যক্তি শত গুণের অধিকারী হলেও সেই গুণ কোন কাজের হয় না। বিফলে যায়। সমাজের লোক তার গুণের কদর করে না। লোকে কদর না করলে সে গুণে কি এসে যায় ? অসামাজিক গুণী ব্যক্তির ভাব ও ভাবনা অসামাজিক হয়। তাতে লোকের অপকার ছাড়া কোন উপকারে লাগে না।

(ত) কুড়মালি নেগাচারে বলা হয়েছে — মিতব্যয়ী হতে, স্মিতভাষী হতে, মিত আহারী হতে, মিত ব্যবহারী হতে। প্রয়োজন মত হিসাব করে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। পরিমার্জিত কথা-বার্তা, ব্যবহার করা, সময় ও পরিমাণ মত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা বিষয়ে সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করলে ঠিক হবে, সে কথাও বলে দেওয়া হয়েছে। এইরূপ ভাবে চললে তার ভাব ও ভাবনা উন্নত হবে।

(থ) কৃপণতা করতে বারণ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে কৃপণতা করলে তার দ্বিগুণ ব্যয় হয়। প্রয়োজনে পাঁচ-দশ জনের উপকারে যে কপটি হয়, কোন অর্থ ব্যয় করতে বা দিতে চায় না তাকেই কৃপণ বলা হয়। কৃপণকে

কেউ সমাজের লোক সমাদর করে না। ভালবাসে না। তাহলে কৃপণতা করে অর্থ জমিয়ে তার কি ফল হয় বা কাজে লাগে ? কৃপণ মানুষের ভাব ও ভাবনা তার মত সংকীর্ণ হয়। আখেরে ভালো হয় না।

(দ) স্বভাব-চরিত্র খারাপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে — চরিত্র দোষে হাজার গুণ নাশে। চরিত্রহীনকে কেউ সমাজে স্থান দেয় না। তার মানুষ জনম বৃথা নষ্ট হয়। তাকে কেউ মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না। অমানুষ বলে। সকলে পশুর সঙ্গে যেমন আচরণ করে, চরিত্রহীনের সঙ্গেও তদ্রুপ আচরণ করা হয়। সেই কারণে সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে।

(১৬) মানা-না মানা বিষয়ক —

একটা কথা সমাজে চালু আছে মানলেই শিব, না মানলেই পাথর। দিয়াকে দিয়া না দিয়াকে হুড়কা দিয়া। আমি যদি লোককে মান্যতা দিই লোকেও আমাকে সম্মান করে মান্যতা দেয়। দেখা যাক, মানা না মানা বিষয়ে কি বলা হয়েছে।

(ক) বলা হয়েছে, সমাজ-সামাজিকতা ও তার নেগ-নীতি-নেগাচারকে মেনে চলতে। পূর্ব-পুরুষেরা তাঁদের উত্তরসুরীদের সুখ-সুবিধা ভাল ভাবে সংসার জীবন সুখে, শান্তিতে, আনন্দে চলতে পারে, কোনরূপ অসুবিধা ও ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ে। সেই কারণে সমাজ-সামাজিকতা, নীতি-নিয়ম সমাজে চালু করে দিয়ে গেছেন। সমাজ-সামাজিকতা, নেগ-নীতি মেনে চললে তার সুষ্ট বিকাশ ঘটবে। অন্যথায় তার বিপরীত ফল ঘটবে। এই গুলী পূর্ব-পুরুষ/বুঢ়া-পুরখাদের বহু রকম পরীক্ষা ও জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। এক দিনে হঠাৎ করে এই গুলী তৈরী হয় নাই। অনেককালের অনেক লোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের বিষয়। অবাস্তব, অযোক্তিক, অবৈজ্ঞানিক বিষয় বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেওয়ার বিষয় নহে। মানলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। না মানলে আখেরে পস্তাতে হয়।

(খ) না জেনে না বুঝে অবজ্ঞা করে না মানা অনুচিত। যুক্তি-তর্ক করে না মানার আগে জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। হালকা ভাবে দেখলে হবে না। ভিতরে গভীরে ঢুকতে হবে। ঠিক মত জানলে, অনুধাবন করলে অতি অবশ্যই কারণ বুঝতে পারা যাবে। ভালভাবে দেখলে-বুঝালে না মানার অবকাশ থাকে না। যে জানে না, বুঝে না, সেই বিভ্রান্ত চঞ্চল হয়ে পড়েন।

(গ) নিয়ম-নীতি মেনে চললে, যথা সময়ে যে কোন কাজ সঠিক ভাবে করা যায়। নিয়ম-নীতি না মানলে তার উলটো ফল হয়। আখেরে ক্ষতি হয়।

(ঘ) নেগ-নেগাচার প্রত্যেকটি বিষয় আলাদা-আলাদা। সেইগুলি মেনে ঠিক

ঠিক পালন করলে মনমত সুফল পাওয়া যায়। অন্যথায় পণ্ডশ্রম হয়ে যায়।

(ঙ) চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র সবাই নিয়মের নিগুড়ে বাঁধা। আবহমান কাল ধরে নিয়ম-নীতি মেনে তারা আবর্তন করে চলেছে। নিজের নিজের কাজ করে চলেছে। এক তিল নড়-চড় হওয়ার উপায় নাই। সামান্যতম অনিয়ম হলে প্রলয় ঘটে যাবে।

মানুষেরও তেমনি খাওয়া-পরা, হাঁটা-চলা, উঠা-বসা, লেনা-দেনা, কথা-বার্তা, জাগা-ঘুমা, দেখা-শোনা, নৃত্য-গীত, যোগ-সাধনা, খেলাধূলা, স্নান, বিশ্রাম সবই নিয়ম মেনে করলে সুফল পাওয়া যায়। নিয়ম-নীতি না মেনে করলে বিপরীত ফল অর্থাৎ কুফল পাওয়া যায়। লাভের চাইতে ক্ষতি হয় বেশী।

(১৭) ঝাড়-গোষ্ঠী ও কুলপ্রতীক (Totem) বিষয়ক —

কুল তিলক বা কুল প্রতীক (Totem) বিশ্বাস হল একটি আদিম সংস্কার। পৃথিবীর সমূহ আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও জনজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই আদিম সংস্কার ও বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। কুড়মালি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এই সংস্কার ও বিশ্বাস আদিম কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখনও সমানভাবে মেনে চলেছেন। কুড়মালি নেগাচারী গোষ্ঠীর কুড়মি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একাশি গোষ্ঠী রয়েছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা পৃথক কুলতিলক বা কুলপ্রতীক আছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীই মনে করেন — এই কুলপ্রতীক হল তাঁদের আদি পিতা বা সৃষ্টিকর্তা। কুলপ্রতীককে মান্য করা হয়। তাকে হত্যা করা চলে না। এমনকি খাওয়া নিষেধ। নিজের জীবন দিয়েও কুলপ্রদীপকে রক্ষা করা হয়। রামায়নের বালি সুগ্রীবের লড়াইয়ের গল্পকথায় এক রকম সকলের জানা কথা। বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধকালে রাম আড়াল থেকে তীর ছুঁড়ে হত্যা করেন। সুগ্রীব ও বালি দুইজন সহোদর ভাই। তাঁদের কুলপ্রতীক ছিল ফড়িং এবং গোষ্ঠীর নাম ছিল টিড়ুআর। তাদের চেহারা ছিল একইরকম। বালি দাদা ও অধিক বলশালী। বার বার মার খাওয়ার পর রামের পরামর্শ মত সুগ্রীব গলায় ফড়িংয়ের মালা পরে নেয়। ফড়িংয়ের মালা পরা থাকার কারণে সুগ্রীবকে বালি আর কোন আঘাত করেন নাই। আঘাত করলে তাঁর অসাবধানতা বশতঃ মান্যতার ফড়িংয়ের উপর আঘাত লাগতে পারে। এমনকি মারা যেতেও পারে। শেষ পর্যন্ত তিনি জীবন দিলেন কিন্তু তিনি বংশের কুলপ্রতীক ফড়িংয়ের কোন ক্ষতি থেকে বিরত থেকে গেলেন।

প্রত্যেক গোষ্ঠীর নেগ-নেগাচার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পৃথক দেখা যায়। ঝাড়/বংশের কুলপ্রতীক (Totem) কুড়মি ও কুড়মালি জনগোষ্ঠীর কাছে আসল বিষয়। সেই কারণে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা সাধারণের অবগতির কারণে

করার প্রয়োজন বলে মনে হয়। অতি কথন মনে হতে পারে। আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

প্রত্যেক আদিম জনগোষ্ঠীর কুলপ্রতীক নিয়ে সংস্কার ও বিশ্বাস প্রচলনের নানা রকম কথা ও কাহিনী ছড়িয়ে আছে। কুড়মি জনগোষ্ঠীর কুলপ্রতীক (Totem) বিশ্বাসের সৃষ্টির কাহিনীটি নিম্নরূপ।

অন্যান্য জীবকুলের মতই সাগর-মহাসাগরে মানুষের সৃষ্টি। প্রকৃতির খেয়ালে সুনামির ফলে কিছু মানুষ অন্যান্য জীবের সঙ্গে স্থলদেশে উঠে আসে। প্রতিকূল অবস্থায় প্রায় সকল মানুষেই মারা যায়। মাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী কোন রকমে বেঁচে থাকে। দীর্ঘদিন একা একা থাকার পর দুইজনের সাক্ষাৎ হয়। তারা এক সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করে। প্রাকৃতিক কারণেই তাদের মধ্যে মিলন ঘটে। তাদের মিলনের ফলে সাত পুত্র ও সাত কন্যার জন্ম হয়। সাত পুত্র ও সাত কন্যার মিলনে বেড়ে দাঁড়ায় একাশি সন্তানে। অনেকের মনে ক্রমে লজ্জা ও মানবিক ভাব দেখা দেয়। দলের মধ্যে সব চাইতে যে বুঢ়া। তাকে বলা হত বুঢ়াবাপ। তিনি দলের দলপতি ও পরিচালক। তিনি স্থির করলেন এইভাবে ভাই ও বোনের মধ্যে যৌনতা নিষিদ্ধ হ্ওয়া দরকার। একদিন বুঢ়াবাপ তাদের সন্তান-সন্ততি/বংশধরদের ডেকে আদেশ দিলেন— "তোমাদের প্রত্যেকের পরিচয় পৃথক হওয়া জরুরি। ঝাড়/ গোষ্ঠী/বংশ হবে তোমাদের পরিচয়। এই জন্য কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই তোমরা যে জীবজন্তু, পশু-পাখী, বৃক্ষ-লতা, মাছ-সরীসৃপ, যার প্রথম মুখ দর্শন করবে সেই হবে তার কুলতিক বা কুলপ্রতীক (Totem)। তার নামেই হবে তার বংশধরদের গোষ্ঠীর/ঝাড়ের নাম।"

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে কেউ বৃক্ষ, লতা, পশু, পাখী, জীব, জন্তু, মাছ ও সরীসৃপের দেখা পেল। সেই মত যে যার দেখার কথা বুঢ়াবাবার কাছে জানাল। এইভাবেই ৮১ (একাশি) সন্তানের একাশিটি ভাগ হয়ে গেল। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে/ঝাড়ে ঝাড়ে নানা রকম নিয়ম-সংস্কার, বিধি-নিষেধ, আচার-আচরণ বেঁধে দেওয়া হল। তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিবাহ ও যৌন মিলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হল। এই কাজকে অসামাজিক ও গর্হিত ভাবা হবে। যে লঙ্ঘন করবে, তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মগ্রন্থ বেদ, পুরাণ, মহাকাব্য সমূহে অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, বানর, কিরাত, দাস, দস্যু, পানি, নাগ, তক্ষক, বক, গজ, কচ্ছপ প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। তারা সকলেই কুড়মালি ও অন্যান্য আদিম জন গোষ্ঠীর মানুষ। অত্যন্ত হীন ভাবে আদিম আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের

পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে তাঁদের গোষ্ঠী বা বংশের পরিচয় ও কুলতিলকের প্রতীক কুড়মি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। আসল সত্য ঘটনা উঠে আসবে। বিভক্ত করে দেওয়া দুর্বল হয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ একই হতে সচেষ্ট হবেন। আমি বড়, তুমি ছোট, তুমি অচ্ছুৎ, ঘৃণিত, অস্পৃশ্য এই ঘৃণ্য ভাব দূরীভূত হবে। সত্যিকার সৌভাতৃত্ব গড়ে উঠবে। কেউ কাউকে ঘৃণা করবে না। সব মানুষেই সমান। সবাই প্রকৃতি মায়ের সন্তান। এই চিন্তা-চেতনা দৃঢ়ভাবে জাগরিত হবে। কেউ তাঁদের দলন-শোষন অবজ্ঞা করতে সাহস পাবে না।

এক্ষণে সাধারণের অবগতির জন্য কুড়মি জনগোষ্ঠীর ঝাড়/বংশ পরিচয় ও কুলপ্রতীক সমূহের অর্থাৎ ৮১ (একাশি) ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া তালিকা দেওয়ার প্রচেষ্টা রাখছি। আজও কিন্তু বিভক্ত হয়ে যাওয়া এক একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নাই। সমান ও স্বমহিমায় সৌভাতৃত্ব বজায় রেখে সংসার ধর্ম প্রতিপালন করে চলেছেন। কেবল মাত্র নিজের নিজের বংশধারার মানুষ দূর-দূরান্তে যে যেখানেই বসবার করুন না কেন সবাই নিজেদের একই রক্তের ভাই অর্থাৎ 'ভায়াদ' বলে মেনে চলেন। কুড়মি ব্যতিরেকে অন্যান্য আদিম জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই রকম ধারা লক্ষ্য করা যায়। তাঁরাও নিজ নিজ গোষ্ঠী-ভায়াদকে আপনার আপনজন ভাবেন।

কুড়মি জাতির বংশ/গোষ্ঠীর তালিকা	
বংশ/গোষ্ঠীর নাম	**কুলপ্রতীক (Totem)**
১। কড়োআর বা কাড়ুআর	কাড়া-মহিষ
২। কঁড়রআর	কঁড়র ফল
৩। করকুআর	খাঁখড়া বিছা
৪। কড়িআর	কড়ি
৫। কঁহড়আর	কুমড়া
৬। কাইটুআর	কটাস
৭। কাঁচিআর	কাঁচিডেহরি
৮। কাদিআর	কাদাখেঁচা পাখী
৯। কেঁকড়ুআর	খাঁখড়া
১০। কাটিআর বা কেটিআর	তসর পোকা
১১। কেটরিআর	কঠুয়া

বংশ/গোষ্ঠীর নাম	কুলপ্রতীক (Totem)
১২। কেসরিআর	কেসর ঘাস
১৩। কুঁদরিআর	কুঁদরি ফল
১৪। কুঁড়িআর	কুঁড়ি
১৫। কইরআর	কলা
১৬। খিরুআর	খিরা বা কাঁকুড় ফল
১৭। খেঁখুআর	কুঁড়ি
১৮। খেড়ুআর	খেড় ঘাস
১৯। খেড়হুআর	খেড়হা বা শশা
২০। খেসুআর	একরকম ধান
২১। গুলিআর	ঘঁঘা
২২। গেঁঠিআর	গেঁঠিআলু
২৩। গেরুআর	গেরুপাথর
২৪। ঘঁঘুআর	ঘঁঘা
২৫। চিলুআর	চিল
২৬। চিড়ুআর	কাঠবিড়ালি
২৭। চুটরিআর	চুঁটিয়া (নেংটি ইঁদুর)
২৮। জুঁইআর	জুঁইআ
২৯। জুমরিআর	গেঁড়গেঁড়ালি বা কেন্নো
৩০। জুরুআর	গেজুইর
৩১। জেঁগটিআর	জেঁগটিপোকা
৩২। টিড়ুআর	ফড়িং
৩৩। টেটিআর	টেঁটই পাখী
৩৪। ডঁগুআর	ডঁগি
৩৫। ডুমরিআর	ডুমুর ফল
৩৬। ডুঁগরিআর	উইপোকা
৩৭। তিতরিআর	তিতির পাখী
৩৮। দাগরিআর	দাগ
৩৯। দুরুআর	ব্যাঙ
৪০। ধানুআর	বেঁগা ধান
৪১। নাগ বা নাগুআর	গোখরা সাপ

বংশ/গোষ্ঠীর নাম	কুলপ্রতীক (Totem)
৪২। নাঁগটুআর	বানর
৪৩। নেলুআর	নেউল
৪৪। পুনুড়িআর	কেঁচো
৪৫। পাড়ুরিআর	পাঁড়ুকপাখী/ঘুঘু
৪৬। পুহরিআর	পুইশাক
৪৭। পাকড়ুআর	পাকুড় ফল
৪৮। বঁসরিআর	বাঁশ
৪৯। বনগুআর	বন্য শূকর
৫০। বাঁদুআর	বাঁদুফুল
৫১। বানুআর বা জালবানুআর	মাকড়সা
৫২। বিলুআর	বিড়াল
৫৩। বুঁদিআর	বুঁদি
৫৪। বকুআর	বক পাখী
৫৫। বেমুআর	পিঁপড়ে
৫৬। বেহড়ুআর	বহেড়া ফল
৫৭। বেড়ুআর	বেড় দেওয়া
৫৮। মগুআর	কুমীর
৫৯। মানুআর	হরিণ
৬০। মুতরুআর	মাকড়সা
৬১। মুরমু/মুরমুআর	গাই
৬২। মুসুআর	ইঁদুর
৬৩। লুতিআর	লুথিমাছি
৬৪। লাঠোআর	লাঠা-কাঁড়া
৬৫। শাঁখোআর	শাঁখা
৬৬। সিঁকুআর	সিঁকা নেওয়া
৬৭। সিঁখুআর	চুটকি/চৈতন
৬৮। সিখিআর	ময়ূর
৬৯। সিঁহুআর	সিংহ
৭০। সিঁগুআর	শিংগা
৭১। হঁসতোআর	কাছিম

বংশ/গোষ্ঠীর নাম	কুলপ্রতীক (Totem)
৭২। হাঁসদা	জংলি হাংস
৭৩। হাঁসদাগিআর	বালিহাঁস
৭৪। হেঁসরিআর	পানপাতা
৭৫। হিঁদইআর	কুচিয়া মাছ
৭৬। উখরিআর	উকুন পোকা
৭৭। উঁধিআর	উঁধিপিঠা
৭৮। পাকড়ুআর	লাকড়া/নেকড়ে
৭৯। কাছুআর	কাছিম
৮০। বাসাগিআর	সিকরা/বাজ পাখী
৮১। বাঘবানুআর	বাঘ

এবার দেখে নেওয়া যেতে পারে, গোষ্ঠীর বা কুলপ্রতীক বিষয়ে কি কি পালনীয়।

(১) কুড়মালি নেগাচারে কঠোর ভাবে পালন করা হয় যে, একই ঝাড় বা গোষ্ঠীর মধ্যে কোন বিবাহ সম্বন্ধ চলে না। যৌন মিলন একই বংশের মধ্যে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হলে একই রকম রক্তের হয়। ফলে বিভিন্ন দুরারোগ্য অসুখ ছেলেমেয়েদের হতে পারে। বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করে।

(২) কুলপ্রতীক পশু-পাখীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। তাদের হত্যা করা হয় না। মাংস খায় না। প্রত্যেক গোষ্ঠীর লোকেই এই বিধান মেনে চলে।

(৩) কাছিম কুলপ্রতীক যাঁদের যেমন কাছুআর, হঁসতুআর জনগোষ্ঠীর মানুষ ক্ষেতে বা যেকোন জায়গায় কাছিম দেখতে পেলে কাছিমকে তেল-সিঁদুর দিয়ে নদী বা বড় কোন জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

(৪) গোষ্ঠী বা ভায়াদ কোন লোক মারা গেলে শোক পালন করতে হয়। অনেক সময় এক সাথে ঘাটে উঠতে হয় বা শোক মিছিলে অংশ নিতে হয়। তারাই ঘাটে উঠে যারা পুত্র ও কন্যা সংস্পর্কীয় হয়।

(৫) ভায়াদ বা বংশের কেউ মারা গেলে ঘরের ব্যবহৃত মাটির হাঁড়ি-কড়াই ফেলে দিতে হয়।

(৬) ঝাড় বা গোষ্ঠীর মধ্যে কোন ছেলে/মেয়ের জনম হলে অন্ততঃ তিন দিন চাষের বীজ বপন বা চারা লাগার কাজ বন্ধ রাখা হয়।

(৭) ধরম পূজা বা সূর্যাহি পূজায় সামিল হতে হয়। নেগনেগাচার পালন করতে হয়। পাঁতা বা আখড়া পূজায় দূর-দূরান্তের বঁস ভায়াদকে অংশ নিতে আসতে হয়।

(৮) চিড়ুআর গোষ্ঠীর মানুষ জিতিয়া পূজার অনুষ্ঠান করেন না। করলে বিভিন্ন রকম বিঘ্ন বা অসুবিধা দেখা দেয়।

(৯) জালবানুআর গোষ্ঠীর ধরম পূজায় মাথা মুণ্ডনের সময় মাথায় চুটকি রাখতে হয়। কান ফোড়াতে হয়।

(১০) পুনুড়িআর গোষ্ঠীর মানুষের ঘরের চালের উপর চিল বসলে গৃহকর্তাকে পাঁচ ঘরে চাল ভিক্ষা করতে হয়। ঐ চাল কোন গরীব লোককে দিয়ে দিতে হয়।

(১১) শাঁখোআর ঝাড়ের স্ত্রীদের শাঁখা পরা চলে না। পরলে ঘরের অমঙ্গল হয়। পরিবারে অনেক রকম বিপদ হয়।

(১২) এক এক গোষ্ঠীর বঁস দাগ আলাদা আলাদা। গরু, বিশেষ করে আঁড়্যাগরুকে দাগা হয়। কোন গোষ্ঠী তার গরুর বাছায়, পিছনের পায়ে, সামনের পায়ে, গালে কিম্বা শরীরের বিশেষ কোন জায়গায় গোষ্ঠীচিহ্ন বা বংশ দাগ কেটে দেওয়া হয়। কোন গোষ্ঠীর দাগ তিরধনুক, কারো গাড়ীর চাকা, ঢেরা, হাল, দা, বাঁহুক, শূন্য বা গোলাকার, অর্ধবৃত্ত, এক দাঁড়ি, দুই দাঁড়ি, তিন দাঁড়ি, চাঁদ, মৈ ইত্যাদি ইত্যাদি।

(১৩) ডুমরিআর গোষ্ঠীর লোক ডুমুর খায় না। কঁহড়আর গোষ্ঠী কুমড়া, পুহরিআর পুইশাক, খিরুআর খিরা, কইরআর কলা খায় না, কুঁদরিআর গোষ্ঠীর মানুষ কুঁদরি খায় না।

(১৪) বঁসরিআর জনগোষ্ঠীর মানুষ বাঁশের বাঁশী বাজায় না। বাঁশের বাঁশী তাঁদের বাজানো নিষেধ।

(১৫) বসতবাড়ীর সীমানার মধ্যে যদি কোন প্রকারে কুলপ্রতীক মারা যায় তার জন্য নেগাচার পালন করা হয়। নাগ বা নাগুআর গোষ্ঠীর পরিবারের সীমানায় যদি গোখরা সাপ মারা যায়, তাকে দাহ করতে হয়। একদিন উপবাস করতে হয়। মাটির ব্যবহৃত হাঁড়ি কড়াই ফেলে দিতে হয়। কামা-সিনান করতে হয়।

১৮। বিবিধ বিষয়ক —

সংসার জীবনে মানুষের নানা রকম কাজ বা আচরণ করে চলতে হয়।

খুঁটি-নাটি সবগুলিকেই ছকে ফেলা দূরহ কাজ। বাঁধা-ধরা এক সারিতে আনা যায় না। সেই রকম কিছু নেগ-নেগাচারের আলোচনায় প্রয়াস রাখছি। কুড়মালি জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা অধিক। তাঁদের বসবাসও বিস্তৃতি এলাকা জুড়ে। স্থান বিশেষে নেগ-নেগাচার কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সেই কারণে সব আলোচনা ধরা বেশ মুশকিল ব্যাপার। আসা যাক আলোচনায়;—

(ক) ধান-চাল ও ভাতকে কুড়মালি নেগাচারে লক্ষ্মী বলা হয়। ধান, চাল ও ভাত মাটিতে ছড়া থাকলে তার উপর দিয়ে চলা-ফেরা করা নিষেধ। চলা-ফেরা করলে লক্ষ্মীকে অগ্রাহ্য করা হয়। লক্ষ্মীছাড়া হয়ে হাভাতে হতে হয়।

(খ) ধান-চাল ও ভাতের উপর চলা-ফেরা যেমন নিষেধ, তেমনি থুথু ফেলাও বারণ। থুথু ফেললে লক্ষ্মীকে অবজ্ঞা করা হয়। হাভাতে হতে হয়।

(গ) রাত্রিবেলা কাউকে বাড়ীর ধান দেওয়া নিষেধ। ধান দিলে ঘর থেকে লক্ষ্মী চলে যায়।

(ঘ) রাত্রিতে ঝাঁট দিয়ে ময়লা-আবর্জনা ফেলা বারণ। কোন অসতর্ক মুহূর্তে ঘরের দরকারী মূল্যবান জিনিস আবর্জনার সঙ্গে চলে যেতে পারে।

(ঙ) একাধিক ঝাঁটা এক সঙ্গে রাখা মানা। এক সঙ্গে ঝাঁটা পাশাপাশি রাখলে বাড়ীতে ঝগড়া-ঝাঁটি হতে পারে। আসল কারণ এক সঙ্গে ঝাঁটা বেশী রাখলে ঝাঁটা বেশী নষ্ট হয়ে যায়।

(চ) ভাঙা বা ক্ষয়ে যাওয়া হাল-জোঁয়াল পড়ানো নিষেধ। হাল-জোঁয়াল বুঢ়াবাবা শিবের জিনিস মনে করা হয়। জোঁয়ালের মাঝখানে বুঢ়াবাবার প্রতীক চিহ্ন ত্রিশূল আঁকা থাকে। পোড়ালে চাষীর একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হাল-জোঁয়ালকে অসমাদর করা মনে করা হয়। বাঁদনা পরবে হাল-জোঁয়ালকে গুঁড়ি-সিঁদুর দেওয়া হয়। ধানের মোড় পরানো হয় এবং ধূপ-দীপ জ্বেলে ধান-দূর্বা দিয়ে সম্মান জানিয়ে চুমানো হয়। পূজা করা হয়। সেই পূজার জিনিসকে পোড়ালে অকল্যাণ হয়। মনে ব্যথা লাগে।

(ছ) ধর্মের মানত করা পাঁঠা ধরম পূজায় বলি দেওয়ার পূর্বে খাওয়া নিষেধ। খেলে ধরম ঠাকুর সূর্য্যদেবকে অমান্য করা হয়। তার সাথে অবিশ্বাসের কাজ করা হয়।

(জ) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় মাথা বা চুল না আঁচড়ানো এক নেগ। ঐ সময় সূর্যদেবকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য প্রতিটি কুড়মালি নেগাচারী পরিবারে সনঝা-প্রদীপ জ্বালিয়ে সূর্যদেবকে প্রণাম করার নিয়ম। ঐ সময় যদি চুল আঁচড়ানো হয় তাতে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিতে দেরী হতে পারে। অনিয়ম হতে পারে। সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে রাত্রির কাজ ও সকালে মাড়ুলি দিয়ে দিনের কাজ

আরম্ভ করা হয়ে থাকে। অনিয়ম করলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। অমান্য করার প্রবণতার রোগ গ্রাস করতে পারে।

(ঝ) সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিকালে খাটিয়ায় বসে পা দোলানো নিষেধ। পা দোলানো দেখে কোন সাপ ও কীট দংশন করতে পারে। পা দোলালে অমনযোগী রোগ শরীরে প্রবেশ করে।

(ঞ) ছাঁছাকলে বসা বারণ। বলা হয় পুনিলাগা রোগ হয়। আসল কারণ ঘরের চালের উপর থেকে কোন জিনিস পড়তে পারে। কোন ভারি জিনিস পড়লে আঘাত লাগতে পারে। সেই কারণে ছাঁছাকলে বসা নিষেধ করা হয়েছে।

(ট) পূজা বা শুভকাজে কালো কাপড় এমনকি কালো পেড়ে শাড়ি-ধুতি পরা বারণ। কুড়মালি নেগাচারে সাদা রঙকে স্বাত্ত্বিক, লাল রঙকে রজ বা উপাদনশীল এবং কালো রঙকে ধ্বংস বা মরণের রঙ মনে করা হয়। সেই কারণে কোন শুভ কাজে লাল রঙ ব্যবহারের চল চালু করা হয়েছে। কালো রঙ যেহেতু ধ্বংস ক্ষতি ও মরণের রঙ বলা হয়েছে, সেই কারণে কালো রঙ কোন শুভ কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

যেহেতু কালো রঙ অশুভ সেই কারণে মন্ত্র লিখার সময় লাল কালিতে লেখা হয়ে থাকে। কালো কালিতে লিখতে বারণ বা নিষেধ করা হয়েছে।

(ঠ) তেল মাখার সময় তিনবার পূর্ব-পুরুষদের স্মরণে ছিটিয়ে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই ভাবে তেল ছিটিয়ে দিলে পূর্ব-পুরুষ অর্থাৎ পিঢ়িপুরুষ ও পিড়হি জননীদের স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানানো হয়ে থাকে।

(ড) গাঁয়ের গ্রাম্য দেব/দেবীর থানের গাছ কাটা ও পোড়ানো নিষেধ। পোড়ালে বা কাটলে দেব/দেবীদের অসম্মান করা ও অবজ্ঞা করা হয়ে থাকে। দেব/দেবীদের থানে গাছ না কাটলে গাছ রক্ষা হয়। গ্রামের চারদিকে অনেক দেব/দেবীর থান থাকে। ধ্বংসকারী মানুষ অন্যান্য গাছ কেটে শেষ করে দিতে পারে। গাছ না থাকলে পরিবেশ ও আবহাওয়া দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে রোগ-অসুখ বাড়ে। গ্রাম্য দেব/দেবীর থানের গাছও যদি অক্ষত থাকে তাহলে অন্ততঃ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা পাবে। জীবজগৎ বাঁচবে। লক্ষ্য করার বিষয় এইরূপ বিধি-নিষেধ আছে বলেই গ্রাম্য দেব/দেবীর থানে এখনও প্রাচীন অনেক বৃক্ষ শোভা বর্দ্ধন করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক বৃক্ষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ডালে গোড়ায় গর্ত হয়ে গেছে। সেই গর্তের ভিতর নিশ্চিন্তে অনেক পশু-পাখী-সরীসৃপ বাসা বেঁধে বসবাস করে বংশ বিস্তার করতে পারে। বিশেষ করে পুরানো বিষধর সাপ ঐ গর্তে আশ্রয় নেয়। বৃক্ষগুলি ঘন ও উঁচু হয়ে ডালপালা মেলে। হারিয়ে যেতে বসেছে এমন পাখী ঐ গাছের ডালে বাসা বেঁধে বংশ

রক্ষা করতে পারে। ছায়া-ফল, বিশুদ্ধ বায়ু দান করে মনে করা হয় দেবতার আশ্রয় স্থল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নিজেই সশরীরে দৃশ্যমান দেব/দেবী হয়ে সদাই স্নেহ-ভালবাসা-আদর, আশীর্বাদ দিতে দিতে ধ্যানমগ্ন হয়ে অচঞ্চল ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই কারণেই আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা তাকেও বাঁচিয়ে রাখার নিদান প্রচ্ছন্ন ভাবে দিয়ে রেখে গেছেন।

(ঢ)(ক) রাত্রিকালে খাটের পুঁথাড় টানা নিষেধ। খাটের পুঁথাড়ের দড়ি টানবার দরকার পড়ে তখনই যখন খাটের গায়ের দড়ি ঝংলা (নাচ দিকে ঝুলে পড়ে) হয়ে যায়। ঘুমানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। এই কাণ্ড তখনই হয় যখন খাট অনেক দিন ব্যবহার করা হয়। পুরাতন হয়ে যায়। পুরাতন খাটের কাঠ কোন জায়গায় দুর্বল হয়ে পড়তে পারে সহজে নজরে আসে না। খাটের পুঁথাড়ের দড়িতে টান পড়লে ঐ জায়গা ভেঙে যেতে পারে। কাঠের কোন জায়গা ভেঙে গেলে খাট অকেজো হয়ে পড়ে। আর সেই খাট ব্যবহার করা চলে না। দিনের বেলা হলে ঐ কাঠ বদলে নূতন কাঠ লাগানো যায়। লাগাবো বললেই তো হয় না, তাকে বাঁসলা-বাটালি দিয়ে ছেঁছে-ছুলে ব্যবহারের উপযুক্ত করে নিতে হয়। তার জন্য দক্ষ লোকের দরকার পড়ে। আনাড়ি হলে ব্যবহার যোগ্য করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যে সময় আয়াস করে ঘুমাবার কথা, অত হ্যাপা করা কি সম্ভব? তার জন্য সময়েরও প্রয়োজন। এমনি এমনি মন্ত্র পড়ে তো আর করা যাবে না। পুঁথাড় ঢিলা ছিল, খাট হজলা ছিল, অন্ততঃপক্ষে ঘুমানোর কাজ চলতেছিল। ভাল করতে গিয়ে রাতের ঘুম নষ্ট হবার জোগাড়। সেই কারণে রাতের বেলা পুঁথাড়ের দড়ি টানা বারণ করা হয়েছে।

(ঢ)(খ) বাড়ীর কেউ কোন গ্রামে যাওয়ার জন্য ঘরের থেকে রাস্তায় বের হয়ে গেলে পর তাকে পিছন দিক থেকে ডাকা নিষেধ। তাহলে অযাত্রা হয় বলা হয়েছে। আসল কারণ হল, মানুষ অন্য গ্রামে যায় কেন বিশেষ কিছু দরকারী প্রয়োজনে। বিশেষ না হলেও অবশ্যই কোন প্রয়োজনে। সেই সময় তার মাথায় থাকে সেই প্রয়োজনের কথা। কোথায় কি ভাবে বলেল কাজ ফলবতী হবে সেই ভাবনায় ঘুরপাক খেতে থাকে। পিছন থেকে ডাকার অর্থই হল যেকোন কারণে। কোন কাজে। অকারণে কেউ কাউকে ডাকে না। ডাক শুনে ঘর ঘুরে এসে কিম্বা দাঁড়িয়ে কথা শোনে। শোনার পর মনে হতে পারে আগাম এই কাজটাই সমাধা করা বেশী প্রয়োজন। গাঁ যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। যেকোন লোকের অপর গাঁয়ে গেলে একটা প্রস্তুতির দরকার পড়ে। তাহলে অন্য গাঁয়ে যাওয়ার জন্য যে সময়টুকু খরচ করা হয়েছিল তার লোকসান হল। অন্য আরো ক্ষতি হতেই পারে। আবার শোনার পর দু-টানায় পড়ে পথ চলতে চলতে

অনেক সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে। আগের থেকে সাজানো পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটবে। তাতে কোন কাজেই ঠিক মত হবে না।

(ণ) আঁগারে (কাঠ কয়লায়) ঘরের মেঝেতে আঁকা-ঝোঁকা করা বারণ। বলা হয়ে থাকে, তাতে তার পরমায়ু কমে যায় অর্থাৎ তাড়াতাড়ি মারা যায়। মরণের ভয় কার না আছে ? আসল কথা হল, আঁগারে মেঝেতে আঁকা-ঝোঁকা করলে মেঝে নোংরা হয়ে যায়। দেখতে খারাপ লাগে। ঐ কথা বললে কেউ মানতে নাও পারে।

(ত) সিঝা ধান কাউকে দেওয়া নিষেধ। প্রয়োজন হলে চাল দেওয়া যায়। ধান দেওয়া যায়। সিদ্ধকরা ধান বিক্রয় করা যায় না। কাউকে শোধ দেওয়াও যায় না। যে প্রয়োজনেই নিক না কেন তার নেওয়ার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কোন কাজে লাগে না। অবশ্যই ঐ ধান পরিমাণ মত শুকনো করে চাল করা যায়। তার জন্যও বেশ সময়ের প্রয়োজন। ধানের বদলে ধান দিয়ে ঋণ শোধ করতে হলে এমনি অসিদ্ধ ধান দেওয়া যেতে পারে। ধানের বদলে ধান দিতে গেলে সিদ্ধ ধান দিলে ধান পরিষ্কার করে তা ভেজানো, তারপর আগুন জ্বেলে সিদ্ধ করা অনেক বাড়তি খাটনি। তা হলে এই যে বাড়তি কায়িক শ্রম তার কোন মূল্য পাওয়া যায় না।

(থ) ঘুমন্ত শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া নিষেধ। তাতে শিশুর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। একবার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে কান্না জুড়ে দিতে পারে। তার চাইতে ঘুমানো শিশুকে না সরানোই ভাল। শিশুর শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। যদি সরাতেই হয়, তাকে জাগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

(দ) বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম্ব কিম্বা বন্ধু-বান্ধব আপনজন এলে জল ঘটি দেওয়ার বিধান আছে। জলের ঘটির জলে হাত-মুখ-পা ধুয়ে তিনি বাড়ীতে বসবেন। বয়স্ক মানুষ হলে তার পা ধুইয়ে দেওয়ার কথা বলা আছে। তারপর তাকে প্রণাম করার বিধান দেওয়া আছে।

কুড়মালি নেগাচার ইঙ্গিতবাহী নেগাচার। মুখে কিছু না বলে ইঙ্গিতে বলা আছে। এই নেগাচারে মানুষ সবই বুঝে নিতেও পারেন। কোন অসুবিধা হয় না। বাইরের লোক কেউ বাড়ীতে এলে রাস্তায় তার গায়ে বিশেষ করে পা-হাত-মুখে রোগ বীজাণু লেগে থাকতে পারে। ইঙ্গিতে বলা আছে আগে তুমি হাত-পা-মুখ জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ হয়ে ভিতর ঘরে প্রবেশ কর।

যাঁরা অতি উন্নত ও অতি সভ্য বলে গর্ব ও অহংকার বোধ করেন তাঁদের সমাজে কিন্তু এই রকম কোন সামাজিক নেগাচার নেই। আদিবাসী সমাজে চল

আছে। পৃথিবীর মানব সভ্যতায় সংকট করোনা-২০১৯ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আদিবাসী সমাজনীতি প্রণয়নকারীগণ কত বড় বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ? এত বড় সমাজ বিজ্ঞানী না হলে এত সহজে এত প্রয়োজনীয় বিষয়টি ইঙ্গিতে বলতে পেরেছিলেন কিভাবে?

আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়ীতে এলে জলঘটি নিয়ে আপ্যায়ন না করলে অপমানিত বোধ করেন। অনেকে অন্যের দেখা দেখি ময়ূর সাজতে গিয়ে এই নেগাচারটুকু প্রতিপালন না করে গর্ববোধ করেন।

কুড়মালি নেগ-নেগাচারে ইঙ্গিতে কেউ বাড়ীতে এলে যেমন জলপূর্ণ-ঘটি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। সেই জলে হাত-পা ধুতে বলা হয়েছে। তারপর জল দিলে সেই জলে কেউ হাত-পা ধোবেন না, পান করেন। এই জল পান করতে বলা হয়েছে। তারপর জলঘটি দিলে খেতে বসার জন্য এবং খাওয়ার পর জলঘটি দিয়ে হাত-মুখ ধুতে এবং তারপর জলঘটি দিয়ে জলপান করার কথা ইঙ্গিতেই বলে দেওয়া হয়।

(ধ) ভাত খেতে বসার পর থুথু ফেলা নিষেধ। পরিবেশ নোংরা হয়ে যাবে। রোগ বীজাণু ছড়াবে। নিজের তো হবেই অন্যদের খাবারে অরুচি ভাব আসবে। অরুচি ভাবে খেলে খাবার ঠিকমতো হজম হবে না। ভাতকে লক্ষ্মী ভাবা হয়। ভাত খেতে খেতে থুথু ফেললে লক্ষ্মীকে অবজ্ঞা করা হবে। ফলে হাভাতে হবে।

(ন) দেব/দেবীর থানে থুথু ফেলা নিষেধ। বলা হয়, দেব-দেবীর থানে থুথু ফেললে দেব/দেবীর থানে অনেক লোকের যাতায়াত হয়। ফলে রোগ বীজাণু ছড়াতে পারে।

(প) কাউকে দেখে অকারণে থুথু ফেলা বারণ। থুথু ফেলাকে অবজ্ঞা করার সঙ্কেত ভাবা হয়। সেই কারণে কাউকে দেখে থুথু ফেলা অনুচিত। তাতে সেই ব্যক্তি অপমানিত বোধ করেন।

১৯। ঋতুবতী রমণীর নেগ-নীতি-নেগাচার পালন বিষয়ক —

আমরা সকলেই জানি ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) দিনে এবং ১২ (বারো) মাসে এক বছর হয়। ডাকপুরুষের কথায় আছে;— ১২ (বারো) মাসে ১৩ (তেরো) পার্বণ। কথাটির তাৎপর্য হল;— সাধারণতঃ রমণীগণ ১২ (বারো) মাসে ১৩ (তেরো) বার ঋতুবতী হন। একেই ইঙ্গিতে পার্বণ বলা হয়েছে। শরীর সুস্থ-সবল-সতেজ থাকলে, কোনরূপ বাধকতা না থাকলে প্রতি মাসে ২৮ (আঠাশ) দিন অন্তর রমণীগণ ঋতুমতী হয়ে পড়েন। সাধারণতঃ ৩ (তিন) দিন অবধি এর সময় কাল। এই সময়কালকে অশৌচ অবস্থা বলে গণ্য করা

হয়ে থাকে। এই অশৌচ অবস্থা চলাকালীন মহিলাদের কিছু নেগ-নীতি-নেগাচার অতি অবশ্যই প্রতিপালন করতে হয়। সেই পালনীয় বিষয়গুলি হল;—

(ক) ঋতুবতী হওয়ার সময়কালে সহবাস করা চলে না। সহবাস করলে পুরুষ মানুষের পরমায়ু কমে যায় অর্থাৎ জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। স্ত্রী নানা রকম জটিল রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেই কারণে পূর্ব পুরুষগণ এই সময়কালে সহবাস থেকে বিরত থাকার বিধান দিয়ে গেছেন।

(খ) ঋতুবতী রমণীকে ঐ সময়কাল অবধি অশুচি বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সময়কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্নান করা চলে না। স্নান করলে অনেক সময়ই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। সেই কারণে ঐ সময়কালে স্নান না করার কথা মানতে বলে দেওয়া আছে।

(গ) ঋতুবতীর ঋতুশ্রাব কোন প্রকারেই যেন মাটিতে না পড়ে যায় তার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। শ্রাব মাটিতে পড়লে ধরতি মাঞ অর্থাৎ পৃথিবীমাতা কূপিত হন। মা বসুন্ধরা কূপিত হলে বিপর্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সুজলা-সুফলা ধরিত্রী নিষ্ফলা হবে। অতএব সাবধানতা অবলম্বন করায় ভাল।

(ঘ) ঋতুশ্রাবের কাপড় কোন প্রকারেই পুড়িয়ে দেওয়া কিম্বা নর্দমায় ফেলে দেওয়া থেকে বিরত থাকার বিধান দেওয়া আছে। পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে। কাপড় আগুনে পুড়িয়ে ফেললে শরীরে জ্বালা অনুভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নর্দমায় ফেলে দিলে শ্রাব শুকোতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। সামান্য কারণে অসুবিধায় পড়ার কি দরকার? বিধান মেনে চলায় ভাল।

(ঙ) কোন পূজা-অনুষ্ঠানে যোগদান করা বারণ। পূজার ভোগ রান্না করা কিম্বা পূজার ফুল, অন্যান্য দ্রব্যাদি ছোঁয়া নিষেধ। পূজার জন্য প্রসাদী জিনিসপত্র সাজানো অথবা তৈরী করে দেওয়াও চলে না। ভুল ও অজ্ঞানতাবশত করে দিলে দেব বা দেবী কূপিত হন বলে বিশ্বাস। যে দেবী বা দেবতার আশীর্বাদ লাভের কারণে পূজা ও পূজার অনুষ্ঠান করা, সেই দেব বা দেবীর অভিশাপ লাগবে এমন কাজ না করায় ভাল। কাজ করবো, সুফল পাব না সে রকম কাজ করে কি লাভ?

(চ) ঋতুবতী কালে নূতন কাপড় পরা নিষেধ। নূতন কাপড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নূতন কাপড় নষ্ট হয়ে গেলে পরিবারের আর্থিক ক্ষতি হবে। আবার নূতন কাপড়ে অনেক সময় এমন রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া থাকে যার প্রভাব শরীরে এসে পড়তে পারে। ঐ রাসায়নিক দ্রব্যের কারণে শরীরে কোন

রোগ সৃষ্টি হতে পারে। সেই কারণে নূতন বস্ত্র পরিধান করার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার বিধান দিয়েছেন।

(ছ) এই তিন দিন কোন শষ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা বারণ। এমন কি ফসলের কোন শাক-সব্জীতে হাত লাগানো এবং তোলাও যাবে না বলে নিষেধ করা হয়েছে। ফসলক্ষেত্রে প্রবেশ করলে অথবা ফসলে হাত লাগালে ফসলে মড়ক ও ধসা রোগ আক্রমণ করতে পারে। ঐ রোগের ফলে ফসলের সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

(জ) ঐ সময়কাল অবধি কোন শষ্যের বীজ ও বীজতোলা স্পর্শ করা বারণ। স্পর্শ করলে বীজ ও বীজতোলা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

(ঝ) ঐ সময়কালের মধ্যে কোন আমিষ জাতীয় এবং গুরুপাক জাতীয় খাবার খাওয়া নিষেধ। আমিষ ও গুরুপাক খাবার খেলে ভালোভাবে পরিপাক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকার কারণে বদহজম এবং অন্যান্য পেটের অসুখ করতে পারে। সেই কারণে আমিষ ও অন্যান্য গুরুপাক খাবার খাওয়া থেকে দূরে থাকার বিধান দেওয়া হয়েছে।

(ঞ) ঐ সময়কালে নখ-চুল কাটা, চুল আঁচড়ানো, সিঁদুর-কাজল-আলতা পরতে নিষেধ করা হয়েছে। ঐগুলি করলে কোন অঘটন ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

(ট) ঋতুকাল শেষ হলে পর পুকুরে স্নান করা বিধেয়। স্নান করার সময় এক ঘাটে ডুব দিয়ে অপর ঘাটে উঠার বিধান দেওয়া আছে।

স্নানের দিন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে দেহ-মন শুচি-শুদ্ধ হওয়ার কথা বলা আছে। শুদ্ধচিত্তে, প্রফুল্ল মনে, আনন্দ সহকারে স্বামী সেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পূর্বপুরুষের দেওয়া নেগ-নীতি-নেগাচার মেনে প্রফুল্ল মনে, আনন্দ সহকারে মিলনের ফলে যে সন্তান জন্ম নেবে সে হবে চরিত্রবান, গুণবান, সৎ, কর্মঠ ও সাহসী। আদর্শ দম্পতি এই সন্তান কামনাই করে থাকেন। এইরূপ সন্তান হলে পর পরিবার এমন কি সমাজও সুন্দর হবে। সুখ-শান্তিতে দেশ ভরে উঠবে। পৃথিবী আনন্দে পরিপূর্ণ হবে।



বিহাঘরে রাং-পিতল



বিহাঘরে — বাঁদানি চুমান



বিহাঘরে — পান বদল



বিহাঘরে বাটী বদল



বিহাঘরে মালাবদল



জিতা আখড়া



বেহান দেখা



বাঁদনা চুমান



গরৈয়া পূজা



করম নাচ



করম পূজার করম ডাল আনা



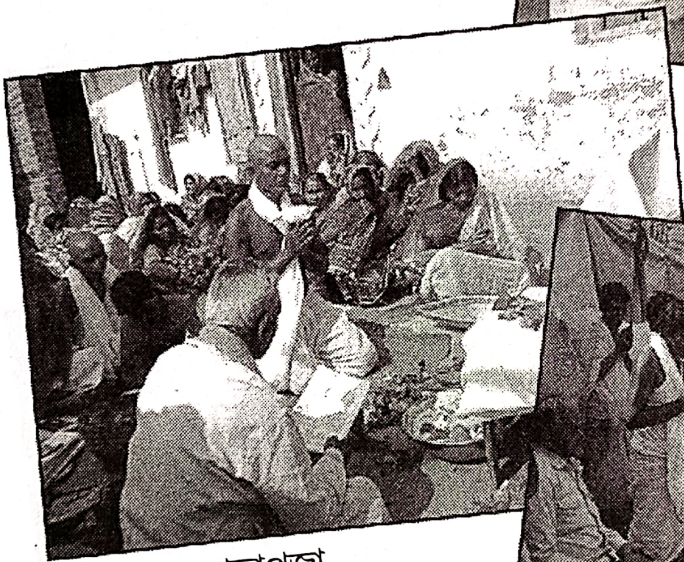
জিতা পূজা



কন্যাদান



করম পূজার লায়াও সুসারী



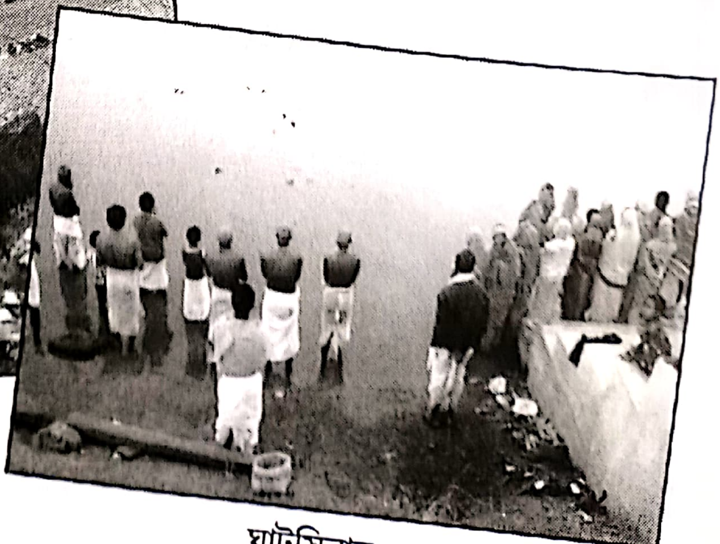
শ্রদ্ধাপূজা



তুলসীথানে সমবেত প্রার্থনা



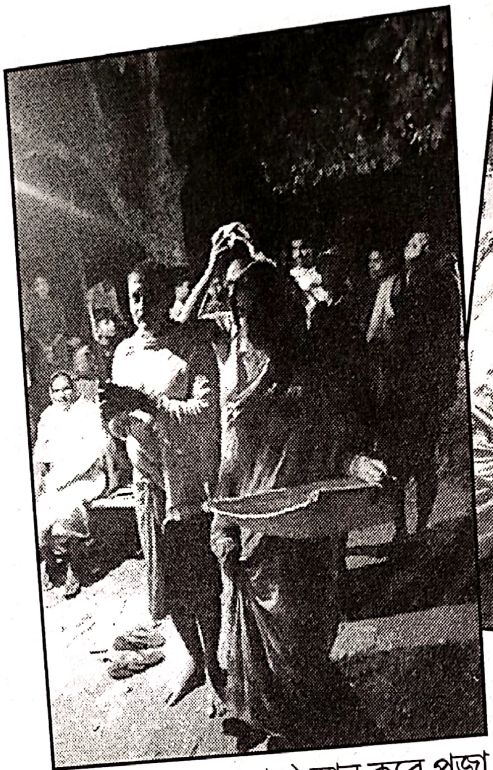
বেনাগাছ গাড়া



ঘাটসিনান



ভানসিং মেলা



ভিনসরে (ভোরবেলায়) স্নান করে পূজা করার জন্য আসছেন — (১) লায়া, (২) দেহরি ও (৩) পূজা সুসারী



পূজা চলাকালীন পূজাস্থল ঘিরে ভিজে কাপড়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে



পূজার জাগরণের সন্ধ্যায় ব্রতীগণ সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে



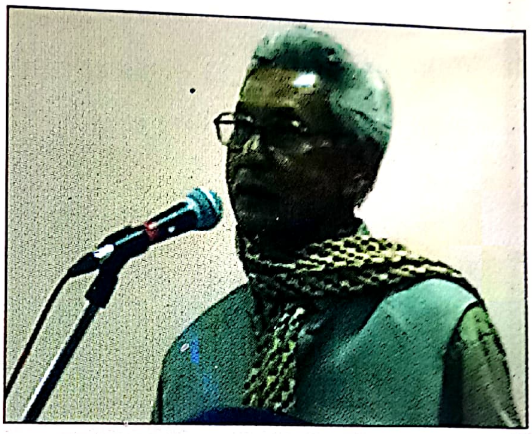
পূজায় মানতকারী ধরণায় পড়ে



ধরম পূজার সময় প্রার্থনারত



ধরম পূজার আগে ধরণা (পরবর্তীদের পড়া)



লেখক পরিচিতিঃ-

সৃষ্টিধর মাহাত মানভূম লোকসংস্কৃতি জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বলা যায়- এখানের "লোকসংস্কৃতির চলমান আকর"। এখানের সংস্কৃতির প্রতি নাড়ীর টানেই ছোটবেলা থেকে এই জগতে অনুপ্রবেশ। 'ছত্রাক' সহ বহু পত্র-পত্রিকায় লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত অসংখ্য গল্প, নাটক, প্রবন্ধ,সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মূলানুগ একজন যথার্থ ক্ষেত্রগবেষক ও লোকসংস্কৃতি-সংগঠক। তাঁর সুস্থ সাংস্কৃতিক জিদ আজও তাঁকে অনন্য করে রেখেছে। 'আখড়া' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক তিনি। প্রকাশিত গ্রন্থ-- 'মানভূমের লোককথা', 'আমার টুসু তুমার টুসু', 'লেখাপড়া শিখ' ও 'ফিরে দেখা সীতারাম মাহাত'। যথার্থই তাঁকে মহাশ্বেতা দেবীর দেওয়া "মানভূম সংস্কৃতির আপন দুলাল ও বীর[illegible]র বংশধর" এবং ছত্রাক পত্রিকার সম্পাদক সুবোধ বসু রায়ের দেওয়া "টৈশ্যুন" উপাধিতে ভূষিত করা যায়। স্বজাতের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ থেকেই বক্ষ্যমান গ্রন্থের রচনা। জন্ম ১৯৫০ সালের ২৯ শে জানুয়ারী কুলডি গ্রামে(বানসা টোলা)। বর্তমান নিবাস--পুরুলিয়া জেলার কেন্দা থানার অন্তর্গত জামবাদ গ্রাম।



মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী
পুরুলিয়া বিবেকানন্দ পল্লী, পেরিয়ার লেন
পুরুলিয়া - ৭২৩ ১০১